ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে

নবনীতা দেবসেন

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপ্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে

নবনীতা দেবসেন

আনন্দ

কোথায় আসামের জোড়হাটে এক মহিলা সাহিত্যিক সম্মেলন, আর কোথায় তিব্বত সীমান্ত। তাও আবার প্লেনে-ট্রেনে চেপে শৌখিন ভ্রমণ নয়, যাকে বলে একেবারে ডাকাবুকো স্টাইলে অ্যাডভেনচার। র‍্যাশনট্রাকে জোর করে জায়গা করে নিয়ে দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে ম্যাকমাহন লাইনের পাশে তাওয়াং পৌঁছনো। সেই লাসা-তাওয়াং রোড, যেখান দিয়ে কিনা চীনেরা এসেছিল। এ যেন রবীন্দ্র-নাথের সেই গানেরই ডাকে সাড়া দেওয়া—'যেমন করে ঝর্ণা নামে দুর্গম পর্বতে। নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অজানিতের পথে।' আর সেই অজানিতের পথে ঝাঁপ দেওয়ারই অনন্য অভিজ্ঞতাকে আশ্চর্য সরল ও স্বাদু এক ভঙ্গিতে এ-গ্রন্থে তুলে ধরেছেন নবনীতা দেবসেন।

সত্যিই অভাবনীয় এই বই। কি বিষয়ে, কি বর্ণনায়। তথ্য রয়েছে, ইতিহাস রয়েছে, নিসর্গদৃশ্যের অপরূপ বিবরণ রয়েছে, রয়েছে পদে-পদে রোমাঞ্চ-উৎকণ্ঠা, কিন্তু সব-ছাপিয়ে যা রয়েছে, তা হল, মুচমুচে মজা দিয়ে মুড়ে প্রতিটি পদক্ষেপকে তুলে ধরা, জীবন্ত ও রমণীয় করে। বাংলায় এমন বই দ্বিতীয়টি লেখা হয়নি।

১৮·০০

ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে

নবনীতা দেবসেন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

এই লেখিকার বই

নটী নবনীতা

ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে

॥ গৌরচন্দ্রিকা ॥

এই নিয়ে সাতবার হোলো, আমি তাওয়াংয়ের গল্পটা লিখতে বসেছি। বারবার লিখতে সুরু করেছি, আর ছেড়ে দিয়েছি। খানিকদূর এগিয়ে, কলম তুলে নিয়েছি। মন বলেছে "হচ্ছেনা, হচ্ছেনা"। কতগুলো দম্‌কা বাতাস, কয়েকটা মেঘ-ছেঁড়া তির্যক আলোর ছটা এমনিভাবে জীবনের ওপরে এসে পড়ে, যার দ্বিরাগমন অসম্ভব, যাকে "পুনরাগমনায় চ" বলে বিদায় জানানো যায় না, বরং—"ইহজীবনে এই শেষবার, এই প্রথমবার, হে আশ্চর্য, তোমাকে জানলুম। আমি কৃতার্থ,"—বলে কুর্নিশ করতে করতে পিছু হটে সরে আসতে হয় তার কাছ থেকে।

এই সব অভিজ্ঞতা নানান সাজে আসে। কখনো তার পোষাক ভয়ানক দুর্দৈবের, আবার কখনো বা গুরুকৃপার। দুটোই যে বিশুদ্ধ ঈশ্বরী মায়া, যখন ঘটে, যার জীবনে ঘটে, তার বুকের ভেতরে ঠিক জানান দিয়ে যায়।

আমার জীবনে কুম্ভমেলায় যাওয়া যেমন। আবার এই তাওয়াং যাওয়াও তেমনি। পরম আশ্চর্যের, পরম পরিতৃপ্তির। লিখতে গেলেই সব যেন নষ্ট হয়ে যায়। জিবে নোন্তা চায়ের স্বাদ, পাহাড়ের বাঁকে চমরী গাইয়ের ঝাঁক, বৃক্ষহীন উপত্যকা, পত্রপুষ্পহীন আশ্চর্য উদ্ভিদ, আর কূজনহীন

সূর্যোদয় নিয়ে বুনো তাওয়াং এই পাঁচ বছর আমার বুকের মধ্যে শেকল-বাঁধা, গজরাচ্ছে।

লিখি, লিখছি, লিখলুম বলে।

কিন্তু পারছি কই ?

লেখা আর হয়ে উঠছেনা।

কেন ? হচ্ছেনা কেন ?

কেননা, লিখতে গেলেই মনে হয় বুঝি ফুরিয়ে গেল। একবার লেখা হয়ে গেলেই ব্যাস্, এজমালী সম্পত্তি হয়ে গেল। তখন তাওয়াং সবার। এ তো কুম্ভযাত্রা নয়।

কুম্ভমেলা দশকোটি মানুষের যাত্রা। তাওয়াং কেবল একটি মানুষের। একলা আমার।

থাকুক, কেবল আমার হয়েই থাকুক। কী হবে, সব কিছু লিখে ফেলে ? কী হবে সবকিছু সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে ? যদি না পারি ?

যদি না পারি সবাইকে আমার বুকের মধ্যে পুরে তাওয়াং পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে ?

এ তো কুম্ভ নয় যে, যে যাবার সে পায়ে-পায়ে আপনিই চলে যাবে। কুম্ভস্নানের পুণ্যফল আমি হাতে হাতেই পেয়েছি—চোখের পলকে অনেকজনের ভালোবাসায় আমার হৃদয়ের অমৃতকুম্ভ পূর্ণ হয়েছে। এখনও ভরে চলেছে, অফুরান। কিন্তু তাওয়াং অন্য গল্প !

অবশ্য এও ভালোবাসার গল্প। আমার সব গল্পই তাই। প্রেমের গল্প লিখতে পারি না বলে দুঃখু নেই, ভালেবাসার গল্পই তো লিখি। আমি মহা ভাগ্যবতী কিনা।

নিশ্চয়ই সে মহা ভাগ্যবতী যার না আছে হাতে পায়ে বেড়ি, না বুকের ভেতর চাবিতালা। মানুষের কাছে আমি অনেক পেয়েছি, প্রাপ্তির যেন শেষ নেই। এত সমাদর এত অনাদর এত ভালবাসা এত প্রতারণা জীবনের একূল-ওকূল ভাসিয়ে দিয়েছে যে, আমার যে-কোনদিনই মনে হয় আজই যদি মরি, তবে কোনো দুঃখু থাকবেনা! আমার মতো সুখী, সুভগা আর কে?

বাসনা, সে তো মিটবার নয়। বাসনার স্বভাবেই বাসনা চিরকিশোরী, চির-অপূর্ণা। কিন্তু আমার তো সামনে কোনো লক্ষ্য নেই যে "মরবার আগে অন্তত এইটে যেন করে যেতে পারি"—পিরামিড না হোক, কুতুবমিনার? কুতুব না হোক, টাটাসেণ্টার! নাঃ। তেমন বাসনা সত্যিই নেই। আমি মনেপ্রাণেই নশ্বর—অমরতার স্বপ্ন আমার নেই। দায়-দায়িত্ব? কিসের দায়? কিসের ভাবনা? তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার। হালের কাছে মাঝি আছে—এটা অস্থি-মজ্জায় জানি। ঠিক তরী পার করে দেবে। আমার জন্যে কেউ পড়ে থাকবেনা অনুত্তীর্ণ। তবে কেন মনে এত অস্থিরতা আমার? কালতরঙ্গে উচ্চাশার সপ্তডিঙ্গা মাধুকরী যে সাজায়নি, তার তো নৌকোডুবির ভয়ও নেই। তার মনে তো অক্ষয় শান্তি, অখণ্ড স্থৈর্য থাকার কথা।

কিন্তু তা তো নয়? আমি অত্যন্ত চঞ্চল। মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে আমি ভাসিয়ে দিই কলমের লগি দিয়ে ঠেলে কাগজের নৌকো। আবার তারই উলটে পড়া নিয়ে আমার উদ্বেগ। যদিও জানি এ নৌকো নৌকোই নয় —এ কোথাও যাবেনা।

এতই যদি জানি, তবে তো আমিও মুক্তপ্রাণী। যদি আমি মুক্তপ্রাণী তবে আমার প্রাণে শান্তি নেই কেন? আমাকে এমন তাড়িয়ে নিয়ে

বেড়ায় পিঁজরার মধ্যে আট্‌কা পড়া বুনো জানোয়ারের মতো কোন্‌ বদ্ধ বাতাস ?

সত্যিকারের মুক্তপ্রাণী কেউ আছে কি ?

যারা ঘরের, অর্থাৎ সংসারী জীব, তাদের নানান্‌ ঝক্কি। কে না জানে, অখণ্ড স্বাধীনতা তাদের নেই ? আর যারা পারের, অর্থাৎ সাধু সন্ন্যাসী, ছাপ-মারা মঠ মিশনের জীব, তাদের তো ঝক্কি আরো বেশি। তারা সবাই শিবঠাকুরের আপনদেশের লোক, তাদের আইনকানুন আরো সবেবানেশে। না পায় তারা ইহলোকের স্বাধীনতা, না আছে তাদের পরলোকের উদ্বেগে এপারে শান্তি।

কেবল যারা ঘরেও নহে পারেও নহে, তাদের জন্যেই সারাটা পৃথিবী খোলা পড়ে আছে। আর ঘরেও নেই, পারেও নেই, এহেন জনমনিষ্যি ত্রিভুবনেও বেশি নেই। ভাগ্যিস নেই ? তাই 'ঘর' ব্যাপারটায় এত মায়া, আর 'পার'এর এত টান।

আমি বড় চঞ্চল। বড় অস্থির। কখনো এস্পার, আবার কখনো ওস্পার। এই ছিলুম ঘরে, এই বসেছি পারে। আর ভেতরে ভেতরে ? না ঘরের, না পারের, স্রেফ্‌ পারাপারের সওয়ারী।

তেমনিই এক পারাপারের গল্প এই তাওয়াং। এক্কেবারে সত্যি গল্প। এরই অন্য নাম, ইতি হ আস।

"মুহূর্তম্ জ্বলিতম্ শ্রেয়ো
ন তু ধূমায়িতম্ ক্রোরম্ ॥"

[সঞ্জয়কে বিদুলা]

জগতে আনন্দযজ্ঞে কি সবারই নিমন্ত্রণ থাকে ? মহত্ত্ব করে কবি যাই বলুন, থাকে না। আনন্দযজ্ঞে চিরন্তন গেস্টকণ্ট্রোল, শর্ট লিস্টেড হতে হয়। নিতান্তই রেসট্রিকটেড নাম্বার্স। জগতে শুধু এলেই তো হ'লনা, সে তো সবাই আসে। আনন্দযজ্ঞের খোঁজটি পাওয়া চাই, সেটা সবাই পায়না। আর যজ্ঞ মানেই আগুন আর আহূতি। আনন্দযজ্ঞ সোজা ব্যাপার তো নয়, অশ্বমেধের ঘোড়ায় হবেনা, সর্বস্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। আঁট গাঁঠ ছিঁড়ে। সেটা নিজে নিজে সব সময়ে পেরে ওঠা যায়না। জীবনই কখনো কখনো দয়া করে আঁটো গাঁঠটা খুলে দেয় এক একজনের—যাতে তারা বেরিয়ে পড়তে পারে। আর সেইটেই হলো নেমন্তন্নের চিঠি।

জগতের আনন্দযজ্ঞে একবার যার নেমন্তন্ন এসে যায়, তার কিন্তু সংসার সুখের পংক্তিভোজে আর নেমন্তন্ন থাকে না। তাই ঘরে যদিও বৃদ্ধ, এবং বালক, দুই কাঁধেই আমার দুই জাতের সময়ের ভার, আমি জানি আসলে তো ভার আমার নয়। ভেতরে ভার বইছেন অন্য একজন। আমার তাই উড়নচণ্ডে হতে অসুবিধে নেই।

মুক্তপক্ষ হওয়া-না-হওয়া অনেকটা নির্ভর করে নিজেকে কে কী ভাবছে তার ওপরে। তুমি যদি মনে কর তুমি মুক্তপ্রাণী, তোমাকে বদ্ধপ্রাণী

করতে পারে, এমন সাধ্যি কারুর নেই। ছোট থেকেই শুনে আসছি আমি জংলী, আমি বুনো, আমি খ্যাপাটে, আমি অসভ্য। বেশ বাবা তাই সই। বন্যপ্রাণীরও তো কতগুলো সুবিধে আছে? গৃহপালিত প্রাণীর যা নেই। সভ্য যখন হওয়া গেলনা, তখন জংলীই হওয়া যাক।

সেবার অন্ধ্রের বন্যায় সমুদ্রের মধ্যে ভেসে যাওয়া শ'খানেক পোষাগরু জীবিত অবস্থায় যখন স্রোতের টানে কূলে এসে ভিড়ল, তখন তারা গোয়াল খুঁজে না পেয়ে বনে জঙ্গলে চলে গেল। কয়েকটা বছরের মধ্যেই সেই গাভীরা এখন পুরোপুরি বন্য পশু হয়ে উঠেছে। ঝাঁক বেঁধে, হিংস্র শিং নেড়ে, মানুষের পরোয়া না করে পালে পালে বন থেকে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বন্যায় ভেসে যাওয়া মানুষও মাঝে মাঝে যখন কূলে এসে ঠেকে, তখন বালি ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, ঘর না পেয়ে জঙ্গলে চলে যায়।

একা।

আর বেপরোয়া।

—কি ব্যাপার? নবনীতা যে? এদিকে কোথায়?

—এই যে একটু যোড়হাটে···প্রণাম করতে করতে বলি। আশীর্বাদ করতে করতে উনি বলেন—শিবসাগরে? আমিও সেখানেই। অসম সাহিত্য সভায় তো?

—শিবসাগরে নয় তো, যোড়হাটেই। এটা হচ্ছে শুধু মেয়েদের। অসম মহিলা সাহিত্যিক সম্মেলন।

—ওই একই প্লেনে যেতে হবে আমাদের। জায়গাটা গৌহাটি এয়ার

পোর্টের লাউঞ্জ, সময় ১৯৭৭, অক্টোবরের শেষ হপ্তা। হঠাৎ দেখা ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। দুজনেই তখন সিকিউরিটি চেকিংয়ের ঘরে যাচ্ছি। কথা বলতে বলতেই চেকিং সারা, বেরিয়ে প্লেনের দিকে চললুম আমরা। অন্তরীক্ষে ঘোষণা হচ্ছে, এবার যোড়হাটের যাত্রীরা প্লেনে উঠে পড়ুন।

দমদম থেকে এসে, ঘণ্টাখানেক থেমেছিলুম গৌহাটিতে। প্লেনবদল করে যোড়হাটের প্লেনে চড়তে হবে এবারে। শিবসাগরে যেতে হলেও সেই যোড়হাট দিয়েই। ডাঃ ভট্টাচার্যকে দেখে খুবই আহ্লাদ হয়েছে, পথে চেনা মানুষ পেলে কার না আহ্লাদ হয়? ডাঃ ভট্টাচার্যকেও অখুশি বলে মনে হচ্ছে না। প্লেনে উঠে পাশাপাশি বসে দুজনে গল্প জুড়ে দিলুম মনের আনন্দে।

হঠাৎ খেয়াল হলো, ওপাশে এক ভদ্রলোক একদৃষ্টে আমাদের দেখছেন। কী রে বাবা? এত দেখাদেখির আছেটা কী? আমি কি ওঁকে চিনি? না তো! তবে? আরেকটু বাদে মনে হলো যে উনি তো দেখছেনই, আশপাশের অন্যান্য যাত্রীরাও সকলেই আমাদের দিকে এক নজরে তাকিয়ে আছেন। এ তো ভারি অভদ্র একটা প্লেন! ডাঃ ভট্টাচার্য শুক্ল কেশ, সৌম্যদর্শন, বয়স্ক ভদ্রলোক। যার সঙ্গেই কথা বলুন না কেন, তাঁকে কখনোই বেমানান লাগতে পারে না। এত হাঁ করে দেখার কী হলো? আমার দিকেও এভাবে কট্‌মট্‌ করে চেয়ে থাকার কিছু নেই। তবে? অন্য কোনো কারণ বোধ হয়। বড্ড বেশি জোরে জোরে গল্প করা হয়ে যাচ্ছে কি? প্লেনটা যেন আমার পৈতৃক ভিটে? সবিনয়ে ভদ্রলোককে বলি—"Sorry, বড্ড জোরে জোরে কথা বলছি, না?"—ভদ্রলোক যেন অকূলে কূল পেয়েছেন এমনভাবে বলে ওঠেন—

—"শুনুন, সেকথা হচ্ছেনা, কিন্তু আপনারা দু'জনে বোধহয় যোড়হাটে যাচ্ছেন ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।" সবিনয়ে বলি।

—"এই প্লেনটা তো দম্‌দমে যাচ্ছে কিনা ? তাই ভাবছিলুম—"

—"দম্—দম্ ?" —এবার দ্বৈতকণ্ঠের আর্তনাদ।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দম্‌দম্ ! দম্‌দম্ !" প্লেনসুদ্ধু লোক এবার গাঁক গাঁক করে ওঠে—"নেমে যান, নেমে যান, এ প্লেন নয়।"

আশুতোষবাবু আর আমি তো অবাক।

—"কিন্তু এই প্লেনেই তো পাঠিয়ে দিল আমাদের"—

—"না না, এটা নয়, ওপাশে আরেকটা আছে—ঐদিকে, নেমে যান, দৌড় লাগান, ছেড়ে দিল বোধহয়"—

হুড়মুড় দুড়মুড় করে তো নেমে পড়ি, দুজনের হাতেই ছোট্ট সুটকেস তাই সমস্যা নেই। তারপর দে ছুট্ ছুট্। ডাঃ ভট্টাচার্যের বয়স হলেও ভালই দৌড়োতে পারেন দেখা গেল। অদূরেই একটি পুঁটিমাছের মতো এরোপ্লেন, আদুরে বেড়ালছানার মতো গুর্‌গুর্ শব্দ করছে, সামনের পাখাটাখা বাঁই বাঁই করে ঘুরতে সুরু করছে।

—অ্যাইও, অ্যাইও ! এটাকি যোড়হাটের প্লেন ? যোড়হাট যায়গা তো ?

—রোক্‌কে ! রোক্‌কে ! জেনানা হ্যায় !

দুজনে দুরকমের ধ্বনি দিতে দিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে গিয়ে ধরে ফেললুম উড়ুক্কু পুঁটিমাছ। ছোট ছোট ক'টা সিঁড়ি বেয়ে উঠে, দেখি দুটোই মাত্র খালি সীট আছে, প্লেন ভরতি। হাঁপাতে হাঁপাতে তো বসে পড়েছি দুজনে। বস্‌বামাত্র ইউনিফর্ম পরা একজন স্মার্ট ভদ্রলোক কোথা থেকে উদয় হয়ে গটমট করে তেড়ে এসে আমাদের প্রীতি সম্ভাষণ জানালেন,

প্রায় বনলতা সেনের মতো ভাষায়—"এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন?" পাখির বাসা নয়, বাঘের গুহার মতো চোখ!—"মানে, ওই ভুল প্লেনে উঠেছিলাম আর কি। আরেকটু হলেই—"

সত্যি! কী হতো, আরেকটু হলেই? অসম সাহিত্যসভার দু'জন গণ্যমান্য অতিথি সেই রাত থাকতে অ্যালার্ম দিয়ে উঠে ট্যাক্সি ধরে কত কসরৎ করে রওনা দিয়ে, দমদম গিয়ে প্লেনে চড়ে গৌহাটি এসেছেন। আরেকটু হলেই—দুজনে গম্ভীর ভাবে ফের দম্‌দমেই নেমে, ভাবতুম —"বাঃ, যোড়হাট তো দারুণ বড় এয়ারপোর্ট? গৌহাটিকে হার মানিয়েছে।" ভেবেই কুলকুল করে হাসি পেতে লাগলো কিন্তু টেরিয়ে দেখে নিলুম ডাঃ ভট্টাচার্য হাসছেন না। গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। এত সিকিওরিটি চেকিং এত বাক্স-ওজনকরা এত প্লেন বদলাবদলি করে শেষ পর্যন্ত দমদমে নামলেই হয়েছিল আর কি! আশুতোষবাবু এখন নিশ্চয় ভাবছেন;—"ঐ মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। বড্ড বাজে বকবক করে। সেজন্যেই তো এইরকম হল!"—কথাটা ঠিকই। আমি সারাক্ষণই অন্য-মনস্ক, ফলে সর্বদাই নানান্ গোলমালে পড়ি। ডাঃ ভট্টাচার্যের নিশ্চয়ই জীবনে কখনো এমন বাজে ঝামেলা হয়নি, কেননা ভদ্রলোকদের এসব কদাচ ঘটে না। নেহাৎ আমি সঙ্গে ছিলুম বলেই—

যোড়হাট বিমানবন্দরে নেমেই মনটা হেসে উঠলো। হালকাপলকা শাদা-হলুদ বেগমবাহার শাড়িপরা প্রজাপতির ঝাঁক উড়ছে শ'য়ে শ'য়ে, দীর্ঘ সবুজ ঘন ঘাসের বনে। জমকালো কালোকমলা কাঞ্জিভরম শাড়িপরা আরেক জাতের বড় বড় প্রজাপতিও ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে। এই তো আমাদের অভ্যর্থনা সমিতি! চমৎকার। অতবড় প্রকাণ্ড একটা

চাদরের মতন শূন্য এরোড্রোমটা যেন রূপোলী কিংখাব। রোদে ঝম্‌ঝম্‌ করছে, যেন ধানকলের উঠোন! চারিপাশে দীর্ঘ সবুজ ঘাসের পাড়, তাতে পাখি—প্রজাপতির চুম্‌কি বসানো। শুধু তো বড় বড় প্রজাপতিই নয়। ছোট্ট ছোট্ট একরকম মৌটুসির ধরনের খুদে খুদে কালো-বাদামী পাখি ফড়িঙের মতন নাচানাচি করে ঘাসের ফাঁকে লুকোচুরি খেলছে। খেলতে খেলতে কিচিরমিচির ঝগড়া! যেন বিকেলবেলা পার্কে বাচ্চাদের চেঁচামেচি। আর এই কার্তিকমাসের মাঝামাঝি, ঠিক দুক্‌খুরে, কোথা থেকে একটা আন্‌পঢ়্‌ কোকিল (কিছু জানেশোনে না, কোন্‌ ঋতুতে কী করতে হয়) তারস্বরে ডেকে যাচ্ছে। বোধহয় ওকেও অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য করা হয়েছে, ও বলছে 'স্বাগতম্‌! আশুবাবু! স্বাগত নবনীতা!'

মাঠের পাশে একটা তাঁবু খাটানো আছে। যেমন তেমন নয়, রীতিমত লাক্‌শারি তাঁবু, ভেতরে টেবিল-চেয়ার, সোফাকৌচ সাজানো, সতরঞ্চি পাতা। যেন বেদুইনদের দেশে এলুম। চেয়ারে মানুষ, আর মেঝেয় বাক্সপ্যাঁটরা বোঝাই। আমাদেরও সেইখানেই বাক্সসমেত জমা করে দেওয়া হল। যথাকালে বাস আসবে। আমাদের লোকালয়ে পৌঁছে দেবে। ততক্ষণ এটাই ঠিকানা। এই তাঁবু, এই প্রজাপতির ঝাঁক, এই পাখির দল, এই ঘাস, রোদ আর শুকনো ঝক্‌ঝকে সিমেণ্টে নৈঃশব্দ্যের বাজনা।

তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে গেছে। তাঁবুতে কি একটু জল নেই? নাঃ জল নেই। ইশ্‌। সত্যই কি এটা বেদুইনের দেশ নাকি? কখন্‌ শহরে যাবো?

সভাপর্ব

যোড়হাটের সার্কিট হাউসটি সুন্দর। কিন্তু ঢোকবার মুখে নালার ওপারে সরু সরু শিক লাগানো, এই যা। তার ওপর দিয়ে হেঁটে ঢুকতে একটু অসুবিধা হয়, পায়ে গুডইয়ার কি ডানলপের মত চওড়া ব্র্যাণ্ডের জুতো না থাকলে। স্টিলেটো হীল, কি পেন্সিল হীল পরিনা আমি, আমার তাই পদস্খলনের সম্ভাবনা কম, তবু ভয় ভয় করে। অবশ্য ব্যবস্থাটা হীলপরা মেয়েদের আটকাবার জন্যে ততটা নয় যতটা গরুদের জন্যে। তারা যাতে বাগানে ঢুকে লাঞ্চ না সারে। দোতলার ঘরে আছি আমি আর নির্মলপ্রভা বরদলৈ। নির্মলপ্রভা সংস্কৃতে ডক্টরেট, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা, এবং বিখ্যাত কবি। তার কিছু লিরিক কবিতা আমি আগেই অনুবাদ করেছি। তার কবিতা গান করেও গাওয়া হয়। আসামে দেখলুম মেয়ে কবিদের মধ্যে এই একটা নতুন ব্যাপার আছে। তারা কবি-কাম-গাইয়ে। প্লাস পণ্ডিত। ডক্টর লক্ষহীরা দাসও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা, তিনিও কবি, এবং নির্মলপ্রভার মতই, স্বনাম-ধন্যা গায়িকা। লক্ষহীরা এবং নির্মলপ্রভা সলিল চৌধুরীর মতো নিজের লেখা লিরিকে নিজেরা সুর দেন। তারপর নিজেই গান করেন। সেসব গান হিট্ হয়। এখানে বহু মেয়ে-কবি এসেছেন। নিলীমা দত্ত আরেক-জন। তিনিও গৌহাটিতে অধ্যাপিকা। জাতে বাঙালী বটে। কিন্তু লেখেন অসমীয়াতে। তাঁর আঠারো বছরের ছেলেটি নক্শালী রাজনীতির শিকার হয়েছে—নিলীমাদির কবিতার বইটি তাকেই উৎসর্গ করা। নির্মলপ্রভার লেখায় প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পেয়েছিলুম আগেই। আলাপও হয়েছে

আগেই, কলকাতায়। এখানে একঘরে রাত্রিবাস করতে এসে আমাদের বন্ধুত্ব হ'লো। সারারাত্রি না ঘুমিয়ে গল্প করলুম দুজনে। কে বিশ্বাস করবে, এই যুবতী কবির নিজেরও আবার একটি যুবতী কন্যা আছে? সেও ডক্টরেট, সেও অধ্যাপিকা, সেও মা হয়েছে? নির্মলপ্রভার জীবনটাই একটা কিংবদন্তীর মতো। শুনতুম আর অবাক হতুম। নির্মল-প্রভা বলেছিলেন তাঁর পরবর্তী প্রেমের কবিতার বই একজন তরুণ বাঙালী কবিকে উৎসর্গ করবেন। করেও ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। নির্মলপ্রভা বাদে অন্য অনেকেরই কবিতার সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়। আসামে যে এত মহিলাকবি আছেন আমার জানা ছিলনা। যে-সব লিটলম্যাগাজিন থেকে আমি অনুবাদ করেছি, তাতে মেয়েদের লেখা চোখেই পড়ত না বিশেষ। অসমীয়া কবি অনেকের লেখাই আমি আমার সামান্য ভাষাজ্ঞানে, অন্যদের সাহায্য নিয়ে অনুবাদ করেছি। নির্মলপ্রভা, লক্ষহীরা, নবকান্ত বরুয়া, হীরেন গোহাঞি, হীরেন ভট্টাচার্য, হোমেন বরগোহাঞি সকলেরই মৌখিক বাংলা প্রায় নিখুঁত। পরিশুদ্ধ উচ্চারণ, পাকাপোক্ত ভাষাজ্ঞান। আমার বইপড়া অসমীয়া নেহাৎই কাঁচা। কষ্টেসৃষ্টে যদিও বা ঠেকেঠুকে পড়তে পারি—বলতে কইতেও পারি না, লিখতেও না। সাধ্য নেই, কিন্তু শখ আছে, অসমীয়া সাহিত্যের ঐশ্বর্যের ভাগ পেতে লোভ যথেষ্ট।

আমার বক্তৃতায় আমি দুঃখু করে বললুম হ্যাঁ, বড়ই লজ্জার বিষয় যে আমরা বাংলাসাহিত্যের সভায় হিন্দি, ওড়িয়া বা অসমীয়া লেখককে আমন্ত্রণ জানানোর কথা ভাবিই না অথচ আপনারা ভেবেছেন। আমরা ওড়িয়া, হিন্দি, বা অসমীয়া সাহিত্য বিষয়ে অসতর্ক। নিয়মিত খোঁজ-খবরও রাখিনা, ভাষাগুলিও জানিনা, যদিও কলকাতায় হিন্দিভাষী

ওড়িয়াভাষী অসমীয়াভাষী বাসিন্দার অভাব নেই। অথচ আসামে বসেও আপনারা কি সুন্দর প্রতিবেশীসুলভ উৎসাহে বাংলাসাহিত্য পড়েন। আমি অবিশ্যি এক অসম-প্রেমিক, জাতে বাঙালী, অসমীয়া কবি অমলেন্দু গুহ-র বই "তোমালৈ" আর "লোহিতপারের কথা" পড়বার জন্যে অল্প-স্বল্প অসমীয়া শিখে ফেলে তারপরে কিছু কিছু অন্যান্য কবিদের কবিতাও পড়েছি, অনুবাদও করেছি। কিন্তু আজ এখানে এসে বাংলাসাহিত্যের প্রতি আপনাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অনুভব করে লজ্জিত এবং অপরাধী বোধ করছি। সত্যিই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালী এখনো নিজেকে পূর্ণ স্বাবলম্বী মনে করে' আত্মনিমগ্ন থেকে গেছে। বাংলার বাইরে তার উৎসাহ ছড়াতে পারেনি। তাই, আশাপূর্ণা, সমরেশ, সুনীল, শক্তি বলতেই আপনাদের চোখমুখে যে-আলো জ্বলে উঠছে তার যোগ্য প্রতিবিম্ব আমাদের চোখেমুখে ফোটেনা। তবে সুখের বিষয় লিটল-ম্যাগাজিনের তরুণ লেখকরা ক্রমশঃ এই দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছেন, এবং সংশোধনের চেষ্টাও করছেন। অনেক ছোটো কাগজে এখন "প্রতিবেশী সাহিত্য" বিভাগ দেখা যাচ্ছে। সুতরাং লক্ষণ শুভ। (এর পরে 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যায় প্রতিবেশী সাহিত্য আলোচিত হয়েছিল।) আমার কপাল ভাল, বক্তৃতায় সততার অভাব ছিলনা বলেই বোধ হয় (এবং দীর্ঘ ছিলনা বলেও নিশ্চয়) সকলেই খুব খুশি হলেন। আমি মোটেই বাগ্মী নই, আমার মুখে ঠিক ঠিক কথা জোগায়না কিছুতেই। যদিও অত্যন্ত বক্‌বক্ করা স্বভাব। মানে, সবচেয়ে খারাপ কম্বিনেশনটা আর কি।

বাগ্মী না হয়েও বাচাল কী করে হওয়া যায়, তারই তাজ্জব প্রমাণ এই শ্রীমতী! যাক, যাহোক করে মাননীয়া প্রধানা অতিথির মান্যগণ্য ভাষণটি তো প্রদত্ত হলো। পরন্তু সার্কিট হাউসে ধেয়ে এসে

দু' দু'জন সাংবাদিক পরপর খুব সীরিয়াস মুখ করে আমার সাক্ষাৎকার পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। প্রথমে পি. কে. বরদলই। মাঝবয়সী "কলা-সাংবাদিক" সবার পরিচিত, লেখেন 'অঘরী' নামে। আরেকজন তরুণ সাংবাদিক এসেছিলেন রেডিও থেকে। 'অঘরী'র সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার 'দৈনিক জনমভূমি'তে বেরিয়েছিল, 'অঘরী' তার কাটিং আমাকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়। শুনলুম রেডিওরটা নাকি রেডিও গৌহাটি থেকে প্রচারিত হবে। আমার কিন্তু খেয়াল করে সেটা শোনা হয়নি, কেননা তার আগেই যে যোড়হাট থেকে হাওয়া হয়ে গেছি। যাত্রা সুরু! দুই বোন, আমার দু'জন নবীন অসমীয়া বান্ধবী, শ্রীমতী নীতি বরুয়া ও রানী হেনড্রিকে আমাকে যত্ন করে পেঁৗছে দিয়েছেন কাজিরাঙ্গার জঙ্গলে, আমার কাজিরাঙ্গা দেখবার সখ ছিল বলে। ওঃ, কী আশ্চর্য সেই বনবাস!

বনপর্ব

—"কাজিরাঙ্গার জঙ্গল না দেখালে কিন্তু সভা করতে যাবনা"—এই রকম একটি আহ্লাদে শর্ত করেছিলুম শ্রীমতী শীলা বরঠাকুরের সঙ্গে, যখন তাঁরা আমাকে নেমন্তন্ন করেন ফোনে। তিনি কথা রাখলেন এবং বন্ধুদের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন কাজিরাঙ্গাতে। ট্যুরিস্ট লজে না রেখে, ওরা আমাকে নিয়ে গেলো আশ্চর্য একটি আশ্রয়ে। "কামরূপ কমপ্লেক্স"। এই টুরিস্ট কমপ্লেক্সের তুলনীয় কিছু ভারতবর্ষে এখনও আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। একমাত্র মার্কিন দেশেই দেখেছি এধরণের ব্যবস্থা। গাড়ি রাখার বন্দোবস্ত, এবং নানা ধরণের রুচিমাফিক বাসস্থান সেখানে তৈরি আছে—একটা সিংগ্‌ল্ হাট্ নিলুম (কুটিরে থাকার আমার খুব

শখ)—একেবারে আশ্রমের প্রান্তে, ছোট্ট নদীটার পাড়ে। এই নদীর ওপারেই কাজিরাঙ্গা ফরেস্ট এরিয়া আর এপাশে সামান্য জনবসতি, গাড়ি চলার বড়রাস্তার ধারে ধারে। নদীটা ছোট হলেও খরস্রোতা। ব্রহ্মপুত্রের সাক্ষাৎ পুত্রী তিনি। যখন তখন বাড়েন-কমেন, বান ডাকেন। তাঁর প্রতাপ বড় কম নয়। ওসব নদীর মেজাজই আলাদা।

"কামরূপ কম্‌প্লেক্স" শ্রীজগদীশ ফুকন নামে এক চিরতরুণ এক্স-জার্নালিস্টের স্বপ্নের ফসল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে ছেলেমেয়ে পত্নীসহ তিনি এইখানে এসে জঙ্গলের ধারে নদীর পাড়ে জনবসতির বাইরে অনেকখানি জায়গা জমি নিয়ে নানা রকম এক্সপেরিমেণ্ট করছেন। বাঁশের মধ্যে চালমাংস ভরে আকাশের নিচে কাঠের আগুনে ঝলসে আদিবাসী স্টাইলে রেঁধে, বাঁশের গেলাশে আদিবাসী মদ সহকারে শৌখীন বিদেশীদের খাওয়ানোর ব্যবস্থাও যেমন তিনি করতে পারেন, তেমনি আবার মোমের আলোয় লেস দেওয়া টেবিলক্লথে ফরাসী খানা আর আর বিলিতি মদের ব্যবস্থাও আছে দিশি সায়েবদের জন্যে। দারুণ এক রেস্তরাঁ চালান তাঁরা। আমি সত্যি থ'। এত সুন্দর, এত সুপরিকল্পিত (এবং কল্পনাপ্রবণ) শিল্পসম্মত পারিবারিক ব্যবসায় এদেশে আমি আর দেখিনি।

আমার জন্যে পছন্দ করা খোড়ো চালের কুটিরটির ভেতরে চূণকাম করা মাটির দেওয়াল, কিন্তু বাথরুমটি পাকা এবং বিলিতি ব্যবস্থা। কুটিরের সামনে ছোট্ট দাওয়া আছে, তাতে দিব্যি ডেকচেয়ার পেতে বসা যায়। ভেতরে ধবধবে খাটবিছানা, টেবিল চেয়ার, কুঁজো-গেলাস, ইংরিজি ম্যাগাজিন পর্যন্ত। মোমবাতি, টর্চ, দেশলাই, লণ্ঠন, নানারকম বাতির ব্যবস্থা। হাতপাখাও রাখা আছে। ঈশ এমনি একটা ঘরে যদি সারা-

জীবন থাকা যেত ? ঐহিক আরামের কোনো কম্‌তি নেই। হঠাৎ মনে হলো মাটির মেঝে, মাটির দেয়াল তো, কোনো গর্ত থেকে সাপ বেরুলে কী করব ? শহর কলকাতার মেয়ে, সাপকে ট্যাক্‌ল্‌ করতে শিখিনি। তাবলে যে বাঘ সিংগিকে ট্যাক্‌ল্‌ করতে শিখেছি, এমন কথাও বলছিনা। তবে হ্যাঁ, জানলা-দরজা ভালো করে বন্ধ করলেই ওসব শত্রুকে এক রকম ট্যাক্‌ল্‌ করা যায়। কিন্তু সাপ ?

শান্তিনিকেতনে 'প্রতীচী' বাড়ির বকুলতলায় প্রায়ই সাপ মারা পড়ে বটে, কিন্তু সেসব সর্পশিকারের কৃতিত্ব আমার নয়। আর এটা তো আসামের জঙ্গল! কবি সত্যেন দত্ত যাই বলুন, আমি বাবা সাপের মাথায় নাচিনা। সেসব কেষ্টঠাকুরের এরিয়া। আমার হাতপাখা আছে, মশারি আছে, ডেকচেয়ার আছে। মশারিটি বেশ যত্ন করে খাটিয়ে তার ভিতরে হাতপাখা নিয়ে গুটিসুটি শুলেই মনে হয় সকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। কিন্তু তার আগে তো বাইরে ডেকচেয়ার পেতে খানিক্ষণ বসা যাক! সুন্দর রাত। জগদীশ ফুকন, তাঁর স্ত্রী মীরা আর মেয়ে মিতা—তিনজনেরই খুব মনোহর স্বভাব। মীরা ফুকন রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করেন, ঘরদোরগুলি গুছিয়ে রাখেন, রেস্তরাঁটা চালান, সাংসারিক ও গৃহস্থালীর দিক সবটা একাই চমৎকার দেখেন। জগদীশ দেখেন যন্ত্রপাতি, হিসেব-পত্তর, 'বার'-এর ব্যাপার, বাগান, জমিজমা, চাষবাস। মিতার ভাল নাম অর্ঘ্যা। সে বাবা-মা দুজনকেই সাহায্য করে। সুসংবদ্ধ, রুচিশীল, পরিশ্রমী, শিক্ষিত পরিবার। মা এখনও আশ্চর্য তরুণী, জগদীশও যুবক। মেয়ে কলেজে পড়ছে। ছেলেটি সদ্য গেছে কলকাতায়; চা-কোম্পানীতে জুনিয়র এক্সিক্যুটিভ্‌ হয়ে। মা মেয়েকে দুটি বোন মনে হয়। সৃষ্টিকর্তা ধী এবং শ্রী দুটোই দিয়েছেন ঢেলে। জগদীশ কবিতা ভালোবাসেন। ইংরিজি, বাংলা, অসমীয়া।

দিন যেটুকু বাকী ছিলো, কাটলো জগদীশ ফুকনের অর্কিড কালেকশন, তাঁর ক্ষেতখামার বাগান দেখে। চমৎকার একটি জীবন গড়ে নিয়েছেন ওঁরা, দেখলে ঈর্ষা হয়। কয়েকটি গাড়ি আছে, শহরে যাতায়াত করে। বন্দুকও আছে। যদিও জঙ্গলে গিয়ে জন্তু মারার প্রশ্ন ওঠেনা, তবে জন্তুরা যদি হঠাৎ ঘরে চলে আসে, তখন অন্য আইন নিতে হবে তো ?

কথা রইলো সকালবেলায় বনে যাওয়া হবে। মিতাও সঙ্গে যাবে, হাতীর পিঠে চড়ে ঘুরবো। গণ্ডারই প্রধান দ্রষ্টব্য, হরিণ, বাঘটাগ এক্সট্রা।

কাজিরাঙ্গাপর্ব

ফুকনদের গাড়ি আমাদের নামিয়ে দিল বন-আপিসে, সেখান থেকে গাইড নিয়ে রওনা। প্রথমে নদী পার হতে হবে। একটি ডিঙি বাঁধা আছে। আমাদের গাইডই সেটি চালিয়ে ওপারে নিয়ে গেল। অবশ্য একটি বাচ্চা ছেলেও এল নৌকোয়। সে-ই ফেরৎ নিয়ে যাবে ডিঙিটা। আমরা নেমে যেতেই নৌকো ফিরে গেল। এখন কেবল বনজঙ্গল। মিতা, আমি আর বাবরালি। বাবরালির বয়স বেশি নয়, বেশ হাসিখুশি দেখতে। নদীর পাড়টা খাড়াই। আমাদের হাত ধরে টেনে ওপরে তুলে নিলে সে। একটুখানি এগিয়েই খুব উঁচু উঁচু গাছের ঘন সবুজ বন, কত লতায় জড়ানো ঝোপঝাড়, ঠিক 'ট্রপিকাল ফরেস্ট' বলতে যা ভাবি, তেমনি। কিন্তু সেটাই পুরো কাজিরাঙ্গা নয়। যা দেখলুম ঐ একটুই ঐরকম। বাকীটা দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসে ভরা জলাজমি। ঘন বনের মধ্যে একটুখানি ঘাস-

জমি পরিষ্কার করা। সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, কে? মানসিং। মানসিং এক বিশালবপু দাঁতাল হাতী। একটা দাঁত নেই অবশ্য। একটা মই এনে বাবরালি লাগিয়ে দিল মানসিংয়ের পিঠে! সেই মই বেয়ে উঠে পড়লুম অর্য্যা আর আমি। বাবরালিই মাহুত। অর্থাৎ এই বনবিহারে সেই আমাদের ফ্রেণ্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড। বয়স ত্রিশের মধ্যেই মনে হল, হাসিখুশি ছেলেটি, অর্য্যা ওকে চেনে। বাঁধাধরা মাত্র কয়েক-জনই মাহুত আছে বনবিভাগের। শ্রীল শ্রীযুক্ত মানসিং উঠে দাঁড়াতেই দেখলুম, বাঃ! উঁচু উঁচু গাছের ডালপালা সব আমার হাতের নাগালে চলে এসেছে। এই বনের সবুজটা কেমন যেন অন্যরকম, কাঁচা রং। যেন গায়ে ঘষলে, হাতে উঠে আসবে।

মানসিং সত্যিই মাননীয় খুবই উঁচু হাতী। ধৃতির কাছে আসামের নানাবিধ হাতীর জাতিপ্রকৃতি বিষয়ে বছর দশেক আগে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেছিলুম। কালার ট্রান্সপেরিন্সিসমেত লেকচার দিয়ে বন্ধুদের হাতীবিশারদ করবার চেষ্টা করেছিলেন ধৃতিকান্ত, কিন্তু এখন কার্যকালে দেখলুম সব ভুলে গেছি। কী এর পিঠের গড়ন? কিবা এর পায়ের ধরণ? দাঁতের কায়দা? কপাল? লেজ? খুব চেষ্টা করেও মনে পড়ল না। পড়লে, মাহুতকে একটু ইম্‌প্রেস করা যেত। হলনা। মাহুতই আমাদের ইম্‌প্রেস করতে সুরু করল। এ বন হচ্ছে তার আজন্ম অধীত শাস্ত্র। এ বিষয়ে অসীমজ্ঞান দেবার ক্ষমতা সে রাখে। হেন প্রশ্ন আমি করতে পারিনি যার উত্তর সে জানেনা। অবশ্য গুল্‌তাপ্পিও মেরে থাকলে মারতেই পারে, আমি তো ধরতে পারবোনা সত্যি না মিথ্যে! তবে আজন্ম এই বনে-জঙ্গলেই বড় হয়েছে বাবরালি, তার বাপ-খুড়োও মাহুত। হাতি নিয়েই তার জীবন, বন নিয়েই তার বাঁচা। গুলমারার দরকার নেই তার। প্রশ্ন করে তার ভাঁড়ার খালি করতে পারি এমন শক্তি

আমারই বরং নেই।

আস্তে আস্তে হাতী বন দিয়ে চলল। দুলতে দুলতে ছোট ছোট ডাল-পালা ভাঙতে ভাঙতে, চিবোতে চিবোতে ছোটখাটো লতাপাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে। এটা চিড়িয়াখানাতে 'ফুলমালা'র পিঠে চড়া নয়। জঙ্গল প্রথমে ঘন, এবং তারপরে হঠাৎ পাত্‌লা হয়ে গেল। এবার আর অরণ্য নয়, জলজঙ্গল, বা জংলাজলা। এত দীর্ঘ ঘাস আমি কোনোদিন দেখিনি। মানসিং-এর ঘাড়-মাথার কেবল ওপরটুকুই বেরিয়ে আছে, বাকীটা এই দীর্ঘ অতিদীর্ঘ, দানবীয় তৃণগুল্মে ঢাকা। আমেরিকান প্রেয়ারীজ আমি দেখিনি, তবে এইরকম ঘাসজমিই হবে বোধহয়। এ ঘাস নামেই ঘাস। দেখেছি ফ্রান্সে এই ধরনের ঘাসবনে রেজিস্ট্যান্সের সময়ে সৈন্যরা লুকিয়ে থাকতো বলে সে ঘাসবনের নামই পাল্টে গেছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে কামার্গ অঞ্চলের মাইলের পর মাইল খোলা ঘাসজমিতে গেছি। সেও জংলা-জলা অঞ্চল। কিন্তু সে-ঘাস, আর এ-ঘাস! সেখানেও খুরের ঘায়ে জলছুটিয়ে কেশর উড়িয়ে ছুটে যায় ধবধবে শাদা বুনো-ঘোড়ার দল, কিন্তু অন্য জিনিস এখানে, বুনো হরিণের ছুটে যাওয়া!

সেখানে খট্‌খটে চাঁদিফাটানো, আগুন ঝরানো, মরুভূমির মতন রোদ্দুর। এখানে মেঘের ডাক, আকাশ অন্ধকার। দু'এক ফোঁটা জল পড়তে সুরু করেছে। সেখানে ছিল খোলা জীপ আর মানুষের তৈরী রাস্তা। এখানে মোটে পথই নেই। পায়ে পায়েই আপন পথ কেটে নিয়েছে বন্য জন্তুরা। মানসিং তার চেনা হাতী-চলা রাস্তা ধরেই চলেছে নিশ্চয়, কিন্তু সামনে বা পিছনে সে-রাস্তার দৃশ্যত কোনো চিহ্ন নেই আমাদের চোখে।—

—"বর্ষা বাদল সুরু হবে। আপনাদের ছাতি নেই। দিদিমণিরা কিছু

দেখতেও পাবেন না। ভিজেও যাবেন" বাবরালি বলল।—"তার চেয়ে এই একটু হাতীর পিঠে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে ফিরে চলুন, আজ আর জন্তুরা বেরুবে না।"

—"বেরুবে না মানে? এখানে তো গুহাটুহা দেখছি না? লুকোবে কোথায়?"

—"মানে বৃষ্টির মধ্যে ভাল দেখা যাবেনা দূরের জিনিস। বেশি জীবজন্তু বৃষ্টিতে ভিজে জল খেতেও যাবেনা। পাখীরাও উড়ে বেড়াবেনা। বাঁদররাও হুটোপাটি করবে না।"

—"না করুক। মোটেই ফিরবনা। তিনঘণ্টা ধরে বন দেখবার কথা। তিনঘণ্টাই ঘুরব আমরা বনে বনে।"

—"ভিজে ভিজে?"

—"তা বৃষ্টি হলে কী করব? ভিজে ভিজেই।"

—"এই নিন, তাহ'লে আমার ছাতিটা নিন, আমার ছাতি লাগেনা।"

কিন্তু যে বৃষ্টিটা সুরু হ'ল, তার ছাঁটের কাছে ছাতি এবং হাতি সবই তুশ্চু।

অরণ্যে তমশ্ছায়া

ভিজে জবজবে অবস্থায় হাতী থেকে নেমে আমরা নৌকো খুঁজতে থাকি। এর মধ্যেই নদীর জল বেড়ে গেছে! আশ্চর্য! মাহুত চেঁচামেচি করে ওপার থেকে নৌকো এবং মাঝি যোগাড় করে দিল। বৃষ্টির জন্যই বোধহয় এপারে কিচ্ছু ছিলনা। ফরেস্ট অফিসার নেহাৎ ভাল মানুষ। আমরা ফিরেছি দেখে তিনি খুব নিশ্চিন্ত হলেন। বেশ বিচলিত হয়ে

পড়েছিলেন—এই অঝোর ঝরন বৃষ্টি, তার মধ্যেই যে দুটো মেয়ে হাতী চড়ে এতক্ষণ ধরে বনে জঙ্গলে জবরদস্তি ঘুরে বেড়াবে, তিনি এটা ভাবতেই পারেননি, (তা যতই শার্ট পেণ্টুলুন পরে যাক না কেন তারা!) আপাদমস্তক চুপ্‌চুপে রীতিমতো শীত করছে, যেহেতু মাসটা কার্তিকের মাঝামাঝি, ঠাণ্ডা কন্‌কনে একটা হাওয়াও দিচ্ছে পূর্বজন্মের স্মৃতি অবধি বিদ্ধ করে দিয়ে। উষ্ণ আশ্রয়ের লোভে আমরা ফরেস্ট অফিসেই ঢুকে পড়ি। এখন বাড়ি ফিরি কী উপায়ে? এখান থেকে মাইল খানেক তো হবেই "কামরূপ কমপ্লেক্স", এই বানডাকানো টাইপের বৃষ্টির মধ্যে অতটা পথ হণ্টনের প্রশ্ন নেই। একটু চা খেলে হতো। একপ্রস্থ শুকনো পোষাক পেলে হ'তো। তার আগে অন্তত একটা তোয়ালে পেলে হতো! নানা রকম চাওয়া-পাওয়ার ভাবনা এখন মাথার মধ্যে খেলে যাচ্ছে। (এতক্ষণ মাথার ওপরে ছাদটা পর্যন্ত ছিল না। ছাদ পেয়েই তোয়ালে, কত কি!)

—"কী করে যে এই বৃষ্টিতে এতক্ষণ হাতীর পিঠে আপনারা"—? অফিসের অন্যান্য কর্মীরাও হতভম্ব—"আমরা তো ভেবেছিলুম অনেক আগেই ফিরে আসবেন! সত্যি—"

—"ফিরবেন? বৃষ্টি বাড়ায় আরো আহ্লাদ হচ্ছে তো ডাঃ সেনের! জন্তুরা বৃষ্টিতে সব লুকিয়ে পড়লো, তাই ওঁরও জেদ চাপলো তাদের খুঁজতে হবে" অর্ঘ্যা ব্যাখ্যা করে।—"দেখেছেন শেষ অবধি। গণ্ডার গোটা তিনেক, দুটো হাতী, বহু হরিণ, অনেক পাখী, আর"—

—"আর একটা বাঘের টাটকা চরণচিহ্ন"—আমিও না বলে পারিনা। —"এর আগে কখনো বুনো বাঘের এত কাছাকাছি যাইনি তো? পায়ের ছাপ ধরে ধরে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে—"

—"সর্বনাশ! ওর মধ্যেই তো—"

—"বাঘ লুকিয়ে থাকে ? সেজন্যই তো যাওয়া। নদীর ধার অবধি গেলুম। তারপর আর খুঁজে পেলুম না। হারিয়ে গেল।"

—"বাঁচা গেল।" ফরেস্ট অফিসার বলেন।—"বাঘ কেন ভিজতে যাবে আপনাদের দেখবার উৎসাহে ? সে নিশ্চয়ই শেলটার নিয়েছিল।"

আবাল্য দেখে আসছি, ছোট ব্যাপারে, বড় ব্যাপারে আমার মনের কথা শুনে নেবার একটা যন্ত্র ওপরওলার কাছে আছে। নইলে ইতিমধ্যে না-বলতেই শুকনো তোয়ালে এসে যায় ? এবং তারপরে গরম গরম ধোঁয়া ওঠা চা-ও ? তোয়ালে-তে মাথা-মুখ, হাতপা মুছে ফেলা গেল, চা খেয়ে বুকের ভেতরের স্যাঁতসেতে ভাবটা শুকিয়ে নেওয়া গেল। ফরেস্ট বাংলোতে সব ক'টি ঘরেই অতিথি। একটি তরুণ পাঞ্জাবী পরিবার বেড়াতে এসেছেন, বাবা-মা, শিশুকন্যা, আয়া, ড্রাইভার সমেত। তাঁদের সঙ্গেও গল্প হ'লো একটু। বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে চা খাচ্ছিলেন তাঁরা। হঠাৎ দেখি একটি প্রাইভেট গাড়ি রওনা হচ্ছে কোথায় যেন। অমনি হাঁ-হাঁ করে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম—"কোনদিকে মশাই ? কোনদিকে ? যায়ে তো যায়ে কাঁহা ? "

—"ওটা নয়, ওটা নয়—ওটা অফিসের গাড়ি নয়"—তাড়াতাড়ি বন-অফিসার হেঁকে উঠলেন—"আমার গাড়ি ফিরে এলেই আপনাদের পৌঁছে দেবে। এটা প্রাইভেট গাড়ি।"—আমার কাছে প্রাইভেট গাড়িই বা কি —আর অফিসের গাড়িই বা কি ? আমি কি অফিসার ?

—"আরে ওতেই হবে! কাস্ট নো বার! আমিও তো প্রাইভেট সিটিজেনই! অ ড্রাইভার মশাই! অ ড্রাইভার সাহেব, আমাদের একটু নামিয়ে দেবেন গো ?"—অসহায় ড্রাইভারটি বারান্দায় বসা সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের দিকেই প্রশ্নসূচক চাউনি ফেললো। ভদ্রলোক আর কীইবা করেন ?—"নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!" না বললে তাঁর ভদ্রলোক থাকার আর

উপায় ছিলো না !—বহু ধন্যবাদ জানিয়ে, সহাস্যে হাত পা নেড়ে বিদায় নিয়ে তো দুজনে গাড়ি চেপে ফিরে এলুম। তখনো বৃষ্টি পড়ছে। কামরূপ কম্‌প্লেক্সে গাড়ি ঢোকার নানা অসুবিধে, দু'একটি খিল তোলা গেট খোলাতে হয়। বৃষ্টির মধ্যে আর দরওয়ানরা বেরুচ্ছে না! নেমে পড়ে নিজেরাই ছুটে ছুটে গেটের তলা দিয়ে গলে ভিতরে চলে গেলুম, গাড়িকে টা-টা করে দিয়ে। আরেকপ্রস্থ ভিজে যখন ফুকন দম্পতি সকাশে হাস্য-মুখে নাচতে নাচতে হাজির হলুম, তাঁরা উদ্বেগে ততক্ষণে ফ্যাকাশে হয়ে এসেছেন। কিন্তু অর্ঘ্যা দারুণ উত্তেজিত। তার এত চেনা এই জঙ্গল; অথচ এত মজা নাকি আর কোনোদিনই হয়নি তার এর আগে। আমার তো হয়ইনি। আমার তো আহ্লাদে গদগদ অবস্থা।

'চিত্রব্যাঘ্রে'র 'পদনখ চিহ্ন রেখা' দেখে আমার যত উত্তেজনা, আস্ত আস্ত তিনখানা গণ্ডার দেখেও ততটা না। দুটো হাতীই চুপচাপ সন্ন্যাসীর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিল। যেন শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়েছে। গণ্ডারগুলোও ঠিক তাই। আমাদের দেখেই তারা অবিশ্যি নড়েচড়ে গৃহীর মতো ফুরুৎ করে পালিয়ে গেল। হাতীরা মোটে নড়লই না, এমনই তাদের কন্‌ফিডেন্স। কত রকমের পাখ্‌পাখালি, কত বিল, (নাকি ঝিল ?) কত ঘাসবন, (নাকি শরবন ?) কত ঝির্‌ঝিরে জংলা নদী (নালা ?)। মাত্র ওই একটি জায়গায় একটু ঘনসবুজ আব্রু। উঁচু উঁচু বড় বড় গাছের লতাপাতার বনজঙ্গল। যেখানে হাতীতে চড়তে হয়। বাকীটা তো খোলামেলা। লম্বা লম্বা ঘাসে ভরা একরের পর একর জলা জমি। বৃষ্টিতে এক ঝাঁক হরিণ সেই জলের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। উঁচু ঘাসের ফাঁকে যেন ঢেউয়ের মতো গ্রেসফুল তাদের সেই দৌড়, আর সারিবদ্ধ পায়ের ধাক্কায় মাটি থেকে জলের শাদা ফোয়ারা উঁচু হয়ে লাফিয়ে উঠছিল বৃষ্টির মধ্যে—সে দৃশ্য ভোলবার নয়। বেঢপমোটা

শরীর, বর্মচর্মপরা খড়্গধারী রাইনোসেরাসের রিটায়ার্ড মধ্যযুগীয় যোদ্ধার মতো করুণ সং-সাজা চেহারা। অমন গাব্‌দা-গোব্‌দা গণ্ডারও যে অমনি চকিতে ঘাসবনে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, কে জানতো? সেও অবিস্মরণীয়।—জীবজন্তুর বন্যতার মধ্যে যে দুর্বার গ্রেস আছে, সেটা বনে না গেলে বুঝতে পারতুম না। হ্যাঁ শহরেও বেড়ালের হাঁটা-চলায়, কুকুরের আড়মোড়া ভাঙায় খুবই জান্তব গ্রেস দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু দ্রুত বেগের মধ্যে নিহিত যেটি, সেই গতির গ্রেসটা তো খোলা বনে না গেলে দেখা যাবেনা। একবার কর্ণাটকের এক সংরক্ষিত অরণ্যে, নামটা ঠিক মনে পড়ছেনা (নাগরকোট, কিম্বা নাগরকোয়েল জাতীয় হবে,) হাতীর পিঠে চড়ে যেতে যেতে ২৫/৩০টা বাইসনের একটা ঝাঁককে অবাক হয়ে যেতে দেখেছিলুম। তাদের সেই বিস্মিত দৃষ্টি, এবং মুহূর্তে ছুটে পালানোর পদধ্বনির বাজনা, এবং সেই আকস্মিক ধূলোওড়া আর শুকনো পাতা ওড়ার দৃশ্য, আর তারও আগে, তাদের সেই শিং সুদ্ধু মাথা নিচু করে স্থির নিষ্কম্প হয়ে শাদা শাদা ভয়-পাওয়া-রাগ-হওয়া চোখে আমাদের পর্যবেক্ষণ করার ভয়ংকর মুহূর্তটি আমার স্মরণে বিদ্ধ। সেবারে একটা চকিত হলুদ বিদ্যুৎও দেখেছিলুম ঘাসের মধ্যে। কী জানি কী জন্তু, কুকুর না হরিণ? ফরেস্ট অফিসে ফিরে এসে দেখি টিন পেটাতে পেটাতে, জ্বলন্ত মশাল নিয়ে বহু লোক বেরিয়েছে—একটা হলুদ বাঘ এসে একটু আগেই নাকি বন অফিসের পোষা হরিণটা ধরে নিয়ে গেছে। আমরা সেটাকেই হলুদ বিদ্যুতের মতো আসতে দেখেছিলুম। তখন একবারও ভাবিনি ওটা বাঘ হতে পারে। "অনেক গভীর বনে যদিও বাঘ আছে, কিন্তু তাদের দেখা যায়না"—এটাই শুনেছিলুম। দেখা যাবে হরিণ, নীলগাই, শেয়াল, হাতী—আর ভাগ্যে থাকলে বাইসনের দেখা পেতে পারি। তা সেবারেও আমার ভাগ্য অতিরিক্ত

ভাল ছিল, এবারেও। আসামের জঙ্গলের বৃষ্টি পর্যন্ত দেখা হয়ে গেল। সোজা কথা? সবাই অবশ্য বললো বৃষ্টি না পড়লেই ভাল হত। ঢের পাখি উড়ত, বাঁদর বেরুত, ঢের বেশি জীবজন্তু দেখা যেত। তা যাক গে, বেশি জন্তু দিয়ে আমার হবেটা কী? সে তো চিড়িয়াখানাতেই আছে। এমন জংলা "আবহাওয়া সৃষ্টি" করত কে, মেঘ-বিদ্যুৎ আর কলসী থেকে ঢালা জলের মতো মোটা ধারার বুনো বৃষ্টি ছাড়া? এমন সকাল বেলার বাদল আঁধারে, কালো মেঘের গুরু গুরু ডাকের মধ্যে, ঝরঝর ঘোর বর্ষার মধ্যে, মানসিং নামক হস্তিপৃষ্ঠে বনবিহার,—আঃ! এর স্বাদই অন্য!

এখনও অর্ঘ্যা আমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানায়। আর বৃষ্টির সেই দিনটির কথা উল্লেখ করে। তাইতে টের পাই, দিনটা আমার একলারই অদ্বিতীয় সম্পদ হয়ে নেই। ওতে সত্যিই কোনো জাদু ছিল।

যেমন কথা ছিল, ঠিক শীলা বরঠাকুর স্বামী-পুত্র সমেত গাড়ি নিয়ে এসে পড়লেন।

—কাজিরাঙ্গা কেমন লাগলো? বৃষ্টি হয়ে সব নষ্ট, না?

—মোটেই না, মোটেই না! দারুণ লেগেছে! দারুণ!

—সত্যি?

—কাল রাত্তির তো কেটেছে এককেবারে বনদেবী স্টাইলে। বনের পশু পাহারা দিয়ে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ নদীর জল খেতে বন্য জন্তুরা তো আসে রাত্তির বেলায়? অনেক রকমের আশ্চর্য বুনো শব্দ শোনা যায়। রাতপাখির গা কাঁপানো শিস্, শেয়াল আর ব্যাংএর কেত্তন তো আছেই, তার ওপরে পাতার খস্‌খস্, দূরে দূরে অজানা জন্তুর গর্জন, তার ওপরে আবার কাল রাত্তিরে

কোন্ একটা যেন উটকো জানোয়ার মনে হ'ল এপারে চলে এসেছে। আমার কুটিরের দেয়ালে গা ঘষ্‌ছিল। বাইরে দিকে, নদীর দিকে। ওদিকে জানলা টানলা নেই ভাগ্যিস—তবে স্পষ্ট আওয়াজটা শুনেছি, অনেকক্ষণ। ঘরে বসেই জঙ্গলের স্বাদ মিলেছে। অনেক ধন্যবাদ।

—হ্যাঁ, সেটা পাবেন। বনের শব্দ শুনতে পাবেন। এটা এখানে প্রায়ই ঘটে। সম্ভবত আপনার কপালে গণ্ডারই এসেছিল, ওরা খুব গা ঘষে। ভয়ের কিছু নেই কিন্তু,—ভয়টয় পেয়েছিলেন নাকি? জীব জন্তু এসে আমাদের এই কটেজগুলোর দেয়ালে প্রায়ই গা ঘষে যায়। আমারই বলে দেওয়া উচিত ছিল। ভয় পাননি তো? বেরুবার চেষ্টা করেননি তো?

—না না, পাগল? বেরুবো কেন্? আমার অবিশ্যি তেমন জঙ্গলে ঘোরা অভ্যেস নেই, কিন্তু ক্যালিফর্নিয়ায় ছাত্রজীবনে একবার ইওসেমিটি ন্যাশানাল পার্কের জঙ্গলে ক্যাম্পিং করেছিলুম। রাত্তির বেলা ভাল্লুক এসে আমার তাঁবুর গায়ে গা ঘষেছিল, আর ময়লার টিন হাত্‌ড়ে এঁটো খাবার দাবার খেয়ে গিয়েছিল। আমি আরেকটু হলেই উল্লাসের চোটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ছিলুম ভাল্লুক দেখতে। আমার বান্ধবী আমার হাত টেনে ধরে আটকে রেখেছিল, বলেছিল, এমনিতে কিছু না করলেও, গ্রিজলি বেয়ার নাকি তেমন লোক ভালো নয়।

বুনোজন্তুকে বিশ্বাস নেই। কখন কী করে!

এমন চমৎকার জঙ্গলের শব্দের মধ্যে আমার জীবনে একলা-একলা রাত কাটলো এই প্রথম। ভাগ্যিস জানোয়ারটি এসেছিলো, ওর কাছে আমার তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত!

—"অর্ঘ্যাকে এখানে শুতে বললেই হতো।"

—"কি আশ্চর্য, আমার সত্যিই কোনো অসুবিধা হয় নি। ভয়

করেনি। একটুও না।"

সাহিত্যের বই, কবিতার বই ওখানে প্রচুর। জগদীশ ফুকন কলকাতায় আমাদের বন্ধু হামদি-বে, আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীরও বন্ধু। তাঁদের নিমন্ত্রণ পাঠালেন। আর আমাকে বললেন যখনই লেখার জন্য বিশ্রাম এবং নির্জনতা দরকার হবে "কাজিরাঙ্গা ইন্‌ন্‌" এর উষ্ণ আতিথ্য আমার জন্য সব সময়ে খোলা।

—"অত টাকা কোথায় পাব মশাই? এখানে নিজের খরচে থাকা আমার সাধ্যি নয়"—

—"পয়সা দিতে কে বলেছে? আপনার কলম দিয়ে ভাল একটি লেখা বেরুলেই আমরা মনে করবো সব পাওনা মিটে গেল—" ধমকে উঠলেন জগদীশ। —"আতিথেয়তা মানে আতিথেয়তাই। আমরা একা একা বনেজঙ্গলে পড়ে আছি। সহমর্মী বন্ধু পেলে খুশি হই। চলে আসবেন, যখনই ইচ্ছে করবে। বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে আসার নেমন্তন্ন রইলো। নীরেনকে, হামদিকেও বলবেন।"

এটা ১৯৭৭, তখনও আসামে বিদেশী বহিষ্করণের কর্মকাণ্ড সুরু হয়নি। তখনও শিল্পপ্রীতিকে ছাড়িয়ে রক্তে ডঙ্কা বাজায়নি রাজনীতি। আমি আসামের যে এক উষ্ণ, প্রেমময়, চেতন, অমানী, শ্রদ্ধেয় মূর্তি দেখে এসেছি, পরে নানাভাবে সেই মূর্তির হানি ঘটিয়েছে সংবাদপত্র আর রেডিও, আসাম থেকে চিঠি, ছাপা পত্রিকায় রিপোর্ট আর উদ্বাস্তু মানুষ। আমার দেখা ছবির সঙ্গে পরবর্তী ছবি মেলানো বড় শক্ত।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি শেষ খেলায় মানবিকতাই জেতে। ওটা একটা সাময়িক চিত্তবৈকল্য, রাজনীতির হাতসাফাইয়ের খেলা, ইনডিয়ান রোপ-ট্রিক। ওটা আমাদের আত্মা নয়।

শীলা বরঠাকুর সপতি সপুত্র এবং স-প্রধানঅতিথি সভাশেষ করে ঘরে ফিরছেন। আমাদের গাড়ি গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে একটি ফেরি-স্টিমারে চড়ে বসলো। ৬টি গাড়ি পরপর চড়তে পারে তাতে। আমরা দোতলায় গিয়ে বসলুম ডেকের ওপর। ঢাকা বারান্দায় চা নিয়ে বসা যায়। যাচ্ছি তেজপুর। শীলা বলেছে তেজপুর না দেখে কেবল যোড়হাট অবধি দেখে ফিরে গেলে সেটা মোটে আসাম দেখাই হল না। আমি তো গৌহাটিতেও যাইনি! ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গেই দেখা হয়নি। তেজপুর উত্তরে, পাহাড়ী অঞ্চলে। সত্যি খুব সুন্দর জায়গা, সবুজ বনপাহাড়ী আছে, ব্রহ্মপুত্র তো আছেই। যোড়হাটের মতো ফ্ল্যাট নয়। বর্ণহীন নয়। আমার অবিশ্যি যোড়হাটও দিব্যি ভালো লেগেছিলো। কলকাতার চেয়ে অনেক অন্যরকম তো? অনেক খোলামেলা জায়গা আছে। এক বিজয়-রাণী হেনড্রিকের বাড়ির ভেতরেই তো কতখানি জংলা জমি। পুকুরও আছে মনে হলো। ধানক্ষেতও চোখে পড়লো। ফুলগাছ, ফুলবাগান তো আছেই। আর বসত বাড়িটাই বা কী আশ্চর্য সুন্দর! বাসগৃহে কাঠ, বাঁশ, বেতের এমন শিল্পসম্মত ব্যবহার রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ নিশ্চয় আসাম ত্রিপুরা থেকেই শিখেছিলেন, মনে হলো। আমি যখন যাই তখনও বিজয়ের পিতৃদেব জীবিত ছিলেন। আজ তিনি আর নেই। আছে তাঁর বিপুল গ্রন্থাগারটি তাঁর পাণ্ডিত্যের স্মৃতি নিয়ে।

মহানদ ব্রহ্মপুত্র

ফেরিবোটে চড়ে ব্রহ্মপুত্রের দিকে চেয়ে বুক ভরে গেল। মস্ত নদী। ওপার দেখা যায়না। দূরে দূরে সবুজ সবুজ ফোঁটা, বনজঙ্গলভরা দ্বীপ ছড়ানো। প্রথমেই মনে হলো এমন দ্বীপে-ভরা নদী আগে দেখিনি আমি। হ্যাঁ, দেখেছি তো? জার্মানীতে। রাইন নদীর বুকে অনেক পাহাড়ী দ্বীপ। আর সেসব দ্বীপের বুকে অনেক প্রাচীন দুর্গ। রাইন নদীতে একটা দীর্ঘ নৌকাবিহার করেছিলুম একবার। দ্বীপের বহর আর দুর্গের শোভা দেখে থ' হয়ে যেতে হয়। যেন রূপকথার কেল্লা সব। আর ভাগলপুরী গঙ্গার বুকেও অনেক ছোট ছোট পাথুরে দ্বীপ আছে বটে। গৈবীনাথ যেমন একটা, আরো ঢের আছে, আঠারো-উনিশ শতকের সাহেব শিল্পীরা অনেক স্কেচ রেখে গেছেন সেই সব দ্বীপের।

কিন্তু বাংলাদেশে দেখিনি তো! আমার এই দুটো চোখ অনেক-ঘুরেছে, অনেক দেখেছে। কিন্তু মন প্রথমেই ছোটে কেবল এই বাংলার গণ্ডীটুকুর মধ্যে। 'বাংলাদেশ' বলতে আমি পূর্ববঙ্গ বলছিনা। এই বিশেষ নামকরণে আমার কিন্তু বুকের ভেতর থেকে একটা হাহাকার আপত্তি হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ বলতে বোঝায় সমস্ত বাঙালীর জন্মভূমি, যেখানে বাংলা ভাষা বলা হয়—তারপর তার পূব আর পশ্চিম। একটা অংশকে পুরো বাংলাদেশ বলব, আরেকটাকে কেবল পশ্চিমবাংলা, এমন অর্থ-পারম্পর্য-হীন লজিক শূন্য নামকরণ জগতে আর কোথাও দেখিনি। কেউ বলে কোরিয়া, নর্থ কোরিয়া? কিম্বা ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম? কিম্বা জার্মানী আর পশ্চিম জার্মানী? কেবল বাঙালীর বেলায় আমরা এই

সুব্যবস্থা করেছি। নিজেরাই করেছি, নিজেরা মেনেও নিয়েছি। এ নিয়ে কারুর কোনো মনোকষ্ট নেই। আমি 'বাংলাদেশ' এর বাসিন্দা নই আর। উদ্বাস্তু না হয়েও বাস্তু থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বহুকাল প্রবাসী বাঙালী ছিলুম, ছুটি ছাঁটায় আমরা তো বাংলাদেশেই ফিরতুম দিল্লী থেকে। তার মানে ঢাকা—চট্টগ্রামে নয়। কলকাতা-বর্ধমানেও।

যাই হোক, পূর্ববঙ্গের অসামান্য নদী স্বচক্ষে দেখার ভাগ্য এখনো আমার হয়নি, বইতে পড়েছি 'চর' এর কথা। চরজাগা 'দ্বীপ' এর কথা। তারপরে মনে পড়লো আমাদের সুন্দরবনের মধ্যে প্রচুর দ্বীপ আছে বটে, ব-দ্বীপ। তেমনি এও পলিমাটি জমে তৈরি দ্বীপ। ব্রহ্মপুত্রের বৈশিষ্ট্য এই দ্বীপের কথা মেয়েকে জিওগ্রাফি পড়াতে গিয়ে পড়েছিলুম বটে।

ফেরি ছাড়তে তখনো কিছু দেরি। হাতে শাদা ফুল ছিল। 'কামরূপ কমপ্লেক্সে'র ফুল। মিসেস ফুকনের দেওয়া। কী মনে হলো রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে একটা ফুল যেই ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে ছুঁড়ে দিয়েছি, চোখের পলকে ফুলটা বহুদূরে চলে গেল! আশ্চর্য তো! এত চওড়া একূল ওকূল দেখা-না-যাওয়া-নদী, তার এমন খর স্রোত? যেন একরত্তি পাহাড়ী ঝর্ণা?

ওঃ হো, এইজন্যেই তুমি বুঝি নদী নও, নদ? এমন দুর্জয় গতিময়তা, এমন দুর্দান্ত শক্তি আছে বলে? নদী হ'তে যদি, আরেকটু ধীরস্থির হ'তে। আরেকটু শান্ত নম্র, আরেকটু ভারভরন্ত চলাফেরা হতো! যেমন গঙ্গা, যেমন যমুনা, যেমন গোদাবরী। তবে হ্যাঁ পঞ্চনদ নাম যারই থাক, বাংলায় আমাদের নদের অভাব নেই। শুধু পশ্চিমেই আছেন দামোদর, রূপনারায়ণ, অজয়, দ্বারকেশ্বর, বরাকর। এই তো পাঁচ-পাঁচটি কেউ-কেটা। হাঁ করতেই মুখে এসে যায় ক্লাস ওয়ান অফিসার এই পাঁচজনের নাম। কিন্তু তাঁরা কখনও হাঁটুজল, কখনও বুক চিতিয়ে

বালির পাঁজরা বের করে, দাঁত ছিরকুটে পড়ে থাকেন, কঙ্কালসার। আবার কখনও সহসা জাগ্রত কুম্ভকর্ণের মতো ধেয়ে আসেন খোলা স্লুইসগেটের প্রশ্রয় পেয়ে। ভাসিয়ে নিয়ে যান আচম্‌কা গাঁ গঞ্জের জনমানুষ। ব্রহ্মপুত্রও বান ডাকাতে ওস্তাদ, কিন্তু হাঁটুজল—কোমরজল, কিম্বা পায়ের পাতা ডোবেনা—বালিসর্বস্ব, এমনতর হা-ভাতে ক্লিষ্ট চেহারা তার হয় না কখনো নিশ্চয়। পূর্ববঙ্গের আড়িয়াল খাঁ যেমন, নামটি শুনলেই মনে হয় সেনাপতি। চোখে ক্রোধ, হাতে খোলা তলোয়ার। ব্রহ্মপুত্র শুনলেই মনে হয় মাথার দুধ-শাদা পাগড়ীতে বকের পালক গোঁজা, শাদা ঘোড়ায় চড়ে ছুটে চলে যাচ্ছে।

আমার মাথায় কী ঝোঁক চাপলো, স্রোতের মধ্যে আবার, আবার ফুল ছুঁড়ে ফেললুম, ওঁ ব্রহ্মপুত্রায় মহানদায় নমঃ। আবার আবার ব্রহ্মপুত্র লুফে নিল। মুহূর্তের মধ্যে রিলে হয়ে চলে গেল ঐ দূরের দ্বীপের দিকে। এতক্ষণে ফুল নাম্বার ওয়ান হয়ত ঐ দ্বীপের পাথুরে কাদায় গিয়ে নোঙর গেড়েছে। বেশ ভাব হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। চেহারা অতখানি সম্ভ্রান্ত হলে কি হবে বাপু, স্বভাবটা তোমার মোটেই হোমরা-চোম্‌রার মতন ধীর স্থির নয় দেখছি! বিপুল বদন ব্যাঘ্র খৈরী যেমন ছোট্ট রবারের বল নিয়ে খেলা করতো, বিপুলবপু ব্রহ্মপুত্রও তেমনি ছোট্ট ফুল নিয়ে খেলছো দেখি আমার সঙ্গে?

জীপ-বাবু

এক বাঙালী ভদ্রলোকও এই খেয়া নৌকোতে যাচ্ছেন, তাঁর জিপ গাড়ি করে। জিপ গাড়িতে চারিদিকে হলুদ রং ছাপা পর্দা ঝোলানো—আমি তো মুগ্ধ। তারপর দেখি পর্দার ফাঁকে কচিকচি মুখ। স্ত্রী আছেন, বাচ্চারা আছে, তাঁরা সবাই বাংলা বলছেন। বাড়ি কোথায়?—তেজপুর।

—তেজপুরে যাচ্ছেন?

—আমরা তেজপুরে উনি বম্‌ডিলা।

বম্‌ডিলা?—এই তো আমি খুঁজছি!

—তেজপুর থেকে বম্‌ডিলা কতদূর?

—খুব বেশি দূর নয়।

—চীনেরা এসেছিল না বম্‌ডিলাতে?

—'ভাগ্যিস তেজপুরে আসেনি?'—শীলা বলে। 'তেজপুরে অবশ্য দারুণ ভয় হয়েছিলো "ঐ চীনেরা এসে পড়লো" বলে। অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলো।'

'—চীনেরা কিন্তু বম্‌ডিলা থেকেই ফিরে গিয়েছিল ঐ লাসা—তাওয়াং রোড ধরে!'

জিপওয়ালা ভদ্রলোক বলেন।—'দারুণ রাস্তা তৈরি করেছিল কিন্তু দশদিনে! এখনো ঠিকঠাক আছে প্রায় কোনো ক্ষতিই হয়নি শুনতে পাই।'

—তাওয়াং? যেখানে তাওয়াং মনাষ্টারি আছে? বম্‌ডিলা থেকে

সেখানে যাওয়ার সোজা রাস্তা না ?

—হ্যাঁ। তাওয়াং দিয়েই তো ঢুকেছিল চীনেরা। ঐখানেই টিবেট বরডার তো, ম্যাকমাহন লাইন।

শুধু অকারণ পুলকে

—"আচ্ছা, তাওয়াং যেতে হলে কেমন করে যাবো জানেন ?

—"কি বললেন ? তাওয়াং যাবেন ? কেন ? হঠাৎ তাওয়াং…? আপনি বুঝি টিবেটান হিস্ট্রি নিয়ে কাজ করছেন ? হ্যাঁ ওখানে ঐ বিষয়ে অনেক মেটিরিয়াল পাওয়া যাবে—"

—"—"

—"না ? তিব্বতের হিস্ট্রিতে আপনার উৎসাহ নেই ? তবে ? তাওয়াং ? ও, ফিলসফির লোক নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, বুদ্ধিস্ট ফিলসফির পক্ষেও—"

—"—"

—"তাও না ? হিস্ট্রিও নয়, ফিলসফিও নয় ? তবে ? দাঁড়ান, বলছি, সিনো-টিবেটান ল্যাঙ্গুয়েজেস ?—তাওনা ?"

এবার ভদ্রলোককে সত্যি উদ্বিগ্ন দেখায়, "তবে কি অ্যানথ্রপলজি ? মোম্‌পা-খাম্‌পার দ্বন্দ্ব ? ট্রাইবাল কালচার ? তাও নয় ? অ ! এবার বুঝেছি। পলিটিকাল সায়েন্স ! বর্ডার ডিসপিউট, ম্যাকমাহন লাইন। এই তো ? বলুন, ঠিক ধরেছি কিনা ? চাইনিজ অ্যাগ্রেশন, লাসা-তাওয়াং রোড। বম্‌ডিলা অকুপেশন। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে মোটামুটি ১৯১৪, ১৯৩৭-৩৮-৩৯, ১৯৫১ আর ১৯৬২—এই ডেটগুলো আপনার জরুরি।

হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা তাওয়াং ইজ কোয়াইট ইম্পর্ট্যাণ্ট, পজিশনালি !"

—"কিন্তু আমি এগুলোর কোনোটা নিয়েই গবেষণা করছি না। মোটে গবেষণাই করছিনা তাওয়াং নিয়ে। হঠাৎ খুব ইচ্ছে করছে তাওয়াং যেতে! ১৯৭৫এ, শিলঙে, একটি দার্শনিক বন্ধুর (রীতা গুপ্ত) কাছে শুনেছিলুম প্রচুর নাকি রেয়ার তিব্বতী পুঁথি আছে ওখানে। কিন্তু খুব দুর্গম পথ। কেউই বিশেষ যায় না। ভেরিয়ের এলুইন অবিশ্যি গেছলেন, ক'বছর আগে।"

—"মিসেস কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়ও তো গিয়েছিলেন। গেলে কি হবে ? ফিরতে পারেননি।"

—"সে কি কথা ? উনি এখন দিল্লীতে নেই ?"

—"এখন আছেন হয়তো, তবে অনেকদিন ছিলেন না। তাওয়াংয়ে আটকে ছিলেন। বরফ পড়ে, পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পুরো শীতকালই থাকতে হতো তাঁকে, যদি না হঠাৎ একজনের হার্ট অ্যাটাক হতো।"

—"অ্যাঁ ? কার আবার হার্ট অ্যাটাক হল ? ওঁর কোনো আত্মীয়র বুঝি ?"

—"নানা, সে ওঁর কেউ নয়, তাওয়াংয়ে পোস্টেড একজন অফিসারের। মিলিটারি হেলিকপ্টারে করে তাঁকে বম্‌ডিলায় নামানো হলো—সেই সঙ্গে কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়কেও। বয়স্কা মহিলা, অত ঘোর ঠাণ্ডায় শেষে তাঁর কিছু হয়ে গেলে—নইলে তো এমনিতে মিলিটারি ভেহিকলে সিবিলিয়ান মেয়েদের রাইড দেওয়া নিষেধ। কিন্তু উনি সরকারি কাজেই গেছলেন তো, ওই আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স সেণ্টারের ব্যাপারে।"

—"আপনিও তাওয়াংয়ে ছিলেন ?"

—"না না, আমি কেন মরতে যাব অত শীতে, ঐ পাণ্ডববর্জিত

জায়গায় ? জানেন তো ওটা আবার ট্রীলাইনের ওপারে ? বড় গাছ-পালা কিস্যু হয়না, পাখীপক্ষী নেই, যাচ্ছেতাই জায়গা মশাই, শখ করে কেউ যায়না। নাথিং টু সী, একসেপ্ট তিবেটান ইয়াক্‌স্‌ অ্যাণ্ড বুদ্ধিস্ট মাংক্‌স্‌। কেবল চমরীগাইতে আর বৌদ্ধলামাতে ভর্তি। ওই দেখতে আপনি যাবেন ? ছোঃ। অবিশ্যি গুম্ফাটা ইনডিয়ায় বিগেস্ট। ওয়ার্লডে সেকেণ্ড বিগেস্ট। সবচেয়ে বড়টা তো লাসায়। ধরমশালারটাই বলুন, লে-র টাই বলুন, সেসব গুম্‌ফা তাওয়াংয়ের চেয়ে ছোট। আর কারুর এতবড় লাইব্রেরি নেই। দু'হাজার-এরও বেশি পুঁথিপত্র আছে। সোজা-কথা ? ম্যানাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরি তো ? ইভ্‌ন্‌ স্বর্ণাক্ষরে লেখা বই ইন-ক্লুডেড। তবে ওসব বইয়ে আপনাকে হাতও দিতে দেবে না। প্রত্যেক-টাকে গাছের বাকলের কাপড়ে জড়িয়ে, দড়ি দিয়ে বেঁধে, তাকে তুলে রাখে। শুনেছি নিয়মিত নামায়, ঝাড়ে পোঁছে, পরিষ্কার করে। বরফের দেশ তো, হাজার হাজার বছরেও, পোকাও ধরেনি, নষ্টও হয়নি, এত যত্নে রেখেছে। পড়তে অবশ্য কেউই পারেনা! অত প্রাচীন তিব্বতী আর ক'জন জানে ? আচ্ছা, আপনি যেতে চান কিসের জন্যে ? প্রাচীন তিব্বতী আপনি কি পড়তে পারেন ?"

—"পারিনা, পারিনা। বলছি তো, গবেষণা নয়। নিছক কৌতূহল মাত্র। 'পাহাড়টা আছে, তাই উঠেছি' বলার মতন। তাওয়াং-টা আছে, তাই যেতে চাইছি।"

—"তার চে' গৌহাটি যান না কেন ? গৌহাটিও তো আছে। যাওয়াও অনেক সরল, সেফ, এবং গৌহাটিতে প্লেনটি টু সী। কামাখ্যাদেবী দেখেছেন ? গৌহাটি ইউনিভার্সিটি ? কটন কলেজ ?"

—"না। দেখব এখন। আগে তাওয়াংটা সেরে নিই। তা আপনি তাওয়াংয়ের এত খবর রাখলেন কী করে ? নিজে যখন যাননি ?"

—"বম্‌ডিলায় আমার অনেকদিন হলো তো ? বম্‌ডিলাতে সব খবরই আসে। তাওয়াং অঞ্চল থেকে তো হামেশাই মিলিটারিমেনরা নিচে আসছে। অবশ্য তাওয়াং ইটসেল্‌ফ মিলিটারী-ফ্রি এরিয়া, ঐ চল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে না ইনডিয়ার, না চীনের, কোনো পক্ষেরই মিলিটারি ক্যাম্প থাকতে পারবে না।"

—"বেশ সুব্যবস্থা তো ? বর্ডারে গার্ডরা নেই ?"

—"আছে। তারা থাকে একদম বর্ডারেই। চীনে আর ভারতীয় সেপাইগুলো নাকি একসঙ্গে খানাপিনা করে। তাওয়াং-এর এদিকে, জাং বলে একটা জায়গায় আমাদের শেষ মিলিটারি ক্যাম্পটি রয়েছে। অর্থাৎ ওপেন ক্যাম্প। সিক্রেট বাংকার্স, আণ্ডারগ্রাউন্‌ড ক্যাম্পস নির্ঘাৎ আছে তাওয়াংয়ে আমাদের। ওপরে কিছু দেখাই যাবে না। সবই সাবটেরানিয়ান ব্যাপার।"

—"সত্যি ? ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এ যে ঘনাদার গল্পের মতন ? আরো উৎসাহ হচ্ছে যেতে, বেশ সাবটেরানিয়ান বাংকার্সগুলো দেখে আসব। কখনো তো দেখিনি ?"

—"মুণ্ডু দেখবেন। আপনাকে নেমন্তন্ন করে দেখাতে নিয়ে যাবে, না আরও কিছু। টপ্‌-সিক্রেট ওসব। তাওয়াং-য়ের খাস বাসিন্দেরাই এখবর সাতজন্মে জানে না ! আপনি সত্যি কী যে ভেবেছেন জানি না। ওটা খুব সেনসিটিব এরিয়া মশাই। ইনার লাইন পারমিট নিয়েছেন ? যাবো যাবো করে লাফাচ্ছেন যে বড় ? পারমিট পারবেন যোগাড় করতে ? চেনেন কাউকে ?"

—"ইনার লাইন পারমিট ? সে আবার কি ? কোথায় পাওয়া যায় ?"

—"সেটা হচ্ছে ওই রিজার্ভড এরিয়ায় ঢোকার জন্যে সরকারী অনুমতিপত্র অর্থাৎ পাসপোর্ট আরকি, বুঝলেন ? অরুণাচলের গভর্নমেণ্ট

থেকে ইস্যু করে। যাকে তাকে দেয় না। রীজন দেখাতে হবে। ভ্যালিড রীজন।"

—"কোথায় যেতে হবে সেটা নিতে?"

—"ইটানগর। ইটানগর যেতে হবে।"

—"সেটা কোন দিকে? তেজপুর থেকে কতদূরে? বম্‌ডিলার পথে পড়বে?"

—"বম্‌ডিলার উল্‌টো দিকের রাস্তা।"

—"তাই নাকি? এ মা। তবে তো মুশকিল হলো। আপনি তো পরশু সকালেই বম্‌ডিলা চলে যাবেন।"

—"আমার সঙ্গে আপনার কী?"

—"ভাবছিলুম বম্‌ডিলা পর্যন্ত যদি আপনার জিপগাড়ি করে যাওয়া যেত।"

—"পারমিট যোগাড় হয়ে গেলে, যেতে পারেন। আপত্তির কিছু নেই তেমন। কিন্তু বম্‌ডিলায় গিয়ে থাকবেন কোথায়? আমার ওখানে ওসব ব্যবস্থা হবে টবে না। আমার ফ্যামিলি এখন তো থাকছে না ওখানে। ইন্সপেকশন বাংলোতে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু বম্‌ডিলাতেই বা যাবেন কেন? দেখবার ওখানে আছেটা কী? সেখান থেকে তো তাওয়াং বহু দূর মশাই। তাছাড়া তাওয়াং এ যাচ্ছেন কার সঙ্গে? সঙ্গী যোগাড় করুন আগে। ওসব জায়গায় কখন্ কী হয়ে যায়, একা একা যাবেন না খবর্দার।"

—"সঙ্গী? সঙ্গী আমি কোথায় পাব? আচ্ছা, এই শীলাকেই জিজ্ঞেস করে আসি, দাঁড়ান। বেশ উৎসাহী মানুষ যদি যেতে রাজী হন?" শীলা প্রথমে খুবই অবাক হয়ে যায়। তারপরে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, শেষে একটু বিরক্তও, বোধ হয়। তার স্বামীপুত্রের সামনে প্রধানা অতিথির এ কি পাগলামি বল দেখি? এতে কি মহিলা সাহিত্য সভার প্রেস্টিজ থাকে? স্বামীপুত্রের কী ধারণা হল? তারা কি চোখের কোনাচ দিয়ে হাসবে না? ঠাট্টা তামাশা করবে না কি পরে? অগত্যা আমাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বলেন "হঠাৎ তাওয়াং যাবেন কেন? খুবই অসুবিধের রাস্তা, তাছাড়া খুবই ঠাণ্ডা, আপনার সঙ্গে তো কেবল একখানা কম্বল দেখতে পাচ্ছি। আমার বাড়িতে এখন নানান্ অসুবিধে, এতদিন সাহিত্যসভা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলুম বলে বহু কাজ জমেছে, ছেলেরও পড়াশুনো আছে, আমার তো এখন কোথাও যাবার সুবিধে হবে না। কে যাবেই বা আপনার সঙ্গে? তাছাড়া ওভারকোট চাই, মাফলার চাই, বাঁদরটুপি চাই, দস্তানা চাই, উলের মোজা, জুতো, মোটা সোয়েটার, গরম গেঞ্জি, গরম ইজের, যেতে হলে কত কি চাই। এসব কি এখন কিনবেন আপনি? বহুৎ খরচের ব্যাপার। এতকাল বিদেশে ছিলেন যখন, নিশ্চয়ই আপনার ঘরেই একপ্রস্থ আছে এসব। অবশ্য জানি, লেখক-কবি-টবিরা একটু একসেনট্রিক হয়। তাবলে এত-খানি? তাওয়াংয়ে আপনার তো সত্যি কোনো জরুরি দরকার নেই? তার চেয়ে চেপে দশদিনই বসে থাকুন দিকিনি তেজপুরে? বরং

ডিব্রুগড়ে বেড়াতে যান কি দুলিয়াজানে ঘুরে আসুন। নীতির কাছে তো নেমন্তন্নই আছে আপনার। দেখবেন অয়েল ইনডিয়ার ব্যাপার স্যাপারই কেমন আলাদা? খুব আরামে রাখবে, খুব যত্ন আদর করবে। তাছাড়া আপনার শরীরও ভাল নয়। দিনে চোদ্দবার তো ওষুধ খাচ্ছেন, দেখছি। তাওয়াংয়ে যাওয়ার কথা কে ঢোকাল বলুন তো হঠাৎ আপনার মাথায়? ও-ভাবনাটা ছেড়ে দিন।" শীলা এত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছে তেজপুরে তার কাছে বেড়াতে, তার সঙ্গে ঝগড়াও করতে পারি না। অথচ আমার "উঠল-বাই-তো-কটক-যাই" স্বভাব। একবার যখন ভেবেছি যাবো, তখন আন্তরিক চেষ্টাটা করে দেখবো। নেহাৎ না হ'লে, তখন হ'বে না। তা বলে অন্যের কথায় ছেড়ে দেবো না। নিজেই শীলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি —"না না আপনাকে সঙ্গে যেতে হবে না, কিন্তু আপনার কি ওভারকোট আছে? এবং অথবা মোটা সোয়েটার? কিম্বা বাঁদুরে টুপি?"

শীলা অবাক হয়ে গিয়ে বলেন—"ওভারকোট? আছে। বাঁদুরে টুপি নেই।"

—"কোটটা আমাকে ধার দেবেন? ঠিক ফেরৎ পাবেন, যদি বেঁচে থাকি।"

—"ও কি অলুক্ষুণে কথা। ফেরৎ পাবোনা কেন? কোট নিশ্চয়ই ধার দেবো। কিন্তু, যাওয়াটি বাদ দিলেই ভাল হত না?"

—"ইনারলাইন পারমিটের জন্য ইটানগরে যেতে হবে শুনছি, কী উপায়ে যাই বলুন তো?"

—"ইটানগরে যাবার কোনো দরকার নেই"—এতক্ষণে কথা বলেন শীলার স্বামী মিস্টার বরঠাকুর।—"ওটা তেজপুরেই পাওয়া যায়, অরুণাচলের এ, ডি, সির অফিস থেকে। আপনার চাই? আমি ওদের চিনি, বলে দেব।" আমি তো হাতে চাঁদ পেয়েছি। নেহাৎ নিজে পরস্ত্রী, না

হলে মিস্টার বরঠাকুরকে জাপ্টে ধরার একটা প্রেরণা এসেছিল। এতক্ষণ গাড়িতে ওঁর বা ওঁর ছেলের সঙ্গে একটাও প্রায় কথা হয়নি। দুজনের কেউই বিশেষ বাক্যবাগীশ নন। কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারে অক্লান্ত সহযোগ দেখেছি সভার সময়ে। কিশোর ছেলেটিও খুব খেটেছে, খাবার দাবার পরিবেশন করেছে, গাড়ি চালিয়ে বারবার ট্রিপ দিয়ে অতিথিদের যাতায়াতের সহায়তা করেছে। শীলা সত্যি খুব সুভগা। স্বামী সন্তানের কাছে সাধারণত বাড়ির বাইরের শখের কাজে গৃহিণীরা মোটেই সহায়তা পাননা। পান টিট্‌কিরি। কিন্তু শীলা বরঠাকুর সপরিবারেই সভাটি "তুললেন"। বেশি পুরুষমানুষ স্বেচ্ছাসেবক অবশ্য দেখিনি। মেয়েরা খেটেছে প্রচুর।

—"তাওয়াং যাওয়ার আইডিয়াটা ছেড়ে দেয়াই ভাল"—শ্রীবরঠাকুর বললেন—"তবে প্রয়োজন হ'লে বলবেন, ইনারলাইনের পারমিটের জন্যে বলে দেব।"

জিপের ভদ্রলোক বললেন—"সঙ্গী না পেলে ওঁর কোটটা দিয়ে কী করবেন? একা ওপথে ট্র্যাভেল করার প্রশ্নই নেই। তাওয়াং অবধি যাবেনই বা কিসে? উঠবেন কোথায় গিয়ে? সব বন্দোবস্ত তেজপুর থেকেই করে বেরুতে হবে। আমার সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে বম্‌ডিলা গিয়ে লাভ নেই। লোকাল বাস যায় তো তেজপুর টু বম্‌ডিলা। বাসেই যেতে পারেন। ফার্স্ট, মেক প্রপার অ্যারেঞ্জমেণ্টস্, ক্লিয়ার, কম্‌প্লিট এ্যাণ্ড ফিক্সড অ্যারেঞ্জমেণ্টস। তারপরে বেরুবেন। আগেভাগে বম্‌ডিলায় গিয়ে লাভ কি আপনার? স্ট্র্যানডেড হয়ে মাঝপথে বসে থাকবেন?" অত উপদেশ ভাল্লাগেনা ছাই। আমার যা খুশি, আমি তাই করব। তোমার জিপে না গেলেই তো হল? তোমার বাড়িতে গিয়ে না উঠলেই তো হল? যাবনা রে বাবা, যাবনা। আমি নিজের মতন নিজে নিজে যাব। তোমাদের

ঘাড়ে পড়তে বয়ে গেছে আমার। স্ট্র্যানডেড হলেও যাব না, নিশ্চিন্ত থাকো। মনে মনে গজ গজ করে এইসব খারাপ কথা বলি। আর মুখে বলি—"থাক-থাক, আপনারা আর বৃথা এত ভাবনা করবেন না আমার জন্যে। ও যাহোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে'খন। সুবিধা হয় তো যাবো, না হ'লে যাবো না। এত ভাবনার কী আছে? ঐ দেখুন, ঘাট এসে গেল।" সত্যি তরী এবার ভিড়ছে—"ঐ তেজপুর! ঐ তো তেজপুর!" রব উঠল ডেকে।

—"আমার ফোন নম্বরটা নিয়ে রাখুন তেজপুরের—পরশু বেলা একটায় বেরুচ্ছি। কালকের মধ্যে যদি আপনার সব ব্যবস্থা হয়ে যায়, তবে জানাবেন। ভদ্রলোক একটুকরো কাগজে নম্বর লিখে এগিয়ে দেন। যত মন্দ ভাবছিলুম, অত মন্দ নন নিশ্চয়। তাওয়াং বিষয়ে তো প্রচুর খবর রাখেন। ওঁর আলোচনা শুনে আমি অনেক কিছু শিখেছি, উৎসাহও বেড়েছে যাত্রার। ফোন নম্বরটি তুলে রাখি।

আলো হৃদয় হরা

তেজপুর এসে গেছে, আমরা নৌকো ছেড়ে, বালি পেরিয়ে এসে পাড়ে উঠি। হলুদ পর্দা উড়িয়ে জিপটা চলে যায় বালি পার হয়ে। শীলা বলে, "এখন আপনাকে একজনদের বাড়ি নিয়ে যাবো, ওঁদের টেলিফোনে বলা আছে, ওখানেই আপনি থাকছেন। ওঁরা বাঙ্গালী, কিন্তু তেজপুরে তিনচার জেনারেশন ধরে বাস। আপনার লেখা ওঁরা খুব ভালবাসেন। ওখানে না থাকলে আমার ওপরে রাগ করবেন ওঁরা। তাই ওখানে নিয়ে যাচ্ছি। আমাকে ভুল বুঝছেন না তো? আমি কিন্তু খুবই খুশি হতুম,

দুয়েকদিন বাদেই যদি আপনি আমার কাছে চলে আসতেন, ঘর দোর একটু গুছিয়ে নিতুম তারই মধ্যে। অনেকদিন তো গৃহছাড়া, অগোছালো হয়ে আছে সমস্ত। আপনার অসুবিধে হতো।"

হায়রে! আমার আবার অসুবিধে? কিন্তু শীলা বরঠাকুর জানবেন কেমন করে যে আমার অগোছালো গৃহস্থালীতে আজকাল কোনোই অসুবিধে হয় না। ওঁর নিজেরই হতো। অতিথি-আপ্যায়নের মতো মানসিক প্রস্তুতি আর বাকী ছিল না, এই সম্মেলনে অতিথিদের তো কম আপ্যায়ন করতে হয়নি বেচারীকে!

উদ্যোগপর্ব

—"নিয়ে এসেছি ডঃ দেবসেনকে। আমরা কিন্তু আর বসব না। এই যে, এই আমাদের মিসেস বোস, ইনি প্রফেসর বোস—"

—"নমস্কার।"

—"এসো, এসো। তোমার কুম্ভমেলা জাস্ট পড়ে শেষ করলাম। দারুণ! কিন্তু তোমার প্রবন্ধেরও আমি…"

—"হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ…"

—"কেমন জমলো যোড়হাটের সাহিত্যসভা?" এ প্রশ্নটি শীলাকে।

—"দারুণ। তবে খুব পরিশ্রম গেছে।"

—"চলুন, ভেতরে চলুন। মিস্টার বরঠাকুর এক্ষুনি চলে যাবেন কি, চা-টা, কফি-টফি কিছু একটা তো খেয়ে যাবেন? ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, এতদূর রাস্তা—"

—"এখন থাক, বাড়িতে কাজ আছে, পরে একদিন আসবো, থ্যাংকিউ

থ্যাংকিউ” বরঠাকুরেরা বসলেন না।

দু’মিনিটের মধ্যেই প্রফেসর বোস আর মিসেস বোস হয়ে গেলেন দাদা আর আলোদি। একটু বাদে মনুমেণ্টের মতন লম্বা, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ওয়ালা, ইশকুলে পড়া ছোটো একটা ছেলে এসে হাজির—সে আবার আসামের জুনিয়র টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন। শমী চোখের পলকে মাসি বানিয়ে ফেললে আমাকে। আলোদির ঝকঝকে তকতকে প্রায় জার্মান হাউসওয়াইফদের মতন টিপটপ অহংকারী সংসারে মুহূর্তেই আমার একটা পার্মানেণ্ট ঠাঁই হয়ে গেল। যেন তেজপুরেই আমার এত-বছর কেটেছে, এমনি করে আলোদির খাটে শুয়ে শুয়ে আড্ডা মেরে, কিংবা টিনটিনের কমিকমুখে কোলের কাছে চিৎপটাং হয়ে-শোওয়া শমীর চুলে-বিলি-কেটে-দেওয়ার হুকুম তামিল করে।

মুশকিল হলো তাওয়াং নিয়ে। দাদা সত্যিই বয়সে অনেকটাই বড়ো, আর স্বভাবটা উদ্বেগ করার। এবং স্নেহপ্রবণ। এবং আগলে রাখার। তেজপুরের খানদানী ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁরই বাড়িতে বসে তাঁর মতটা চট্ করে ফেলেও দেওয়া যায়না। এ-হেন প্রফেসর বোসের মোটেই ইচ্ছে নয় আমি তাওয়াং যাই। আলোদিও চাননা এসব রিস্কি ব্যাপার। একমাত্র শমীর মহা উৎসাহ। অবিশ্যি সে সঙ্গে যেতে পারবেনা, সামনেই টেস্ট পরীক্ষা আছে না? কিন্তু মরাল কারেজ যুগিয়ে যেতে লাগলো সে ঃ

—“কেন মাসিকে যেতে দিচ্ছনা তোমরা? মাসি কি তোমাদের মতন? ম্যাটারহর্নে চড়তে গিয়েছিল। আমি আনন্দমেলায় পড়েছি না? (অবশ্য পারেনি চড়তে। মুরগীর খাঁচাতে ঢুকে পড়েছিল তার বদলে!) কুম্ভমেলায় ওকে যেতে কি দিতে তোমরা? নিশ্চয় দিতে না। কেউ তাহলে ঐ লেখাটা পড়তে পেতো? নিজেরাই তো খালি খালি বলছ,

ঈশ কী দারুণ লিখেছে। (আমি অবশ্য এখনও পড়িনি।)" তাতেও যখন কাজ দিচ্ছেনা, তখন—

—"তোমরা কি মাসির গার্জিয়ান ? মাসি একটা অ্যাডাল্ট। প্রধান অতিথি হতে পারছে, আর তাওয়াং যেতে পারবে না ? তোমরা ওকে গ্রোন-আপ-ট্রিটমেণ্ট দিচ্ছ না—আমাকে যেমন গাড়ি চালাতে দাওনা ঠিক তেমনি। মাসি, তুমি যাও বরং বরঠাকুরদের বাড়ি থাকো গিয়ে। ওখান থেকে তাওয়াং যাও। এদের সব চেননা তো' ? ভেরি ডিফিকাল্ট পিপ্‌ল। তোমাকে এইসা শেলটার করে রাখবে—লাইফ একদম হেল্ করে ছেড়ে দেবে।"

এবারে আলোদি খুব আপত্তি করলেন।

"আমি কি বলেছি যেওনা ? আমি কেবল বলেছি, খুবই রিস্কি ব্যাপার। তোমার বাবাই কেবল আপত্তি করছেন।"

তা তিনি করছেন।

—"যতই জ্ঞানীগুণী হওনা কেন", তিনি বললেন, "একদম একা একা, পাহাড়ী ট্রাইবালদের মধ্যে, আর মিলিটারিদের মধ্যে—না, সেটা অ্যাডভাইজেবল্ নয়। সেখানে কেউ তোমাকে প্রধান অতিথি করেনি তো! মেয়েমানুষ, হাজার হোক। বয়েসটাও ডেনজারাস। বাপের বাড়ির কি শ্বশুরবাড়ির কেউই এখানে নেই—এখানে তো আমরাই আত্মীয়ের মতো। না, এটা খামখেয়ালী কথা। কুম্ভমেলা আর এটা এক নয়। সেখানে সবাই পুণ্যার্থী। পরিষ্কার মন নিয়ে একই উদ্দেশ্যে গেছে। সেখানে দল তৈরি হয়ে যায় আপনাআপনি। এখানে কেউই যাচ্ছেনা। শুধু তাই নয়, কেউই কদাচ যায় না। এটা তীর্থস্থানও নয়, ট্যুরিস্ট রিসর্টও নয়। একটা গডফরসেক্‌ন প্লেস্, রিজার্ভড এরিয়া, কেবল আর্মি আর ট্রাইবালস আর লামারা থাকে। তারা অত্যন্ত আনপ্রেডিকটেবল।

একে হিল্‌স পিপ্‌লরা জন্মে স্নান করেনা। তাছাড়া ওখানে ওরা বিদেশী ট্যুরিস্ট দেখতে অভ্যস্তও নয়। দে আর নট ইউজড টু ভিজিটর্স। ট্রাইবালদের নিয়মকানুনও ছাই আমরা কিছু জানিনা। কখন কাকে তুমি অফেন্স দিয়ে ফেলবে তার ঠিক নেই। নিলো হয় তো ঘচাং করে মুণ্ডুটা খুলে, কোথায় আর্মি গ্রাউণ্ডসে ট্রেসপাস করে বসবে, দিলো হয়ত গুড়ুম করে গুলি চালিয়ে। না না ওসব রিস্কের মধ্যে—"বাধা দিয়ে আলোদি হঠাৎ বলে বসলেন—

—"মুণ্ডু কেটে নিল, কি গুলি চালাল, সে সব তো পরের কথা। আগে তো যেতে হবে! যাবে কেমন করে? ট্রেন নেই, প্লেন নেই, গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই। যাবো বললেই তো হলনা। যাবার উপায়টা কী? উপায় নেই। যাওয়া হবে না।"

আমি হাঁ হাঁ করে আপত্তি জানাই :

—"বম্‌ডিলা পর্যন্ত বাস যায় রোজ। ওখান থেকে একটা কিছু যোগাড় করে নেব। নট্‌ টু ওয়ারি। কিন্তু প্রথমে চাই পারমিট। এখানে অরুণাচলের এডিসির আপিসটা কোথায়?"

—"আমি চিনি!" শমী লাফিয়ে ওঠে।

—"চিনি আমিও।" গজগজ করে দাদা বলেন।

—"ওই তো, অমুক জায়গাটার ওপাশে না?" বলেন আলোদি।

—"সবাই যখন চেনেন, তখন চলুন, যাওয়া যাক?"

—"যাই বললেই হয় না। এখন ড্রাইভার কই? তা ছাড়া আপিস বন্ধ হয়ে গেছে। পাঁচটা বেজে গেছে কখন্‌!"

এমন সময়ে এলেন এক পরমাসুন্দরী মহিলা।

—"তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই এলাম" তিনি বললেন। আলোদি পরিচয় করিয়ে দিলেন—"ডাঃ প্রবোধচন্দ্র সেনের মেয়ে।—

বুঝলে তো ? তোমাদের শান্তিনিকেতনের লোক। আমাদের ইলাদি।"

সত্যি চমৎকার মানুষ ইলাদি। দু'মিনিট পরেই—"আপনার বাঁদুরে টুপি আছে ?"—এই প্রশ্ন শুনে মোটেই অবাক হলেন না। "বাঁদুরে টুপি ? আমার নেই, তবে আমার শ্বশুরমশাইয়ের আছে। কেন বলো তো ?"

—"আর কেন ? বলেন কেন !" ইলাদিকে বোঝাতে বসলেন আলোদি—"পাগলামির চূড়ান্ত। বলে কিনা, তাওয়াং যাব। মনাস্টারি দেখব। না আছে আগের থেকে ব্যবস্থা, না আছে পোশাক পরিচ্ছদ, না পারমিট, না কোনো চেনাশুনো লোক। ঐজন্যেই বাঁদুরে টুপি চাইছে। দেবেন না, খবর্দার দেবেন না।"

—"না দিলে 'শালমুড়ি দিয়ে হক্ষ' হয়ে চলে যাব। দস্তানা আছে ? গ্লাভ্‌স ?"

—"শ্বশুরমশাইয়ের আছে বটে। বুড়ো মানুষ, খুব শীতকাতুরে। উলের দস্তানা পরেন।"

—"বাঃ ! বাঃ ! চমৎকার। ওতেই হবে ! বেশ ! বেশ ! এবারে সোয়েটার !"

—"তুমি আমার সোয়েটারগুলোই পরে যেও মাসি ; আমার অনেক আছে। মা প্রত্যেক বছর বুনে দেন।" শমী রেডি।

—"বাবার হাতকাটাটা, আমার পুলোভারটা, শীলা বরঠাকুরের কোট" শমী গুনতে থাকে—"ইলামাসির শ্বশুরমশায়ের টুপি, আর দস্তানা"—

—"আর জুতো মোজা ? তোরটাই দে বরং। পরে যাক—" আলোদি বলেন।

—"আমার ?"—শমী চেয়ারের তলা থেকে দেড় ফুট লম্বা একটি শ্রীচরণ বের করে সিরিয়াসলি চোখ কপালে তুলে বলে—"আমার জুতো ? পা--গল ? তবে আমার মোজাগুলো নিতেই পারো। বেশ

হাঁটু পর্যন্ত গরম থাকবে। জুতোটা কিনতে হবে! হ্যাঁ মা। তোমার জুতো নেই? সব স্যাণ্ডাল? সব শ্লিপার? ধ্যুৎ!"

—"স্নোবুট লাগবে। তোর খেলার বুট জোড়াই দিয়ে দে না?" আলোদি আবার বলেন।

—"দিতাম তো। পায়ে লাগলেই দিতাম। পা কতটুকু? তোমার সমান! ছেঃ। ওই আবার স্পোর্টসম্যানের পা নাকি? একজোড়া ভাল কেড্‌স কিনে নিতে পার মাসি? নর্থস্টার?"

—"গ্র্যাণ্ড আইডিয়া। পাহাড়ে উঠতে সুবিধাই হবে কেড্‌সে। তাই কিনে নেব। ডবল মোজা পরলেই পা গরম থাকবে। কি বলিস?" বেশ নিশ্চিন্ত লাগে এবারে।—

—"সত্যি সত্যিই যাচ্ছ নাকি?" ইলাদি এবার চমকান।—"আমি ভাবছি ঠাট্টা।"

অসম মহিলা সাহিত্যিক সম্মেলনের প্রধান অতিথি মহাশয়া যে সত্যিই ধার-করা পোশাক পরে তাওয়াং-এ যাবার চেষ্টা করছেন, সুস্থ মস্তিষ্কে, এটা কোনো ভদ্রমহিলার বিশ্বাস না হবারই কথা। একমাত্র ষোলোবছরের শমী ছাড়া কারুরই কাছে আমার প্ল্যানটার বাস্তবতা স্পষ্ট হচ্ছিল না। এবার বেশ বুঝতে পারছি বয়স্কদের সম্পর্কে আমার ছেলেবেলা থেকেই যে ধারণাটা তৈরি হয়েছে, সেটা একদম নির্ভুল। ধারণাটা এই—ছোটবেলায় মাথাটা ক্লিয়ার থাকে। দৃষ্টিটা নির্ভেজাল বাস্তব, এবং সত্যদর্শনে অভ্যস্ত থাকে। যত বয়েস বাড়ে, মাথাটা গুলিয়ে যেতে থাকে। ভেজাল বাস্তব এবং ভেজাল সত্য দেখতে দেখতে চোখটা অবাস্তবে এবং অসত্যেই অভ্যস্ত হয়ে দাঁড়ায়। তখন সহজ সরল সত্যের চেহারা এতই অপরিচিত হয়ে যায় যে, হয় তাকে করুণ এবং পরাস্ত, অথবা সুদূর পরাহত, অশরীরী এবং অবাস্তব দেখায়। তা না হলে, খুব

জটিল, এবং বিপজ্জনক। এ দোষটা আস্তে আস্তে শুধ্‌রে নেন কেউ কেউ, তাঁদের সংসারে সাধু-সন্নিসি বলা হয়। সভ্য ভব্য বয়স্করা প্রথমেই ভুল করে বসেন। পরে ভেবেচিন্তে দ্বিতীয় চিন্তায় ঠিক ঠাক করে নেন। আর ছোটরা প্রথমেই যেটা করে, সেটাই ঠিক। তারপর বড়দের কথা মত চলতে গিয়ে ভুলভাল কাজ করে। শমী ছোট আছে বলে যেটা সহজেই দেখতে পাচ্ছে, বড় হয়ে গেছেন বলে অন্যরা কেউই সেটা দেখতে পাচ্ছেন না। সাতদিনের জন্যে যাওয়া—মনুষ্যবর্জিত জায়গাও নয়—মিলিটারি থাকা মানেই বেশ ল' অ্যাণ্ড অর্ডার আছে এমন জায়গা। বাঙালী নেই—অথবা অসমীয়া নেই, মানেই কেউ নেই তা তো নয়? মধ্যবিত্ত বাবুদের ছাড়া অন্যদের মানুষ বলে মানব না, এই বা কেমন কথা? ট্রাইবাল বল, আর্মি বল, বৌদ্ধ লামা বল, তাদের তো অতি উত্তম সমাজ ব্যবস্থা—সুগঠিত, সুশৃঙ্খল। ভয়ের কী আছে? মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরে মানেই লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাইরের একটা অচেনা অঞ্চল। সেখানে পা দেওয়া মানেই বিবিধ বিপদকে হাতে-ধরে ঘরে আনা। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণা যে চমৎকার বালির বাঁধের মত নরম পাঁচিল দিয়ে কেল্লা বানিয়ে ঘিরে রেখেছে আমাদের, সেটার বাইরে পা দিয়েছ কি গিয়েছ। সর্বনাশ! কুম্ভমেলায় যাওয়া তো মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের সাপের লেজে পা দেয়া নয়। না হয় একাই গেছ।

কিন্তু তাওয়াং?

এর মানে কি?

কেন যাওয়া? যাবার দরকারটা কী?

এতে কার কী লাভ? ব্যবসায়ে নয়, ধর্মের জন্য নয়, স্বাস্থ্য উদ্ধারে নয়, চাকরির জন্যে নয়, গবেষণার ইণ্টারেস্টেও নয়। তবে কেন?

লেখার জন্যে মেটিরিয়াল সংগ্রহ?

তাও নয়। তা যে নয়, সেটা প্রমাণ করতেই পাঁচ বছর ধরে লিখিনি তাওয়াংয়ের গল্পটা।

—তবে ?

—তবে আবার কি, স্রেফ উড়নচণ্ডেপনা !

—স্রেফ খামখেয়াল।

—মেয়েমানুষের অত খামখেয়াল ভালো নয়।

—মেয়েমানুষের অত জেদ ভালো নয়।

—মেয়েমানুষের অত সাহস ভালো নয়।

"বলছি ওরে ছাগলছানা
উড়িসনেরে উড়িসনে,
জানিসনে তোর উড়তে মানা
হাত পাগুলো ছুঁড়িসনে"।

—হ্যাঁ, হতো যদি পুরুষমানুষ ?

—পুরুষমানুষের অধিকার আছে। সে পারে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে পদাঘাত করে অন্যজীবন বেছে নিতে। তাতে অন্য পুরুষরা ভীতিসূচক বা নিন্দাসূচক কিছু খুঁজে পান না। এরকম ব্যক্তিগত বিদ্রোহ তো চির-কালই আছে। তাতে সমাজ সংসার ভেঙে যায়নি। ও দু'চারজন খ্যাপাটে ওরকম থাকেই।

—কিন্তু মেয়েমানুষ ? ছিঃ !

—ও মা ! সে কি কথা ? জগৎ সংসারে ছিরি-ছাঁদ থাকবে কেন তাহলে ? মেয়েমানুষই তো লক্ষ্মী। সে লক্ষ্মীশ্রী ধরে রাখবে। স্ত্রী-পুরুষের শান্তির সংসারে মস্ত দুর্লক্ষণ হলো স্ত্রীর 'বাইরে দূরে যায়রে উড়ে' মন।

—উড়নচণ্ডে স্ত্রীলোককে কেউ ভালবাসে ?

—কেউ না।

—কেউ আহা-উহু করে ?

—কেউ না।

—কেউ তার ধূলিধূসর জামাকাপড় কেচে দেয় ? না ঝকঝকে থালায় করে ভাত বেড়ে দিয়ে পাখাটি হাতে নিয়ে কাছে এসে বসে।

—কেউ না, কেউ না। উড়নচণ্ডীর পথক্লেশ দূর করতে কারুর মাথা-ব্যথা নেই।

যত গল্পের বই পড়েছি জীবনে সর্বত্রই আমি দেখেছি, যে পুরুষমানুষ যত উড়নচণ্ডে কাছাখোলা হয়, মেয়েরা তাকে তত ভালবাসে। কত আহা-উহু করে, কত যত্ন আত্তি করে, তার গেঞ্জি ইজের কেচে দেয়, ধূতি কুঁচিয়ে দেয়। জামা ইস্ত্রি করে দেয়। মেয়েরা ধড়াদ্ধড় তাদের প্রেমে পড়ে যায়, সেই মা-দের সময়ের শরৎচন্দ্র প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রবোধ সান্যাল থেকে আমাদের কালকূট বুদ্ধদেব গুহ পর্যন্ত সকলের দেখি একই অভিজ্ঞতা। আর নীললোহিত বেচারী নিজেই কেবল প্রেমে পড়ে। তার প্রেমেও যে একেবারে কেউই পড়েনা তা নয়—দু'চারজন মেয়ে তার প্রেমেও পড়েছে, এমনও হয়েছে। তবে কালকূট—প্রবোধ সান্যালদের মতন অত নয়। কেননা তাঁরা নিজেরা তো 'প্রেমিক' প্রকৃতি নন, তাঁরা ডিট্যাচ্‌ড্‌ থাকেন, দার্শনিক, বিশ্বপ্রেমিক। "অতিথি" গল্পের তারাপদর মতন কি গঙ্গা নদীর স্রোতের মতন। "তোমার কোনো বাঁধন নাই, তুমি ঘরছাড়া যে তাই"। আর আমার বেলায় দেখি একটাও হয়না ? না আমি পড়ি কারুর প্রেমে, না আর কেউ পড়ে আমার প্রেমে। কী বলছেন ? বয়েস হচ্ছে, মেয়ে বড়ো হচ্ছে, ওসব কী-কথা ? বাঃ, দেবানন্দের বুঝি বয়েস হচ্ছেনা, কিশোর কুমারের বুঝি ছেলে ছোট্ট ? কেবল আমারি বয়েস হচ্ছে ? এই যে এত ঘুরি, অনবরত ঘুরে বেড়াই, এ-দেশ—ও-

দেশ, এ তীর্থ-ও কনফারেন্স, কোথাও কি কোনোই সম্ভাব্য প্রেমিক লুকিয়ে থাকতে পারত না আমার জন্যে ?—খুব পারত। কিন্তু আমার স্বভাবদোষেই তা পারেনা। এখন কথা হচ্ছে গিয়ে, কোন্‌টা বেশি জরুরি ? স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো না পরাধীন ভাবে প্রেম করা ? প্রেমে পড়ার বড্ড ঝুট্‌ঝামেলা আছে মশাই, মান-অভিমান, মিলন-বিরহ, জ্বালা-যন্ত্রণা বড়ো কম নয়। তাছাড়া প্রেমিকরা দারুণ পজেসিভ্‌ জীব হয়। একদম পুলিশের মতো। প্রেমের হাজতে পুরে দেবে। আর ইচ্ছেমত বিহার করা বন্ধ। আমি তাই ইনডিরেক্টলি প্রেমটাকে সর্বদাই ডিসকারেজ করে থাকি। প্রেম এনকারেজ করা মানেই হাজতবাস। হ্যাঁ, যদি একতরফা এনকারেজ করেই মুক্তকচ্ছ হয়ে কালকূটদের মতন হাসি-মুখে পালিয়ে যেতে পারতুম ? সে আলাদা কথা ! আমি তো তেমন স্মার্ট নই। শেষটা নিজেও জড়িয়ে পড়ব ঘাড়মুখ গুঁজে—বলা যায়না, বিয়ে-থা করে হয়ত উনুন পেতে ঘর-সংসারই করতে লেগে যাব। তাই আমি "মারি-তো-গণ্ডার-লুটি-তো-ভাণ্ডার" স্টাইলে সুপার হিউম্যান লেভেলে প্রেমে পড়ি। কখনো গঙ্গার সঙ্গে, কখনো হিমালয়ের। কখনো ব্রহ্ম-পুত্রের সঙ্গে কখনো তিব্বতের। একবার ভেবে দেখুন, প্রেম করার কতখানি, হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট সুযোগ আমি পাই। আত্মীয় গুরুজনরা কেউ ধারে কাছে থাকেন না, বন্ধু-বান্ধবীরা কেউ নজরবন্দী রাখতে পারেনা, পাড়া-প্রতিবেশীর পর্যন্ত ইণ্টারেস্ট থাকেনা—এমন সব জায়গায় আমি ঘুরি, নির্জনতা যেখানে ছায়ার মতো আমার সঙ্গে ফেরে। নিভৃতি যেখানে খৈ-মুড়কি। মান-অভিমানের বালাই নেই, দায় দায়িত্ব বইতে হবে না।

আমাকে দেখলে ঠিক বোঝা যায়না বটে, কিন্তু প্রাণে-প্রাণে বেশ খানিকটা ওল্‌ডফ্যাশন্‌ড্‌ রোমাণ্টিকতা আমারও আছে বৈকি। থাকবেনা

এমন হতেই পারেনা। ও ব্যাপার এমন কি ন্যাড়ামাথায় টিকিওলা হেড-পণ্ডিতেরও থাকে। রক্তচক্ষু অঙ্কস্যারেরও।

আর চুপিচুপি বলি, উড়নচণ্ডী মেয়েদের আগলে রাখবার জন্যেও একজন সর্বদা জেগে থাকেন। যিনি কাছাখোলাদের কাছা তুলে গুঁজে দেন, এবং আমার মতন এলোপাথাড়ি পথ চলে যারা, তাদের পথক্লেশ নিবারণ করেন। এমন মাত্র একজনই আছেন বটে জগতে, কিন্তু তিনি একাই একশো।

কিন্তু তিনি তো নভেল লেখেন না, তাই সে খবরটি কেউ জানে না। অতএব কোনো বাংলা নভেলে কোনো উড়নচণ্ডী নায়িকা নেই। এমন মেয়ে কি আছে, যার পায়ের তলায় চাকা বাঁধা? যে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু বোষ্টুমী নয়। সন্ন্যাসিনী নয়, তবু অস্থির? নেহাৎ মধ্যবিত্ত ঘরের চাকুরে ভদ্রমহিলা, অথচ যার অস্থির বুকের ভেতরে "অন্য এক বোধ কাজ করে"? এক যাযাবর প্রাণবায়ু যাকে ঠেলে নিয়ে বেড়ায় অরণ্যে প্রান্তরে?

অথচ সাহিত্যে এমন পুরুষ হামেশাই দেখছি। উড়নচণ্ডেপনাটাই তো প্রধান আকর্ষণ। কাছাখোলা স্বভাবটাই তাদের অস্থির অনন্ত যৌবনের ট্রেডমার্ক। পুরুষমানুষেরা যেহেতু নিজেরা উড়নচণ্ডে হতে ভালবাসে, তারা মেয়েদের উড়নচণ্ডী দেখতে ভালবাসে না। উড়কি ধানের মুড়কি, কিম্বা শালিধানের চিঁড়ে অফার করা দূরে থাক, কাঁঠালকাঠের পিঁড়েটি পর্যন্ত উড়নচণ্ডী নায়িকার জন্যে পেতে দেবে না কেউ, না পাঠক, না পাঠিকা। অমন নায়িকা-ওলা বই বাজারে চলবেই না! অতএব "লেখার জন্যে মেটিরিয়াল" সংগ্রহ করতে উড়নচণ্ডী হয়ে যে ঘোরে ঘুরুক কোটি মন্বন্তরে আমি ঘুরিব না, আমি কভু ঘুরিবনা।

—তবে কেন যাওয়া? সেই প্রথম প্রশ্নে এসে ঠেকে যাওয়া। সেই

জিপ-বাবু থেকে সুরু করে, আলোদি, বরঠাকুরফ্যামিলি, ইলাদি সকলের মনে একই প্রশ্ন। একই বিস্ময়। সভ্যজগতে খুবই 'ভ্যালিড' প্রশ্ন।

—এনি ভ্যালিড রীজ্‌ন ?

সভ্যসমাজে ভ্যালিড হবে এমন রীজ্‌ন খুঁজে বের করা আমার আদ্ধেক কাজকর্মের জন্যেই বেশ দুঃসাধ্য। এখন তো আরো মুশকিলে পড়া গেল।

সব কিছুর জন্যেই রীজ্‌ন লাগবে কেন রে বাবা! এক্সপ্ল্যানেশান লাগবে কেন!

আমি যেহেতু 'এক্সপ্লোরার' নই, নই 'কন্‌টিকি' এক্সপিডিশন কিম্বা এভারেস্ট বিজয়ের শরিক, নই হায়ারডাল কি হিলারী, কিম্বা ডঃ লিভিংস্টোন—তাই কি আমার হাত পা "রীজ্‌ন" দিয়ে বাঁধা ? আমি কিছুই আবিষ্কার করতে যাচ্ছিনা।

কোনো রেকর্ড ভাঙতে বা রেকর্ড গড়তে যাচ্ছিনা। কারুর কোনো উপকারেও লাগতে যাচ্ছিনা। কেবল আপন মনের খেয়াল খুশিতে, কেবলই জীবনের স্বাভাবিক কৌতূহলে, বেঁচে থাকার আহ্লাদে যেতে চাইছি—এটা কি ভ্যালিড নয়, রীজ্‌ন হিসেবে ?

লক্ষ্য করেছি, জগৎসুদ্ধু মানুষের আমাকে খুব চট্‌পট্‌ তাদের 'ওয়ার্ড' বলে মনে হয়, আর গার্জেনগিরির দায়িত্ব নিয়ে নেবার লোক জুটে যায়। এটা কি সেই পথ-ক্লেশহারীর বিশেষ কায়দা ? আড়াল থেকে খেলা-ধূলো ? যেমন বিঘ্ন ঘটান, তেমনই বন্ধুও জোটান।

—"এ মেয়ে তোমার কথা শুনবে না।" আলোদি অবশেষে দাদাকে বললেন—"এ কুম্ভে যাওয়া মেয়ে।"

—"সত্যিই যাচ্ছো ? তাহলে তো কাল সকালে ইনারলাইন পারমিটের

চেষ্টায় যেতে হয়। ফার্স্ট আওয়ারে পৌঁছে যাব। কি বলো আলো? কিন্তু, ও কার সঙ্গে যাবে? কিসে করে যাবে?"

—"জিপে। এই যে, এই ফোননম্বরের ভদ্রলোক কাল যাচ্ছেন বম্‌ডিলা পর্যন্ত। বাঙালী। তেজপুরে ওঁর স্ত্রী, বাচ্চারা থাকেন।"

—"এ কোথায় যোগাড় হল?"

—"ঐ ফেরি-বোটে।"

—"কী করে সে, বম্‌ডিলাতে?"

—"তা তো জানি না?"

—"জিজ্ঞেস করনি? আপনি কী কাজ করেন?"

—"না তো?"

—"চমৎকার। অ্যান আন্‌আইডেন্টিফায়েড ম্যান! কেবল একটা ফোননম্বর। ওর নাম কী?"

—"তাও জিজ্ঞেস করা হয় নি।"

—"বাঃ। তারই সঙ্গে যাওয়া ঠিক?"

—"প্রায়। নাম দিয়ে কী হবে?"

—"থাকবে কোথায়?"

—"ইন্সপেকশন বাংলোতে চেষ্টা করতে হবে।"

—"আগে থেকে বুক করে যেতে হয়।"

—"গিয়েও চেষ্টা করা যায়। আমি তো একলাই, ঝুট্‌ঝামেলা তো নেই কিছু? ও হয়ে যাবে।"

—" 'একলাই' বলেই তো ঝুট্‌ঝামেলা। 'ও হয়ে যাবে' মানে? না হয়ে গেলে কী করবে? ঐ লোকের বাড়িতে কি থাকতেও দেবে বলেছে?"

—"তা দেবে না, বলে দিয়েছে। ফ্যামিলি নেই কিনা এখন ওখানে?

থাকলে, দিত।”

—“তবু ভাল! পারহ্যাপ্‌স হি ইজ আ ডিসেণ্ট চ্যাপ, আফটার অল। আগে বার করি লোকটা কে! দাও দেখি নম্বরটা।”

ফোন নম্বর নিয়ে দাদা চলে গেলেন।

একটু বাদে সেই জিপওয়ালার ঠিকুজীকুলুজী জেনে এলেন টেলিফোন করে। ভদ্রলোক ভদ্রলোকই—বম্‌ডিলাতে ব্যবসা করেন। তেজপুরেই বাড়ি। ভাবনার কিছু নেই। ঠিক আছে। যেতে পার। তবে তাওয়াং টাওয়াং নয়। ওই বম্‌ডিলা অবধিই যাও। চীনেরা কোথায় এসেছিল সব দেখেশুনে, ফিরতি-বাসে চলে এসো। ফোন করে দিও। আমরা বাস স্টপ থেকে নিয়ে আসবো।—

রাত্রেই একবার গাড়ি করে বেরিয়ে দাদা তেজপুর শহর ঘুরিয়ে আনলেন। পদ্মবনে ভরা দীঘি, ছোট্ট ছোট্ট পাহাড় ভাঙা মন্দিরে সাজানো সবুজ পার্ক, আহ্‌, কী সুন্দর শহর সত্যি। নতুন একটা আশ্রম এবং মন্দির হয়েছে, সেটা দেখালেন। তার কাছেই ঐ ভদ্রলোকের বাড়ি। সেটাও দেখা হয়ে গেল। হলুদ পর্দাওলা জিপ দাঁড়িয়ে আছে পোর্টিকোতে। দেখে কী আহ্লাদই হ’ল! আঃ! ঐ জিপে করে আমি আগামীকাল·····বম্‌ডিলা! রাত্রের ব্রহ্মপুত্রও একঝলক দেখা হলো।

বাজারটা পার হয়েই প্রফেসর বোসের এই পৈতৃক ভিটে বাড়িটি। আধখানা বাজার নাকি প্রফেসর বোসের ঠাকুর্দার ছিল। পুরুষানুক্রমে ওকালতিই করেছেন এঁরা। প্রফেসর বোসেরও ল’ডিগ্রি আছে, যদিও প্র্যাকটিস করেননা।

এলাহাবাদ, ভাগলপুর, কটক এসব অঞ্চলেও দেখেছি, প্রবাসী বাঙালীর সবচেয়ে বড় অংশ হয় উকীল, নইলে ডাক্তার। প্রফেশনাল

বাঙালীরা ঘুরে ঘুরে প্রবাসে নতুন কর্মক্ষেত্র খুঁজে নিতেন একসময়ে। কলকাতার তীব্র প্রতিযোগিতায় যোগ না দিয়ে।

আর এখন ? অন্যত্র কাজ থাকলেও নিরাপত্তা নেই।

ইনার লাইন

মুশকিল হলো পরদিন সকালে। ইনার লাইন পারমিটের অফিসে গিয়ে। বাইরে দাঁড়িয়েই আছি, দাঁড়িয়েই আছি, কেউ ডাকে না। শেষে প্রফেসর বোস জোর করে একটা ঘরে গিয়ে খোঁজ খবর নিলেন, তারা আমাদের অন্য একটা ঘরে পাঠিয়ে দিল। সেখানে বসবার ব্যবস্থা আছে। এইটুকু উন্নতি। ব্যাস। বসেই আছি, বসেই আছি, কেউই ডাকে না। অথচ বলে দিয়েছে ডাক এলে যেতে হয়। না ডাকলে হাভাতের মতন, আদেখ্‌লের মতন হুড়মুড়িয়ে ঢুকে যাওয়া নিয়ম নয়। সব মিলিটারি প্রহরী চতুর্দিকে। নিয়মকানুন কড়া। বসে, বসে, বসে, বসে জানা গেল যে এ. ডি. সি. ইটানগরে। ইনার লাইন পারমিট এরা দেয় না। তিনিই দেন। বললেন, একজন বেয়ারা। একটা অফিস ঘর সামনেই। কী মনে হলো, স্যুইং ডোর ঠেলে ঢুকে পড়লুম। দেখি এক ভদ্রলোক মস্ত চেয়ারে বসে আছেন। প্রফেসর বোসও এলেন সঙ্গে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলেন। উনিও একই কথা জানালেন। প্রফেসর বোস বললেন, টেলিফোনেই জেনে নিন না একটু, পারমিট দেবার কথাটা! উনি তখন একজনকে ডেকে, সেই অনুরোধ করলেন। তিনি পাশের ঘরে ফোন করতে গেলেন। আমরা বসে রইলুম। আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলুম তাওয়াং যাবার কী কী উপায়। উনি

বললেন সপ্তাহে একটা বাস যায়, কিন্তু এ সপ্তাহেরটা কালই চলে গেছে। সাতদিন বাদে নেক্সট ট্রিপ।

—এ ছাড়া ? অন্য কোনো উপায় নেই ?

—আছে। ওখান থেকে মাঝে মাঝেই জীপ আসে। মেডিকেল সার্ভিসের জীপ, এঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের জীপ। এই তো একজন এঞ্জিনিয়ায় এসেছেন, আজই বিকেলে ফেরার কথা, তাঁর জীপ বিগড়ে গেছে। সারানো হচ্ছে। কাল ফিরবেন।

—কোথায় ফিরবেন ? তাওয়াংয়ে ?

—হ্যাঁ। উনি তো ওখানেই পোস্টেড।

—আমি যাব ! আমি যাব ! আমি তাহলে এই জীপে নয়, ওই জীপে যাব ! সোজা তাওয়াং পর্যন্ত !

—সেটা এঞ্জিনিয়ার মশাইয়ের মর্জির ওপরে নির্ভর করবে। আপনাকে নেওয়া না নেওয়া তাঁর খুশি।

—আপনিই একটু বলে দিননা মশাই আমার হয়ে ? তাহলেই তিনি নিয়ে যাবেন।

—যদি দেখা হয়।

—উনি কোথায় আছেন ? ফোন আছে ? আমি নিজেই কি বলতে পারি ওঁকে ?—

—এই গেস্টহাউসেই আছেন। এখন বাড়ি নেই। গাড়ি সারাতে গেছেন।

ভদ্রলোক বাঙালী নন, হিন্দিভাষী এবং অসম্ভব ভদ্র। তবে সাহায্য করতে খুব উৎসুক বলে মনে হল না।

—"আচ্ছা, এঞ্জিনিয়ার মশাইয়ের জীপের শেষ পর্যন্ত ফলটা কি হলো, বলতে পারেন?"

বলতে বলতে পিছনের দরজা ঠেলে ঢুকলেন একটি যুবক, যাঁর উর্ধ্বাংশের চেয়ে দ্বিগুণ কি তিনগুণ দীর্ঘ তাঁর পাদুটি। দেখলে মনে হয় রণপায়ে হাঁটছেন। গোয়ালিয়ার স্যুটিং কি রেমণ্ডস্ স্যুটিংয়ের মডেলদের মতো ট্রাউজার্স প্রধান চেহারা, শাদা শার্ট পরিহিত অংশটি সংক্ষিপ্ত, মোটা ফ্রেমের চশমা পরিহিত মুণ্ডুটি আরো সংক্ষিপ্ত। সদ্যোস্নাত। চুলে ব্রিলক্রিম, বোতাম খোলা জামার ফাঁকে বুকের লোমে পাউডার দেখা যাচ্ছে। মস্ত মস্ত জুতো মশ্‌মশ করে ঘরে ঢুকলেন। শুধু মশমশই নয়, জুতো চক্‌চকও করছে।

চিরাচরিত নিয়মে এইরকম দৃশ্যের যুবকদেরই নায়ক বলে। "নায়-কোচিত" চেহারা এটাই অর্থাৎ "টল, ডার্ক, হ্যাণ্ডসাম"। বেশ সুদৃশ্য যুবক, কিন্তু কথাগুলি শেষ হবার আগেই কেমন নেতিয়ে গেলেন আমাদের দেখতে পেয়ে। কথা বলতে বলতেই ঢুকেছিলেন, ঘরে আমাদের দেখবেন আশা করেননি। এই অফিসে সম্ভবত কেউই কখনো আসে না। আমাদের দেখে হঠাৎ অবাক হয়ে গেলেন, না লজ্জা পেলেন, কী যে অস্বস্তি বোধ করলেন, তা বোঝা গেল না। তবে আর কথা বললেন না।

—"সেই কথাই হচ্ছিল," অফিসারটি জানালেন, "এখনো সারেনি। এঞ্জিনিয়ার তো এখনও সেইখানেই পড়ে আছে।"

—"কারখানাতে ?"

—"আবার কি।"

—"কিন্তু যদি আজ না সারে ? কাল তো আমাকে চলে যেতেই হবে। হাসপাতালে কাজ আছে জরুরি।"

—"কাল একটা র‍্যাশনট্রাক যাচ্ছে। জীপটা না পেলে আপনি ঐ র‍্যাশনট্রাকেই লিফ্‌ট্ নিয়ে নিন। জরুরি ব্যাপার যখন।"

—"তা হলে ওটা আপনিই বন্দোবস্ত করে রাখুন ?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি—"

এই সময় ! এই বেলা না বললে আর হবে না।

গোয়ালিয়র স্যুটিং এবার ঐ দরজা ঠেলে বেরিয়ে যাবে। তার আগেই বলা দরকার—

—ও মশাই, আপনি তাওয়াং যাচ্ছেন ?

উনি না-তাকিয়ে চলে যেতে থাকেন। উত্তর না দিয়ে। আমিও দুর্নিবার।

—ও মশাই ! ও ও ও মশাই ! ও লম্বা দাদা ! (ইংরিজিতে ও মিস্টার টল্ জেণ্টেলম্যান !!) শুনছেন ?

—আমাকে বলছেন ?

ভূত দেখার মত চমকে উঠে পিছন ফিরে এদিকে তাকান লম্বাদাদা। ঐ একবারই।

—হ্যাঁ আপনাকেই তো বলছি। আপনি বুঝি তাওয়াং যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ। আমার জীপটা নষ্ট। তাই এঞ্জিনিয়ারের জীপে লিফ্‌ট নিতে এলাম। সেটাও নষ্ট। আশ্চর্য কাণ্ড মশাই।

উনি কথার উত্তর দেন প্রফেসর বোসের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে। আমার সঙ্গে কথাই কননা। দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করেন না এদিকে।—

—রাস্তা খুব ঘোরালো তো, তাই প্রায়ই গাড়ি বিগড়োয়। অনবরত সার্ভিসিং লাগে।—অফিসারই ব্যাখ্যা করলেন।

—তা, জীপ তো সবই খারাপ শুনছি। র‍্যাশনট্রাকটা কী জিনিস বলুন তো? আপনি যাতে করে যাবেন? ওতে অন্য যাত্রী নেয়? আমাকে নেবে?

—"আপনাকে?" এতক্ষণে ভদ্রলোক নয়ন মেলিয়া আমাকে 'নেহার' করলেন।

—"আপনি যাবেন তাওয়াংয়ে? ট্রাকে নয়। ট্রাকে যেতে পারবেন না। অপেক্ষা করুন, জীপটা সারবে, যাবেন। আমি ডাক্তার, আমার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, তাই। নইলে আমিও জীপে যেতুম।"

—"আপনার পক্ষে ট্রাকে যাওয়া সম্ভব?"

—"হ্যাঁ, আমরা তো অভ্যস্ত।"

—"আমারও অভ্যেস হয়ে যাবে'খন। আপনি পারেন, আর আমি পারবো না?" এর উত্তর ওঁর জানা নেই। উনি চুপ চাপ বেরিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলেন। মরিয়া হয়ে আমি আবার হাঁক পাড়ি।

—"ও ও মশাই! আপনার সঙ্গে র‍্যাশনট্রাকেই আমাকেও নিয়ে চলুন না। আমারও ফেরার তাড়া আছে যে।"

—"র‍্যাশনট্রাকে মেয়েরা যেতে পারবেনা, খুবই রাফ্ যাওয়া। আমার মনে হয় না ওতে আপনার সুবিধা হবে। ডাঃ লালওয়ানী ঠিকই বলছেন, আপনি দুদিন ওয়েট করে জীপে যান। ততদিনে পারমিটেরও ব্যবস্থা হতে পারে। আপনি পারমিট ছাড়া যেতে পারবেন না তো।" অফিসারটি হাসতে হাসতে বলেন।

—ডাক্তার বাবুর পারমিট লাগে না? ওঁরটা কে দেবে?

—লাগে। ওঁরটা সঙ্গেই থাকে, রিনিউ করে নিতে হয়। উনি

তাওয়াংয়ের এম. ও.।

—এম. ও. মানে? (মনি অরডার নিশ্চয়ই নয়!)

—মেডিক্যাল অফিসার।

—বাঃ বাঃ এই তো আমার আইডিয়াল ট্রাভ্‌লিং কম্প্যানিয়ন! অসুখ বিসুখ করলে ভাবনা নেই! আমি ওঁর সঙ্গেই যাব। প্লীজ র‍্যাশনট্রাকে আমার জন্যেও একটা সীট রিজার্ভ করে রাখুন; পারমিট হয়ে যাবে ততক্ষণে। কি? হয়ে যাবে না?

—আমি কী করে বলব? পারমিট কি আমার হাতে? এ ডি সি ইটানগরে। উনি যদি আমাকে অনুমতি দেন তবেই আমি দিতে পারি। উনি কাল পরশুই ফিরবেন। দেরি নেই। এলেন বলে।

—দেরি নেই? কাল?...প-র-শু? তি-ন-দি-ন? আর বলছেন, দেরি নেই?

—কৈ, টেলিফোনের কী হলো?—দাদা তাড়া দিলেন।

—ছেলেটা তো আর এলই না। এবার ফিরতে হবে।

—অফিসার ঘন্টি বাজান, ছেলে আসে।

—কই ফোনের কী হল? ইটানগর কী বলল?

—পাওয়া যাচ্ছে না স্যার।

—ঐ শুনুন। পাওয়া যাচ্ছে না। চেষ্টার তো ত্রুটি করিনি। ফোনে না পেলে কী করা? দাদা বললেন—ঠিক কথা। চল, চল, উঠি, খিদে পেয়ে গেছে। আলো বসে আছে।

হল না। ফিরে আসছি। মন খারাপ। হঠাৎ মনে হল—ডাক্তারটিকে চলে যেতে দেওয়া হবে না। ওকে ধরে রাখা উচিত।

—"চলুন, দাদা, গেস্ট হাউসে যাই। ঐ যে, ঐ ডাক্তার লালওয়ানীকে ধরি।"

—কেন? ও কী করবে?

—ওই র‍্যাশনট্রাক হোক, জীপ হোক, যাতে করে ও যাবে, তাইতে করেই আমিও যাব। মেডিক্যাল অফিসার বলে কথা! তাওয়াং পৌঁছেও তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে? ওর সঙ্গে জুটে গেলে দুর্ভাবনা করতে হবে না আপনাদের।

—যদি তার মধ্যে পারমিট না হয়?

—সেটা ব্যাড লাক। চেষ্টা তো করি? গেস্ট হাউসের বারান্দায় সারস পাখির স্টাইলে পদচারণা করছিলেন ডাক্তারবাবু। প্রফেসর বোস ওঁকে ডেকে আনলেন।

—চলুন আমাদের বাড়িটা চিনিয়ে দিই আপনাকে। একটু কফিও খেয়ে আসবেন? আমরা আবার পৌঁছে দিয়ে যাব আপনাকে।

—বাড়ি চিনে কী হবে?

—বাঃ আপনারা যদি আমাকে ফেলে চলে যান? বাড়ি চেনা থাকলে, যে সময়েই আপনারা রওনা হোন না কেন, আমাকে খবর দিতে না পারলেও, তুলে নিয়ে যেতে পারবেন। আমার খুব জরুরি দরকার। তাওয়াং মঠ বিষয়ে একটা কাজে হাত দেব, তার জন্য। আমি

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। নমস্কার।

—নমস্কার।

—চলুন, তবে? কফি খেয়ে আসবেন?

—আপনার সঙ্গে গেলে সেফ্, বুঝছেন না? দাদা বলেন। ইয়াং উওম্যান ট্র্যাভলিং আলোন, ইট ইজ নট আ গুড আইডিয়া—

—তা বটে। কিন্তু—

—কালই যাচ্ছেন তো? কোন্ সময়ে?

—সেটা র‍্যাশনট্রাক ছাড়ার ওপর নির্ভর করবে। সকাল এগারোটা নাগাদ?

কফি খাইয়ে ডাক্তার লালওয়ানীকে পৌঁছে দেওয়া হলো গেস্ট হাউসে।

জিপবাবুকে ফোন করে বলে দেওয়া হোক যে আমি ওর সঙ্গে যাব না। আধখানা পথ গিয়ে কী হ'বে? এ তো আরো ভালো ব্যবস্থা। পুরো পথ।

ফোন করে আমরা অবাক!

জিপবাবু নেই।

তিনি আজই রওনা হয়ে গেছেন বম্‌ডিলা!

—তাই তো? ওঁর বাড়ির কাছ দিয়েই এলুম ফেরার সময়ে। হলুদ পর্দাওলা জিপটাকে দেখিনি।

প্রচণ্ড আঘাত পেলুম মনে। ওঁর কাছে এ বাড়ির ফোন নম্বর, ঠিকানা, সব ছিল। উনি ফোনও করেন নি, খবরও দেননি, নিয়েও যাননি। যদি ওঁর সঙ্গে যাব বলেই বসে থাকতুম? কেন যে মানুষ এরকম করে?

॥ যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি ॥

শীলা বরঠাকুরের স্বামী বলেছিলেন পারমিটে সাহায্য করবেন। তাঁকে ফোন করা হলো। তিনিও বললেন এ ডি সি না ফিরলে পারবেন না। আমি বাড়িতে বসে বসে মরিয়া থেকে মরিয়াতর হচ্ছি।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল।—দাদা, ইটানগরের টেলিফোন ডিরেকটরি কোথায় পাওয়া যাবে ?

—ওই ড্রয়ারে।

এ বাড়িতেই আছে ?

—বলছি তো। ড্রয়ারে।

—ব্যাস্ ব্যাস ওতেই হবে। একবার আমি নিজে নিজেই চেষ্টা করি।

—তুমি কাউকে চেনো ওখানে ?

—নাঃ।

—তবে ?

—না চিনলে বুঝি ফোন করতে নেই ?

—কাকে করবে ?

—দেখি, গবর্নমেণ্টের কাউকে।

শমী ছুটে ডিরেক্টরি এনে দিল। আলোদিও খুব উৎসাহিত। কাকে ফোন করছে রে বাবা! দাদা মহা দুশ্চিন্তিত। ডিরেক্টরি খুঁজে খুঁজে কিছুতেই বুঝতে পারলুম না পারমিট দেওয়ার ব্যাপারটা কার হাতে থাকতে পারে। ডিরেক্টরিতে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে আছি, আর রানিং

কমেণ্টারি শুনছি।

—ওয়াইল্ড গুজ চেজ! দাদার মন্তব্য।

—মাসি, ইউ আর ক্রেজী!—শমী।

—আঃ ওকে দে না যা করছে করতে দে। আলোদি আমার পক্ষে এসে গেছেন। হঠাৎ একটা নামে চোখটা আটকে গেল। যোড়হাটে একটা কথোপকথন শুনেছিলুম। একজনদের বাড়িতে রাত্রে ডিনারে নেমন্তন্ন ছিল। সেখানে ইটানগর থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। বিজয় হেনড্রিকে, ওখানকার এম এল এ, (আমাদের বন্ধু। তাঁরই স্ত্রী রানী আমাকে গাড়ি করে কাজিরাঙ্গা পেঁাছে দিয়েছিলেন।) তাঁকে বলছিলেন ইটানগরে তাঁর এক নিকট বন্ধু (না আত্মীয়?) আছেন, লেফটেনাণ্ট গবর্নরের অ্যাডভাইজার হয়ে। নামটা খুবই অদ্ভুত লেগেছিল শুনতে, আমি শুনেছিলুম—'হাউন্ড'।

গাইডে হঠাৎ দেখি একটা নাম—অ্যাডভাইজার টু দ্য লেফটেনাণ্ট গভর্নর, মিস্টার খাউন্ড্। এই নিশ্চয় সেই!

দাও লাগিয়ে ফোন।

সোজা অ্যাডভাইজার টু দি লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের আপিসে।

নমস্কার। খাউন্ড বলছি।

যথাসাধ্য গলায় ওজন ঢেলে, সীসের মত ভারি করে বলি:

—নমস্কার। তেজপুর থেকে ডক্টর নবনীতা দেব সেন বলছি। আমি এসেছিলুম কলকাতা থেকে যোড়হাটে অসম সাহিত্য সভাতে যোগ দিতে।

—ওহো, ডক্টর দেব-সেন? কালই আপনার একটা ইণ্টারভিউ শুনলাম গৌহাটি রেডিওতে। তা আপনি তেজপুরে কবে এলেন?

এবার আমি অবাক। এ কি রে বাবা? ওঁকে ইম্‌প্রেস করবার জন্যে ডক্টর ফক্টর বলে ইনট্রোডাকশন সুরু করে এখন লজ্জা পেয়ে গেছি।

—আপনার ইণ্টারভিউটা আমার ভাল লেগেছে। ঠিকঠিক কথা বলেছেন। জন্মভূমির ইণ্টারভিউটাও দেখলাম। আপনি তো অসমীয়া পড়তে পারেন।

—অতি অল্পস্বল্প। (ততক্ষণে আমি পুনর্মূষিক।) এমন কিছু নয়। মানে—

—হঠাৎ কী মনে করে ফোন? কী করতে পারি আপনার জন্যে?

—ও হ্যাঁ। আমি একটু তাওয়াং মঠে যেতে চাই। তা, এডিসি এখন তেজপুরে নেই, ইটানগরে। ইনার লাইন পারমিট দিচ্ছে না। কালই একটা ভাল লিফ্‌ট পাচ্ছি তাওয়াংয়ের এম. ও.-র সঙ্গে, তাই—

—নট টু ওয়ারি। আধঘণ্টা অপেক্ষা করুন। আপনার ফোন নম্বরটা কী?

—.....

আপনার ভাষণও কাগজে পড়েছি। ভালো লাগলো আলাপ হয়ে। তাওয়াং মঠ নিয়ে কিছু লিখবেন নাকি?

—হ্যাঁ, ঐ একটু, আরকি, মানে, ও হ্যাঁ, আপনার কথা বিজয় হেনড্রিকের কাছে শুনেছিলাম। তাই—

হ্যাঁ, হ্যাঁ! ওরা কেমন আছে?

—ভাল আছে। রানী আমাকে···

—বেশ বেশ ঘুরে আসুন তাওয়াং মঠ—

আধঘণ্টা পরেই এডিসির অফিস থেকে ফোন এল, ডক্টর সেনের

পারমিটটা যেন আজই পাঁচটার মধ্যে কালেক্ট করে নেওয়া হয়। ডঃ সেনকেই যেতে হবে, সইটই করার আছে।

নাচতে নাচতে ছুটি। শমীর অহংকার ফেটে পড়ছে। আর দাদাকে দেখে মনে হচ্ছে দাদাই ব্যবস্থাটা করে দিলেন।

শমীকে দেখে মনে হচ্ছে শমীই।

আলোদি কেবল বলছেন—

—বলছি না, ও কি সোজা মেয়ে? ও যা চাইছে করতে দাও। ও কুম্ভে-যাওয়া-মেয়ে।

যাবই, আমি যাবই

সন্ধেবেলার মধ্যে শীলা বরীঠাকুরের সবুজরঙের ডবলব্রেস্টেড ওভারকোট এসে গেল। এসে গেল ইলাদির শ্বশুরমশাইয়ের বাঁদুরে টুপি, দস্তানা ও মাফ্‌লার। আলোদি বের করে দিলেন দাদার হাত কাটা স্লিপওভার শমীর হাত পুরো পুলওভার, মোজা। তারপর বেরুনো হলো জুতো কিনতে। মোজাও কিনলুম, দু'জোড়া নাইলন-উল মেশানো। বাটা থেকে "রপ্তানির জন্য প্রস্তুত" কোয়ালিটির কেড্‌স জুতো। লাফাতে লাফাতে বাড়ি এসে বাক্স গুছোতে লাগলুম।

আলোদি ইলাদি শমী খুব উৎসাহিত। দাদা নিরুৎসাহ। স্তিমিত মুখে ঘুরছেন। হঠাৎ উজ্জ্বল মুখে এসে ঘোষণা করলেন—

—"কাল সকালে আগে মেডিক্যাল চেক্‌আপ করাতে হবে। ডাক্তার দেখে যদি বলে, "হ্যাঁ যাত্রার যোগ্য স্বাস্থ্য" তবেই যাবে। না-করলে না।"

হঠাৎ এ কি ফ্যাসাদ রে বাবা! স্বাস্থ্যটা আমার চিরকাল উইক-

পয়েণ্ট। ছেলেবয়েসে আনডার ওয়েট বলে এন. সি. সি. তে নেয়নি। এখন তো শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্। ডাক্তার যত না জানিতং ততই আমার মঙ্গলম্।

—"দেখুন, আমার দু'একটা ক্রনিক ডিজিজ আছে। তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। প্রেশার দেখলে, হয়ত দেখবেন ডায়াস্টোলিক একশো সিস্টোলিক একশো কুড়ি কিম্বা একশো দশ একশো চল্লিশ। এসবে চিন্তার কিছু নেই। ব্রিনারড্রিন বলে একটা ওষুধ আছে সঙ্গে। খেয়ে নেবো এবেলা ওবেলা।

তাছাড়া বুকে স্টেথো লাগালেই শুনতে পাবেন শন্ শন্ শব্দে অ্যাজমাটিক স্প্যাজম চলছে। ও কিছু না। ওটা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমি রোজই স্টেরয়েড খাই, অ্যাজমার বড়ি খাই। সামলে-সুমলে থাকি।

এছাড়া, আমার হার্টে একটু ইস্কিমিয়া হয়েছে, তা, কলকাতার প্রায় সবকজন অ্যাডাল্টেরই হার্দিক অবস্থা তাই। সঙ্গে সরবিট্রেট আছে। —অতএব ডাক্তারবাবু আপনি যাই দেখুন, জেনে রাখুন এটাই আমার নর্মাল ফাংশনিং স্টেট—এটাই আমার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য। অন্যদের সঙ্গে তুলনা করলে তো চলবে না? এভাবেই আমি যদি রোজ চাকরি করতে যেতে পারি, বেড়াতে যেতে পারবোনা? সকলের কি শরীরে সব কিছু সহ্য হয়? আমার হয়। আমি খুব শক্তপোক্ত।

এসব ছাড়া, আমার ঘাড়ে একটু বাত, আর মাথায় একটু মিগ্রেন আছে। তা, তারও ওষুধ সমস্ত সঙ্গে মজুত। বিনাযুদ্ধে ছেড়ে দেব না বুঝলেন? অস্ত্রশস্ত্র সব সঙ্গে। এমনকি ম্যালেরিয়ার জন্যে ক্লোরোকুইন, পেটখারাপের জন্যে এণ্টেরোকুইনল! মানে পুরো শমীবৃক্ষটাই। কেবল

পাগলাষাঁড়ে করলে তাড়া—”

আলোদির আর সহ্য হলো না।

—“হয়েছে! ঢের লেক্‌চার হয়েছে! থামো দেখি? এবার ওঁকে দেখতে দাও। ওঁর সময় নষ্ট হচ্ছে।”

ডাক্তারবাবু বাঙালী। অল্পবয়সী। শান্ত হয়ে স্পীচ শুনলেন। তারপর রুগীকে নেড়ে চেড়ে, উলটে-পালটে, যথাসাধ্য যত্ন করে দেখে, হেসে ফেললেন।

—“যা যা বললেন, ঠিক তাই! বি. পি. একশো বাই একশো পঁচিশ। আগে না বললে ভয়ই পেতাম। এক্ষুনি খান হাফ্‌ ব্রিনারডিন। একশো থাকা ঠিক নয়। এই জন্যই ইস্কিমিয়া। স্প্যাজমও চলছে, তবে বেশি না। ওষুধ চালিয়ে যান। তবে একা তাওয়াং যাচ্ছেন যখন, আমি বল্‌ব সেফ্‌টির জন্য দিনে তিনটে করে স্টেরয়েড খান এখন ক'টা দিন। ফিরে এসে টেপার-ডাউন করবেন। সঙ্গে স্প্রে আছে?”

—“আছে, কিন্তু এক্সট্রা নেই। ফুরিয়ে যেতে পারে। বিলিতি তো, বেশি ছিল না।”

—“নিও-এপিনাইন কিনে নিন একটা, ব্রভন স্প্রে নিয়ে যান সঙ্গে, আর সব ওষুধগুলোই বেশি বেশি করে সঙ্গে রাখুন যখন আপনি যাবেনই—আমি অবশ্য এমনিতে বলব না যে আপনি সুস্থ—”

—“তাহলে তো আমাকে বারোমাসই মেডিক্যাল লীভে থাকতে হয়—”

—“যাচ্ছেন যান, তবে এই স্বাস্থ্যে এই রিক্স নেয়াটা ঠিক হচ্ছে না। সঙ্গে ডাক্তার আছে, তাই নিশ্চিন্ত। কিন্তু একটা কথা, একটানা উঠে যাবেন না যেন পাহাড়ে। হঠাৎ অত হাই অলটিচ্যুডে উঠে গেলে মানুষের ব্রেনের ফাংশনিং অনেক সময়ে অ্যাফেক্ট করতে পারে। পথে জার্নি

অতি অবশ্যই ব্রেক করে যাবেন। চীনে যুদ্ধের সময়ে আমাদের হারের একটা কারণ তো ঐ।"

—"মানে ?"

—"মানে, জেনারেল অমুক উদ্বেগের চোটে খুব জোরে জিপ চালিয়ে নন্‌স্টপ উঠে যান তাওয়াং। ঐ অলটিচ্যুডে ওভাবে ওঠা, শরীর অ্যাডজাস্ট করতে পারে না। ওঁর ব্রেন অ্যাফেক্ট করেছিল। অথচ বাইরে বোঝা যায়নি। উনি যে-সব ডিসিশান নিয়েছিলেন, এবং মিলিটারিকে যা যা অরডার দিয়েছিলেন, সবই পাগলের মত। প্রচণ্ড সেল্‌ফ-ডেস্ট্রাকটিভ এবং রং জাজমেণ্টে পূর্ণ ছিল। তখন তো বোঝা যায়নি, পরে বোঝা গেল যে মেডিক্যালি হি ওয়াজ অ্যাবসলুটলি আন্‌ফিট্‌—"

—"কি সর্বনাশ !"

—"থেমে, থেমে, বুঝলে তো নবনীতা, থেমে, থেমে" দাদা উদ্বিগ্ন স্বরে বলেন—"একটানা নয়। যদি বা ঐ লোকটা উঠতেও চায়, তুমি ওকে এই জেনারেলের গল্পটা বলবে। বুঝলে তো ?"

—"ও তো নিজেই ডাক্তার। ও কক্ষনো একটানা উঠবে না।"—আলোদি বলেন।

ইতিমধ্যে ডাক্তার লালওয়ানীকে ফোন করে জানিয়েছি, যে পারমিট হস্তগত হয়েছে। তিনিও জানিয়েছেন, যে জীপ দুটোর একটাও সারেনি, এবং র‍্যাশনট্রাকেও লোডিং শেষ হয়নি। সন্ধ্যাবেলা ছাড়বে।

এবার ওষুধপত্র কেনার পালা। দাদার গাড়ি সর্বদাই আছে আমার জন্য। সত্যি, এত যত্ন, এত ভালবাসা এত খবরদারি—যেন সত্যিই দাদার সহোদরা বোন আমি—এই পাঁচবছর পরেও তার উষ্ণস্বাদ একটুও কমেনি স্মৃতিতে ! আলোদি খুব কাজের আর তেমনিই মজার। যেমন হাসেন, তেমনি হাসান। মহা আড্ডাবাজ। মজার মজার কথা খেলেও

বটে মাথাতে। আমাদের যে বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের জানালায় বেঁটে-খাটো অল্পকাপড়ের পর্দা টাঙাই আমরা, আলোদি তার গোপন নাম দিয়েছেন বডিজ-পর্দা। উপর-নিচে ফাঁকা, মাঝখানে ঢাকা। চোলি স্টাইলের ব্লাউসের মতো, ওতে কিছুই ঘরের আব্রু থাকে না। এটা অবশ্য উনি খুবই গোপনে বলেছিলেন। কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছি শুনলে চটে যাবেন নিশ্চয়ই! তেজপুরে ক'টাই বা দিন? কিন্তু দাদা-আলোদি-শমীর সঙ্গে সম্পর্কটা যেন অনেক দিনের পুরোনো বাঁধন।

সারাদিন আড্ডায় আর উত্তেজনায় কাটল। কলকাতায় টেলিফোন করে মাকে খবর দিয়ে দিলুম। "ফিরতে সাতদিন দেরি হবে—তেজপুর থেকে বাইরে, অরুণাচলের দিকে একটু ঘুরতে যাচ্ছি। মা গো যেন ভাবনা কোর না!"

দাদাকে বলে গেলুম প্লেনে বুকিং করে রাখতে। সাতটা দিন হাতে নিয়ে সন্ধে বেলা রওনা হচ্ছি তাওয়াং। ম্যাকমাহন লাইনের পাশে। সেই লাসা-তাওয়াং রোড, যেখান দিয়ে চীনেরা এসেছিল! সেই যে আশ্চর্য পুঁথি বোঝাই মঠের কথা রীতা গুপ্তর মুখে শিলঙে শুনে অবধি সেখানে যেতে আমার ভীষণ লোভ! সত্যি সত্যিই সেখানে যাচ্ছি!

ইলাদির শ্বশুরের টুপি-দস্তানা-মাফলার শীলার কোটের পকেটে গুঁজে, ব্যাগের ওপরদিকে শমী, ও তার বাবার সোয়েটারগুলো রেখে, নিজের শালটি গায়ে দিয়ে, সুটকেস হাতে গুটিগুটি দুগ্‌গা বলে রওনা হলুম পাঁচটা নাগাদ, যেখানে ট্রাকটি থাকবার কথা। গিয়ে দেখি, বাপ্‌স্। বিরাট, বিশাল, জবরদস্ত একখানা লরি। যেমন লরি ফুটপাথে উঠে পড়ে—পথে শুয়ে থাকা মানুষদের চাপা দেয়। কেন যেন 'ট্রাক' বলতে আমি মনে মনে মিলিটারি ট্রাকের মতো ঢাকা গাড়ি ভেবে নিয়েছিলুম।

খোলা লরি দেখে একটু ঘাবড়ে গেলুম না তা নয়। যদিও খোলা লরিতে চড়েই তো দুর্গাঠাকুরের সঙ্গে বিসর্জনে যেতুম। কিন্তু এটা শুধু খোলা লরিই তো নয়? এ যে দোতলার সমান উঁচু জিনিসপত্রে ঠাসা! অসংখ্য বস্তা, অনেক থলি, এবং বহু বহু কাগজের কার্টন। এ ছাড়া, আস্ত-মস্ত গোদরেজের আলমারি। এবং প্রচুর বেতের আসবাব পত্তর। তার ওপরে বসে রয়েছে ঝুড়ি ঝুড়ি জালঢাকা নানা সাইজের মুরগী। তারা কঁক্ কঁক্ করে প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করছে। ওদের ওপরে আমিই বা উঠবো কোথায়, ডাক্তার লালওয়ানীই বা বসবেন কোথায়?

—"আরিবাব্বা! এইটা কী জিনিস? এর মধ্যে মানুষ বসবে ক্যামন করে? নো নো নো। ইউ আর নট গোয়িং ইন ইট। ইমপসিবল।" দাদা ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়তে থাকেন। কোলে তাঁর আদরের নাতনী, (ভাইঝির কন্যা) আলোদি সমেত আমাকে তুলে দিতে এসেছেন। তাঁর সেই মাথা নাড়া আমি কোনোদিন ভুলবো না। আমি হলেও মাথা নাড়তুম ঐরকমই।

—"নো, নো, নো। ম্যাডনেস্—এটা তো মালবোঝাই! এর মধ্যে তুমি উঠবে কোথায়?"

আলোদি অবাক হয়ে বলেন—"তাছাড়া এতে তো কোনো ছাদই নেই! জায়গা থাকতও যদি, শেডহীন গাড়িতে আমি ওকে যেতেই দিতাম না! ঠাণ্ডা লেগে নিমোনিয়া হয়ে যাবে যে। আমি ভেবেছিলাম শেড আছে বুঝি! এত বড় ধ্যাধ্ধেড়ে মালের লরি করে কি মানুষ যায়? ও যাওয়া-টাওয়া হবে না। ফিরে চল।" আলোদি এবারে খুবই জোরালো আপত্তি করেন।

আমিও ঘাবড়ে গেছি।

সত্যিই তো। দি স্পিরিট ইজ উইলিং বাট দি ফ্লেশ ইজ উইক। এর

মধ্যে উঠে বসবার মত তিলটিও স্থান নেই। মুরগীরা পর্যন্ত বিরক্ত। এই মালপত্রের মনুমেণ্টের মাথায় চড়ে বসবো কোন্‌খানে? গাড়ি চললেই পড়ে যাবো যে।

দাদা আর আলোদির কথার বিরোধিতা করবার মতো কোনোই সৎ-যুক্তি আমার মাথায় আসছে না। সব কথাই যথার্থ।

মন মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। তার মানে আজ হল না।

ঠিক হ্যায়। জিপ তো সারছে। সারুক। যাবই, আমি যাবই। একটাকে না পাব যদি আরেকটাকে পাবই।

সেই ডাক্তারই বা গেল কোথায়? নিশ্চয়ই এটাতে উঠতে না পেরে অন্য কোনো গাড়ি চেপে হাওয়া। সেই বাঙালী জিপ-বাবু যেমন না বলে একদিন আগেই নো-পাত্তা।

—সবাই এক।

—কেউ আমার কথা ভাবেনি।—না ঈশ্বর না প্রতিমা!

এমন সময়ে লাজুক লাজুক মুখে একটু দূরে এসে দাঁড়ালো ডাক্তার। আমাকে চেনবার লক্ষণ দেখালো না।

দাদা এগিয়ে গেলেন উদ্বিগ্ন মুখে।

"—বসবে কোথায়? এ তো মাল বোঝাই!"

—"বসার জায়গা তো ভিতরে।" ডাক্তার খুব স্বল্পভাষী।

—"কিসের ভিতরে?" মালের পাহাড়ের তলায় দৃষ্টি চালাতে চেষ্টা করেন দাদা। গুহাটুহা আছে কিনা!

—"ড্রাইভারের পাশে।"

এতক্ষণে নজর করি—সত্যিই তো লরির তো ছোট্ট একটুখানি ছাদ-ঢাকা অংশও থাকে! তার মধ্যে বসে থাকে ড্রাইভার ক্লিনার

ইত্যাদি। সেখানে কি আরো লোক বসানো যায়? দেখি, কতটা জায়গা? উঁকি মারতে গিয়ে টের পাই লরি ব্যাপারটা কতটা উঁচু। ড্রাইভার সিংহাসনে বসে আছে। মাটির চেয়ে অনেকখানি উঁচুতে। আমার মাথার কাছ বরাবর দরজার পদপ্রান্ত। লরির গায়ে তিনটে পা-দানি আছে অবশ্য, ওঠার জন্য। সেগুলো একটা অন্যটার নিচে, একই লাইনে। সিঁড়িভাঙা নয়। ওঠা খুবই শক্ত। কেউ হাত ধরে না টেনে নিলে আমার পক্ষে ওঠা অসাধ্য। কোনো হাতল টাতলও নেই যেটা ধরে উঠবো। দরজাটা দাদাই খুললেন। মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিলেন। ভেতরে কে একজন লোক বসে আছে। ড্রাইভারই বোধহয়। ক্লিনারও হতে পারে। গুটি গুটি গিয়ে তার হাতেই আমার বাক্সটা তুলে দিই। সে তুলে নেয়। আমাকে এক্সপেক্ট করছিল মনে হয়। তার পরে আমার দক্ষিণ হস্তটি বাড়িয়ে দিয়ে অকারণ রুক্ষগলায়, খুব গম্ভীর হ'য়ে বলি ঃ

—"মেহেরবাণী করকে হামারা হাথ পকড়কে উপর খিঁচ লিজিয়েগা জরা!" (হাত ধরে তুমি লয়ে চল সখা!) সে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে দেয়। পাণিগ্রহণ করে। আমিও শক্ত করে তার হাতটি ধরি; সাবধানে ওই ধাপগুলোতে পা রাখতে রাখতে ওপরে উঠে পড়ি। উঠে পড়ে আর গাম্ভীর্য থাকে না। নিশ্চিন্ত হয়ে হেসে ফেলি—"থ্যাংকিউ জী!"

সেও হাসে—"উঁচা হ্যায় আপকো লিয়ে। সাবধানীসে উতারনা জী।"

ব্যাস্। হয়ে গেছে। টীমওয়ার্ক চলবে। ওই হাসিটাই শিলমোহর করে দিয়েছে টীম। নিশ্চিন্ত হয়ে তাকিয়ে সীট-ফিটগুলো নিরীক্ষণ-সমীক্ষণ-পর্যবেক্ষণ করি। বেশ তো। পুরোনো প্রাইভেট বাসের টানা সীটের মতো। ৪।৫ জন বসতে পারে। মন্দ কি?

দাদা-আলোদি নাতনী সমেত বাইরে। উদ্বিগ্ন।

—কী ? কেমন ব্যবস্থা ? ভালো.?

—"ভালো, আলোদি, খুব ভালো, কিছু ভাবনা করবেন না।"

—"কখন ছাড়বে ?"

ড্রাইভারই উত্তর দেয়, ছাড়লো বলে।

—মিনিট পনেরোর মধ্যে। দুজন আসা বাকি। ওরা এলেই ছাড়বে।

—"তবে চলি ? ছ'টায় বাচ্চার খাবার টাইম—"আলোদি বলেন।—"সাবধানে যেও। ওষুধপত্র খেতে ভুলে যেও না।"

—"পথে নিশ্চয় থামবে কিন্তু! মনে থাকে যেন!"

—"সাবধানে থেকো।"

—"ফিরতে দেরি কোর না।"

—"আমরা ভাবনায় থাকবো কিন্তু। একা যাচ্ছো।"

—"আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।" একা যাচ্ছি না। আমি কখনো কোথাও একা যাই না। এটাই মজা!

—"কিছু ভাবনা করবেন না। ঠিক সময়ে ফিরবো।"

—'যার কেহ নাই, তুমি আছো তার।'—এই চমৎকার কথাটা মনে থাকে না কেন কারুর ? রজনীকান্ত বেশি কবিত্ব না করে সহজ সরল ভাবে কথা বলতেন। আমার সেটা খুব মনে ধরে।

উঃ। একা। একা। একা।

শুনতে শুনতে শুনতে মন সত্যিই একা হয়ে যায়।

—কে একা নয় ?

—এমন কেউ আছে কি জগতে যে একা নয় ? এমন কি শ্যামদেশী যমজরাও একটা বিন্দুতে খুব একা। আমরা মনে করি, 'আমরা দু'জন', 'আমরা চারজন', 'আমরা দশজন'। ঠিক। সে তো আমরা। কিন্তু

আমি? আমি-টা ক'জন? 'আমি দু'জন' তো নই? আমি মানেই একলা।

যেখানেই আমি, সেখানেই একাকিত্ব। একমাত্র সন্তান বলে জন্ম ইস্তক আমি এই 'একা'-গাল খেয়ে আসছি।

এখন আবার ঘর গেরস্থালি নেই বলে আরেক দফা নতুন করে 'একা'-গাল খাচ্ছি।

আরে বাপু, আমাকে বলছ যে, তুমিই বা কোন্ দু'জন?

তুমিও একাই।

আমি-ও একা। তুমি-ও একা।

এটা গ্রামাটিকাল ফ্যাক্ট। একাকিত্বটাই মূল অবস্থা।

আমি কিন্তু একলা নই।

'যার কেহ নাই, তুমি আছ তার' আমার চেয়ে বেশি করে আর কে জানে, এ-উচ্চারণের সত্যতা!

দাদা-আলোদিরা নাতনী নিয়ে চলে গেলেন। আরো দু'জন লোক এসে পড়ল ডাক্তারও উঠে পড়ল। অন্ধকার নেমে গেছে তখন তেজপুরের পথেঘাটে। আমাদের লরির, স্যরি, ট্রাকের—হেডলাইট জ্বলে উঠল, যেন সার্চলাইট—দূর দূরান্ত পর্যন্ত আলো ছড়িয়ে পড়ল। সামনে একটি ধূপদানিতে দু'তিনটি ধূপকাঠি। তাতে দেশলাই ধরিয়ে দিল।

আর একটা পাৎলা শাদা গামছার মতো জিনিস জড়ানো আছে একটা দণ্ডে। মালার মতন করে। আমরা পাঁচজন পাশাপাশি বসেছি। কোনোই অসুবিধা হচ্ছে না। আমার পাশে কোট, ব্যাগ রাখা। ছ'জনও বসতে পারত। অবশ্য আমরা কেউই মোটা নই। ভয় করছে, ধূপের

গন্ধে আমার হাঁপানি না বেড়ে যায়। ধূপের ধোঁওয়া ধুনোর ধোঁয়ায় আমার আবার অ্যালার্জি। মহাপাপী আর কাকে বলে! আরেকটাও অন্য স্বাদের তীব্র গন্ধ আসছে এপাশ থেকে। একটু কম পবিত্র গন্ধ। এতেও আমার রুচি নেই। এতেও গা বমি-বমি করছে। এই দুর্গন্ধের মধ্যে ক'দিন ? ক'ঘণ্টা ? কত অনন্ত মুহূর্ত ? মহা মুশকিল হল দেখছি। একটু দেখি। গাড়িটা ছাড়ুক তো। জোরে বাতাস ঢুকলে হয়তো খোলা হাওয়ায় এসব সুগন্ধ-দুর্গন্ধ সবই উড়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতেই হর্ন দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। দুর্গা দুর্গা। আমার গুরুদাস দাদা হলে বলতেন 'জয় জয়'। কার জয়, কিসের জয়, সেসব কিছু না। কেবলই জয় জয়কার। ও যার জয়, সে জানে, সে ঠিকই তুলে নেবে নিজের জিনিসটি নিজে।

মিস্টার সেন মিসেস সেন

—নমস্তে। আপকা শুভ্‌নাম ?

হিন্দি দিয়ে শুরু করাই ভাল। সর্বভারতীয় ভাষা। ট্রাকচালকের ভাষা তো বটেই। ডানপাশের ছেলেটিকে দিয়ে সুরু করেছি। বয়েস উনিশকুড়ি হবে।

—মাইলা।

—আপ ক্যা করতে হেঁ ?

—হাম তো ক্লীনার।

—আপ অহমিয়া ?

—নেই, নেই। নেপালী।

—নেপালী ? আচ্ছা, আচ্ছা। ঔর আপ্‌কর শুভ্‌নাম ? ড্রাইভর সাহাব ?

—জী, মানচন্দ্‌।

—আপ্‌ ভি অহমিয়া নেহী ?

(হিন্দি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।)

—জী নহী। ম্যায় তো রাজপুতানাসে আয়া। ম্যয় জাঠ হুঁ।

—রাজপুতানাসে ইত্‌না দূর চলা আয়া ?

—ঔর ক্যা ? রোটিকে লিয়ে। কামকা ওজেসে।

—বহুৎ সাল হো চুকা, ইধরমে আপ কাম কর্‌তে হেঁ ?

—জী হাঁ। ম্যঁয় তো অ্যাসামীজ ওয়াইফ্‌ লে লিয়া। ইধরই ঘর বনা লিয়া। যুবকটি এবার এদিকে মুখ ফিরিয়ে হাসে। চমৎকার ঝলমলে হাসি।

—বাঃ বাঃ। গুড। লেকিন রাজপুতানাকে লিয়ে দিল্‌ নেহি দুখাতা ? আরেকবার হাসল মানচন্দ্‌। ধবধবে হাসি।

—যাতা ভি হুঁ কভী কভী। মাবাপ হ্যায়। ভাই হায়। রূপাইয়া ভেজতা হর্‌ মহিনা।

এবার যাঁকে প্রশ্ন করি তিনি আমার ঠিক বাঁ পাশে। তিনিই গাড়ি দুর্গন্ধে আমোদিত করে রেখেছেন। ধূপের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে তার পানীয়। আমার ভয় করছে তিনি যে-কোনো মুহূর্তে ঢুলতে ঢুলতে আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়বেন। তাই তাঁকে জাগিয়ে রাখাটা খুব দরকার। এবং এই তীব্র মদের গন্ধেরই বা কী ব্যবস্থা করা ? গলা খাঁকারি দিয়ে বাক্য শুরু করি।

—নমস্তে জী।

—ন্নন্‌মস্তে। গর্‌রর্‌…।

—আপকা শুভ্‌নাম ?

—গর্‌রর্‌রা·····।

—আপকো নাম বাতাইয়ে, মেমসাব নাম পুছতা—মাইল্‌া জোরে জোরে বলে। হাসতে হাসতে। মজা পেয়ে।

—ন্নাম ? মেরা ন্নাম মিস্টার সেন। আপ্‌কা ন্নাম কেয়া ? এক চোখ খুলে তিনি জবাব দেন।

—মিসেস্‌ সেন।

—কেয়া ?—দুটি চোখই খুলে যায়। নেশাও কেটে গেছে বলে মনে হয়। ভাবটা "ঠিক শুনছি তো ?" টাইপের। উদ্বিগ্ন।

—নাম কেয়া বোলা আপকা ?

—মিসেস সেন।

—মিসেস সেন ? আপ্‌ বাঙালী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপ্‌ বদ্যি ?

—আজ্ঞে হাফ্‌-বদ্যি। বদ্যি বাই বার্থ নই, বদ্যি বাই ম্যারেজ।

—ওই একই হইল গিয়া। গোত্রান্তর হইয়া যেইটা হইসেন, হেইটাই অহন আপনের জাতি। গুড। মিসেস সেন, মিস্টার সেন। মিস্টার সেন। মিসেস সেন। ভেরি গুড।

—সর্বনাশ ! শুনেছি মাতালদের, দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলে তারা নেশা কাটিয়ে ওঠে। তাই বলি।—মিস্টার সেন, আমার ধোঁয়ায় খুবই অ্যালার্জি। এই ধূপের ধোঁয়াতে আমার হাঁপানি হবে। ওটা নিবিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন ?

—সর্বনাশ ! তাই হয় কহনও ? মঙ্গলচিহ্ন বইল্যা কথা ! পার্বত্য পথে কত শত বিপদ আপদ। ধূপ জ্বালাইয়া বিপদ খণ্ডন করে কিনা ?

ও-ধূপ নিবাইতে নাই। ও আমি পারুম না।

অগত্যা ডাক্তারের শরণাপন্ন হই। ঐ আর্জিটাই ইংরিজিতে পেশ করি। এবং ওই উত্তরটাই ইংরিজিতে শুনতে পাই। সঙ্গে আরেকটুও কথা বলেন ডাক্তারবাবু।

—আপনি বরং এদিকে এসে বসুন, জানলার কাছে। ধূপটা তো ড্রাইভারের পাশে—এতদূরে ধোঁয়া আসবে না। ফ্রেশ এয়ারও পাবেন। গাড়ি থামলে বদলে নেবেন। একটু বাদেই নিবেও যাবে অবশ্য। নিবে যাবার কথায় কান না দিয়ে, এবার আমি আরেকটু বলি—

—মিস্টার সেনও যদি ড্রাইভারের পাশে চলে যান, মাইলা আর আপনি ওদের এপাশে থাকেন, তাহলে, দুটো গন্ধই দূরে থাকবে। অন্য গন্ধটাও আমার সহ্য হচ্ছে না।

—স্যরি। মিসেস সেন। স্যরি।—বলেন মিস্টার সেন। বেশ ইংরিজি বোঝেন তার মানে।—আমি ত জানতামনা লেডি প্যাসেঞ্জার আছে, জানলে খাইতাম না আইজ। লেডিপ্যাসেঞ্জার তো থাকেনা, এক ফেমিলি ছাড়া।

—তার মানে ?

—মানে অনেক সময় তো ফেমিলি ট্র্যাভেল করে। বম্‌ডিলা, জামীরী, কি দিরাংজং কি রূপা, কোথাও হয়তো হাজব্যাণ্ড ব্যবসা করে, কি চাকরি করে। ফেমিলি লইয়া যাতায়াতের সময় ট্রাকে তাগো লেডিরা উঠে, বেবিরা উঠে। কিন্তু সিংগিল লেডি যাইতে দেখি নাই বড় একটা। মনে পড়ে না, দেখসি বইল্যা।

—যত কথা বলছেন ততই গন্ধ উৎসারিত হচ্ছে। আমি বলেই ফেলি—

—মানচন্দ্‌ জী, জরা গাড়ি রুখিয়ে গা ? জাগা বদ্‌লি কর্‌না পড়েগা।

বু-সে মেরা তবিয়ৎ···

—জী জরুর। থোড়া বাদ রুখ লেগা। লে-বাই আয়েগা আভি আভি।

গাড়ি থামে। জায়গা বদল করে আমি বসি জানলার পাশে। তারপর ডাক্তার, মাইলা, মিস্টার সেন, মানচন্দ্। খাঁজে খাঁজে পা রেখে রেখে ওঠা নামা করতে খুবই কসরৎ লাগে। মানচন্দ্ সাহায্য করে। সে উল্টো দিক থেকে নেমে এগিয়ে এসেছে। ওঠার সময়ে তারই সাহায্যে উঠেছিলুম। মাইলা টর্চ ধরে খাঁজ দেখিয়ে দেয়। এই তো, চমৎকার ফ্যামিলি। একটুও একলা লাগছেনা আমার। কে বলেছে আমি একা ট্র্যাভল করি? কক্ষনো নয়। সপরিবারে। সর্বদা সপরিবারে। মানুষের পরিবার কি একটা?

যেতে যেতে এক জায়গায় গাড়ি থামে। মিস্টার সেন বলেন এখানে র‍্যাশনের দোকানে তাঁরা এখন মাল দেবেন। আমরা ততক্ষণ চা খেতে পারি। উল্টোদিকে চায়ের দোকান। আমি প্রথমে ছোট মণিহারী দোকানটিতে যাই, একটা ব্যাটারি সমেত টর্চ কিনি। সঙ্গে টর্চ না থাকাটা একটা মস্ত অসুবিধা। পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে আলোর জন্যে। আমার মতন শহুরে সং-সাজা মেয়ে-খরিদ্দার বোধ হয় এই দোকানে আসেনা। চারিদিকে ছোট ছেলেমেয়ের ভিড় জমেছে। দারুণ দোকান! দোকানে তেল সাবান, শ্লেট পেনসিল, খাতা, কালি, বিস্কুট, লজেন্স প্লাসস্টিকের নানান জিনিস, চটের থলি, ইশকুল ব্যাগ, কড়াই সস্প্যান, ছুরি কাঁচি স্টোভ, লণ্ঠন, কী নেই? এমন কি বেডকভার লুঙ্গি, সোয়েটার পর্যন্ত আছে। আটফুট বাই দশফুটের মধ্যে এমন

খানদানি ডিপার্টমেণ্টাল-স্টোর জগতে কোথাও দেখিনি !

টর্চ কিনে বেরিয়ে দেখি মানচন্দ্‌ মাইলা ও মিস্টার সেন ভারি ভারি বস্তা নামাতে ব্যস্ত। ডাক্তার গেল কোথায় ?

ওই যে।

হাতে চায়ের গেলাশ। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে লম্বুদাদা।

আমিও যাই। একটা চা নিয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

অমনি ডাক্তার অন্যমনস্কভাবে চলতে সুরু করে লরির দিকে। হাতে চায়ের গেলাস।

এ কি রে বাবা ? কোথায় চলল ? আমাকে দেখেই পালাচ্ছে নাকি ? ভারি মজা তো ?

ফলো করবো নাকি ? ভয় দেখাবো ? না, থাক। যাকগে যেখানে যাচ্ছে। আমি এখানেই চা খাই।

ও ওখানে শান্তিতে চা খাক।

হাতী ! চিতা ! জ্যাকল !

চা শেষ।

ওদের কাজও শেষ।

মানচন্দ্‌ গাড়িতে চড়ে হর্ন দিচ্ছে। ডাক্তার এল চায়ের গেলাস ফিরিয়ে দিতে। না এসে উপায় নেই ! সেধে সেধে আমি কথা বললুম—

—আবার কতক্ষণ পরে থামবে ?

গেলাস নামিয়ে ডাক্তার ফিরে যেতে যেতে বলল—আই ডোণ্ট নো। ফিরে গিয়ে লরিতে বসলুম। গাড়ি ছুটল।

—এখন আর থামবে না। —মিস্টার সেন বললেন, এবার জঙ্গলে ঢুকবে কিনা। কত জীবজন্তু দেখা যায়।

—সত্যি ? কী কী জন্তু ?

কাজিরাঙ্গার অভিজ্ঞতায় টৈটুম্বুর মাথা তখন।

—কত! কত! হাতীর পাল, চিতাবাঘ, বান্দর, গণ্ডার, হরিণের দল, ভালুক, খরগোশ, প্রচুর, প্রচুর।

—আমরা দেখতে পাবো ?

—নিশ্চয়ই। হেডলাইটে ধরা পড়বো, ছ্যাখবেন। কত জীবজন্তু। আমিই ছ্যাখাইয়া দিমুখনে—

—দেবেন তো ? প্লীজ, দেবেন কিন্তু ঠিক। আমি গদগদ।

একটু বাদেই চীৎকার!

—হাতী! হাতী! ঐ যে, হাতী! ছ্যাহেন! ওঁর নিশানা লক্ষ্য করে দেখি সত্যিই একটা হাতী বনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে, বড়রাস্তার ধারে একটা সিমেণ্টের গেটের গায়ে শুঁড় ঘষছে।

—আপনের ওদিকেও একটা আছে। বলেন মিস্টার সেন।

আমার দিকেও? সত্যিই তো। তোরণের এদিকেও আরেকটা হাতী। ঐ একই মনোরম ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। কী ব্যাপার ?

অ।

সিমেণ্টের হাতী।

হাতীর মূর্তি। প্রমাণসাইজ। রং করা।

রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ দেখলে সত্যি হাতী বলেই মনে হয়।

হাঃ হাঃ হাঃ। কেমন মজা ? মিসেস সেন খুব ঠক্‌ছেন!

—হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ। সত্যি। খুব মজার!

(মজার না ছাই!)

মাইলা, মানচন্দ্‌ কেউই কথাবার্তা বিশেষ বলেনা। ডাক্তার তো মুখে তালাচাবী এঁটে বসেছে। মিস্টার সেন কথা না বললেই ভাল হত, কিন্তু তিনিই কথা বলছেন। ভদ্রলোক মানুষ ভালই। আই. এ. পাশ করে নানান কাজে, নানা ধান্ধায় ঘুরেছেন। আর্মিতেও জয়েন করেছিলেন। নর্থ বেঙ্গলের লোক। এখন সেট্‌ল্‌ড তেজপুরেই। অসমীয়া স্ত্রী। নর্থ বেঙ্গলেও স্ত্রী ছিল। বাঙালী। একটি ছেলেও হয়েছিল। কিন্তু তাদের উপযুক্ত দেখাশুনো করেন নি। কে জানে তাদের কী হয়েছে। তাদের জন্য মাঝে মাঝে মিস্টার সেনের মনটা খুব পোড়ায়। বাবা মা? তাঁরা মারা গেছেন বাল্যকালেই। তাঁর অসমীয়া স্ত্রীটি খুবই ভাল। দুটি মেয়ে তাঁদের। একটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। অবশ্য সেই মেয়েটি স্ত্রীর আগেই ছিল। তাঁর প্রথম স্বামীর। আর একটি মেয়ে মিস্টার সেনের। সে স্কুলে পড়ছে। হ্যাঁ, তাঁরা খুব সুখী। বিধবাবিবাহ করেছেন মিস্টার সেন। তাঁর স্ত্রীর স্বামী একজন জওয়ান ছিল, চীনাযুদ্ধে প্রাণ দেয়। মেয়ে নিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছিলো সুন্দরী সদ্য বিধবাটি। মিস্টার সেনের ছন্নছাড়া জীবনে ছন্দ এনে দিয়েছে এই স্ত্রী। তার বহু আগেই ছেড়ে এসেছেন প্রথম স্ত্রী পুত্রকে, তখন তাঁর জীবনই ছিল অন্য ধাঁচের। মোটেই ভাল না!

—"ইররেসপনসিবল নেচার ছিল আমার। কাকা বিয়া দিসিলেন, ঠিক করেন নাই। তখনও বিবাহের যোগ্য হই নাই।"

যেন এখনই খুব যোগ্য! প্রথমে রাগ হল। তারপর মনে হয়, কে জানে, হয় তো যোগ্য। মদ খাওয়া মানেই তো উচ্ছন্নে যাওয়া নয়।

দেখাই যাচ্ছে স্ত্রীকে, মেয়েদের খুব ভালবাসেন।

বেশ যাচ্ছি, যাচ্ছি, উনি কথা বলছেন, আমি শুনছি। হঠাৎ উনি বলে বসলেন—

—মিসেস সেন, আপনের মিস্টার কী করেন? তাওয়াঙে পোস্টেড বুঝি?

সত্যি। যেভাবে আমি তাওয়াঙে ছুটেছি, মনে হতেই পারে, উৎকণ্ঠ আমার লাগি ওখানে কেহ প্রতীক্ষিয়া আছে। কী বলি এখন?

এখানে গুল মারার বেশ চান্স আছে। বললেই হয়, শুনছি মিস্টার সেন তাওয়াং মঠে লামা হয়ে আছেন, গত বিশ বছর নিরুদ্দেশ। অথবা, সেই চীনেযুদ্ধের সময়ে তাওয়াঙে যে পোস্টেড ছিলেন, তারপর থেকেই নো নিউজ। অথবা, হ্যাঁ, উনিই তো আমাকে নিতে আসবেন।

কিন্তু কোথায়? এই ট্রাক কোথায়, কোন ঠিকানায় পৌঁছে দেবে আমাকে? তাও তো জানি না। ভাবতে ভাবতেই শুনতে পেলুম আমি বলছি—

—মিস্টার সেন বিলেতে থাকেন।

—বিলাইতে? কিসের বিজনেস? রেস্টুরেন্ট? বহুৎ বাঙালী ঐ বিজনেসে আছেন।

কথা ঘুরিয়ে দিতে সুযোগ পেয়ে মহা উৎসাহে বলি—হ্যাঁ হ্যাঁ সিলেটী আর চট্টগ্রামী বাঙালীতে ভর্ত্তি। তাঁরা বেশিরভাগই বাংলাদেশী অবশ্য এখন। দারুণ চলে ইনডিয়ান রেস্তরাঁগুলো।

—আপনের মিস্টার আপনারে নিয়া যান নাই বিলাইত? আপনি গেছেন? লণ্ডন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেকবার।

—বাঃ। বাঙালী মাইয়া আরো অনেক আছে, নায়? বিলাইতে?

—ঢের! প্রচুর। গাদা গাদা।

—আমাগো জীবনে কিস্থুই হইল না।

—তা কেন বলছেন।

—পৃথিবীডাই দেখা হইল না। কূয়ার বেঙ্ হইয়াই জীবন কাইট্যা গেল। কূপমণ্ডুক।

—তা কেন বলছেন। আপনি কত ধরনের মানুষ দেখেছেন, কত ধরনের জীবনযাত্রা দেখেছেন, কত জায়গায় ঘুরে, কতরকমের বিভিন্ন কাজ করেছেন। আপনার তো বেশ অন্যরকম অভিজ্ঞতা।

—কিন্তু জাহাজের কাম ত করি নাই। আমার শখ্ডা আছিল সেইলর হওনের। লাইফে সেই চান্স তো পাইলাম না। ঐ যে, ঐ চিতাবাঘ।

—কী? কী? কী?

—চিতাবাঘ। ঐ যে। ঐ পলায়। চক্ষু দেখা যায়। ঐ ছাখেন। চক্ষু। সত্যিই, এক জোড়া সবুজ চোখ। কী একটা ছোট জীব, দৌড়ে পালালো, তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো। চোখ জ্বলতে লাগলো অন্ধকারে।

—চিতাবাঘ ওটা?

—আবার কি? কইসিলাম না চিতা আছে? লেপার্ড! হরিণও আছে। আর ভালুক। বিশাল!

আমিও এবার চেঁচাই ঃ

—ওই যে! ওই দেখুন! লেপার্ড! আপনারা কেউ লেপার্ড দেখছেন না কেন? আশ্চর্য তো!

সঙ্গীদের অন্যমনস্কতায় যারপরনাই বিচলিত হয়ে আমি পার্শ্ববর্তী নির্বিকার ডাক্তারকে এক ঠেলা মারি। হঠাৎ ঠেলা খেয়ে বিরক্ত হয়ে

বোবা ডাক্তার কথা বলে ফেলে :

হোয়াট লেপার্ড ? দ্যাট্‌স আ জ্যাকল। লেপার্ডস ডোণ্ট কাম নিয়ার মেন।

—তবে যে উনি বললেন।

—হি হ্যাজ হ্যাড টু মাচ টু ড্রিংক। এ পথে কোনো জীবজন্তু বড় একটা দেখা যায় না শেয়াল আর খরগোশ ছাড়া। মাঝে মাঝে অবশ্য হরিণ দেখা যায়। বাঁদর ? দু'একটা। হাতীও দেখা গেছে বটে। তবে ওরা এদিকে খুব একটা আসে না। ভাল্লুক ? কক্ষনো না। বাইসন ? কি জানি। রাইনো ? নেভার। লুক, হি ইজ টকিং নন্‌সেন্স।

রাগে ডাক্তার অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছে। এই সুযোগে ভাব জমানো যাক। মুখটা যখন খোলাই গেছে একবার।

—ডাক্তার, আপনার দেশ কোথায় ?

—বরোদা। আগে ছিল সিন্ধুতে। এখন সেটা পাকিস্তানে।

—কোথা থেকে পাশ করেছেন ?

—বম্বে।

—কত দিন হল পাশ করে বেরিয়েছেন ?

—বছর তিনেক।

—মাত্র ? কতদিনের চাকরি ?

—দু' বছর।

—মাত্র ? দেশে কে কে আছেন ?

—সবাই।

—সবাই মানে কে কে ?

—বাবা মা, ঠাকুর্দাদা ঠাকুমা, ভাই বোনেরা।

—আপনি হায়ার স্টাডিজে গেলেন না কেন ? আগেই চাকরিতে—

—যাবো তো। টাকা জমিয়ে নিই। বাপের টাকায় তো যেতে পারবো না? স্কলারশিপ পাবার মতো অতো ভালো ছাত্রও নই। তাই চাকরিতে ঢুকেছি। টাকা জমাচ্ছি। আর তিন বছর পরেই আমেরিকায় যাবো।

—আমেরিকায় কেন?

—আমার ওখানেই যেতে ইচ্ছে। ইংলণ্ড ইজ ওল্ড ফ্যাশন্ড।

—ইনডিয়ান ডিগ্রি ওরা মানে কি ইট এস এ তি?

—মানে তো। হায়ার স্টাডিজের জন্য কোনো অসুবিধা নেই। চাকরি করতে-করতেই পড়া যায় টীচিং হাসপাতালে।

—খবর সবই নেওয়া হয়েছে দেখছি! কেবল যাওয়াই বাকী।

লাজুক হেসে ডাক্তার চুপ করে যায়। আমাকে একটাও প্রশ্ন করেনি। কেবল আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। যেন ইণ্টারভিউ দিচ্ছে। মিস্টার সেনও "স্বামী কী করেন" প্রসঙ্গটা টেনে চেপে ধরেননি। ডাক্তার তাঁকে 'হি ইজ টকিং নন্‌সেন্স' বলায় এবং লেপার্ড-কে জ্যাকল বলায় তাঁর খুব রাগ হয়েছে। তিনি মৌনী হয়ে গেছেন।

ধূপ কখন নিবে ছাই। কিন্তু ধোঁয়া আছে। মাইলা মাঝে মাঝে সিগারেট ধরিয়ে মানচন্দ্‌ এর ঠোঁটে তুলে দিচ্ছে। নিজেও খাচ্ছে।

সিগারেটের ধোঁয়াতেও আমার শ্বাস কষ্ট হয়। কিন্তু এখন হচ্ছে না। দুদিকের জানলা খোলা। হু হু করে রাতের বাতাস বয়ে যাচ্ছে লরি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে। ঠাণ্ডা হাওয়া, কিন্তু এমন কিছু হিমঠাণ্ডা নয়। বেশ তাজা রাখে শরীর। একটু একটু ঘুম পাচ্ছে। জানলায় কনুই রেখে, তাতে মাথা রেখে ঘুমুতে চেষ্টা করি। আমার আর ডাক্তারের মাঝখানে শীলা বরঠাকুরের কোট, আমার ব্যাগ। গায়ে শুধু শালটাই যথেষ্ট।

মাইলা গুন্‌গুন্‌ করে একটা নেপালী গানের সুর ভাঁজছে। সেটার ঘুমপাড়ানী এফেক্ট হচ্ছে। এরা কেউ রাত্রে খাবে না? ডিনার-টিনার কিছু করবে না? খিদে-খিদে পাচ্ছে যে?

মাদ্রাজ হোটেল

—"উঠুন মেমসাহেব উঠুন ভালুকপঙ্‌ এসেছে। পারমিট্‌ দেখাতে হবে।"

ব্যাগটা নিয়ে আবার হাত বাড়াই। অন্ধকারে কেউ আমার হাতটা ধরে নেয়। আর ধাপগুলোতে টর্চের আলো ফেলে। আমি নেমে পড়ি। নামতে নামতেই মনে হয়, এত কষ্ট না করে পিছন ফিরে ফিরে নামলেই হয়। ভেতরে ছোট হাতল মতন আছে যা ধরে নামা যায়।

মিলিটারি চেক-পয়েন্টে পারমিট দেখাতে গিয়ে আবিষ্কার করি লম্বু ডাক্তারকে এরা ভালই চেনে।

—'হ্যাল্লো ইয়ার'! 'হাই ডক্টর'! ইত্যাদি হচ্ছে। মিলিটারির ছেলে-গুলোরও বয়েস বেশি নয়। এখানে তাঁবুতে আছে হৈ হৈ করে।

—ডাক্তার, ডিনার খাবেন না?

—আমি এইখানেই খেয়ে নেব। ঐ যে মাদ্রাজী হোটেলে।

সত্যি সত্যিই তো! এই পাণ্ডববর্জিত পার্বত্য অঞ্চলে নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ারের সংকটময় চেক্‌ পয়েন্টে হাফ্‌-ধুতির ওপরে শার্ট ঝুলিয়ে দিব্যি শান্ত, হাসিমুখে ইড্‌লি-দোসার দোকান দিয়েছেন সুদূর দক্ষিণাবর্তের কোনো উদ্যোগী মহাপুরুষ! সামনে Madres Hotel বলে সাইন-

বোর্ড টাঙানো। ভেতরে বেঞ্চি, টেবিল পাতা। ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা আছে, দোসা, ইডলি, কারি, রাইস, লস্যি, কফির দামের তালিকা। দাম মোটেই বেশি নয়। কলকাতার চেয়ে কমই। অথচ এইখানে মালপত্র বয়ে আনা কি সোজা? এখানে দক্ষিণী রান্নাঘরে কাজের লোক রাখা মানেই দক্ষিণ থেকে আমদানি করা—তার ট্রেনভাড়া নেই? বুঝলুম, দক্ষিণেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বাঁধা পড়ে গেছে।

পাশাপাশি বসে আমরা দুজনে একই গরম গরম মশলাদোসা আর একই মাদ্রাজী কফি খেলুম, দারুণ লাগলো! কিন্তু লম্বু ডাক্তার একটাও কথা কইলেনা। যেন আমাকে চেনেই না। জগতের যত লজ্জা সংকোচ আমার সঙ্গে কথা কইবার বেলায় যেন বেয়নেট বাগিয়ে তেড়ে যায় তার দিকে।

নিজের নিজের বিল চুকিয়ে দু'জনে একই সঙ্গে লরিতে নিঃশব্দে ফিরে গেলুম। আবার গাড়ি চললো।

ধন্যি মাদ্রাজ হোটেল! বেশ দু'তিনজন দক্ষিণী পুরুষমানুষকে কর্মব্যস্ত দেখলুম। কেউ রান্না করছে, কেউ পরিবেশন করছে, কেউ হিসেব রাখছে, টাকা গুনছে। আমি না জিজ্ঞেস করেই পারলুম না—আপনারা মাদ্রাজের লোক বুঝি?—যিনি টাকা গুনছেন তাঁকেই প্রশ্ন করেছি। সম্ভবত দোকানের মালিক তিনিই। মিষ্টি হেসে জবাব হল:

—না!

আমি তো অবাক। মাদ্রাজের নন? তবে?

—কেরালার। আমরা ত্রিবান্দ্রামের। এবার অবাক হই না আর।

—তাই বলুন। কেরালার!

কেরালার মানুষরা ঘুরে বেড়াতে জানে। কলকাতা ভর্তি চিরদিনই

কেরালার নার্সে, আর কেরালার টাইপিস্টে। তাঁর পরে তো জার্মানী, ইংলণ্ডেও কেরালার নার্স রপ্তানির খবর কাগজে পড়েছি। ইদানিং কেরালার মানুষে ভরে গিয়েছে গাল্‌ফ কান্ট্রিজ। দুবাই অঞ্চলের চাকরিতে কেরালার পুরুষরা দলে দলে পাড়ি দিচ্ছে—এবং টাকায় টাকায় ছেয়ে যাচ্ছে নাকি কেরালার গাঁ-গঞ্জ। বদলে যাচ্ছে সে-দেশের চেহারা, চরিত্র। দুবাইয়ের তুলনায় উত্তর-পূর্ব ভারত তো নস্যি!

—তবে মাদ্রাজ হোটেল নাম কেন? কেরালা কাফে, কিম্বা ত্রিবান্দ্রম হোটেল নয় কেন?

—ওসব জায়গা লোকে চেনে না। মাদ্রাজ তো বড় শহর। দক্ষিণ বলতে লোকে মাদ্রাজই বোঝে। মোর পপুলার নেম, ইউ সি?

—আই সি।

এটুকু স্পষ্টই দেখতে পেলুম, যে কেরালার উন্নতি অবধারিত। বাংলার অবশ্যম্ভাবী পতন ও মূর্চ্ছায় শত কেরালাকে দেখেও চৈতন্য উদয় হবে না। কেরালা, হাজার হোক, শিক্ষিত তো? ভারতের একমাত্র সাক্ষর প্রদেশ। হবেই তো। ওখানে গ্রামে গ্রামে সরকারী গ্রন্থাগার। সন্ধ্যায় আলো জ্বেলে গ্রামের সাধারণ লোকেরা লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, বই পড়ছে, পত্রিকা পড়ছে নিজের চোখে দেখে এসেছি। আমাদের গ্রাম কেন, শহরেও কি সেটা ঘটে? বরং তার চেয়ে আমরা পরের বাড়িতে গিয়ে টি, ভি,.র সামনে বসে থাকবো।

নিশিরাত, বাঁকাচাঁদ

ভালুকপঙের পরে গাড়ি ছুটলো আবার পাহাড়ী রাস্তায়। পাশ দিয়ে একটা নদীও ছুটছে মনে হচ্ছে। রাত্রি এখন তেমন অন্ধকার নেই। চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয়, কি পাহাড় কি সমুদ্র কি তেপান্তরের মাঠ, এসব যে খুবই মায়াময় দেখায় তা সকলেই জানি। কিন্তু এই পথটুকু যে কতদূর অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য মেখে নিয়েছিল পাহাড়ী চাঁদের আলোতে আমি বোঝাতে পারবো না।

পাহাড়ী চাঁদের একটা আলাদা জাদুই আছে। তার সঙ্গে যদি একদিকে থাকে ঘোরানো পেঁচানো রাস্তা। দ্রুত ধাবমান রাত্রির ট্রাক। আর ঘুমঘুম কিন্তু একাগ্র চোখ। —আর অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে দৌড়োয় অচেনা বন, আর অচেনা ঝর্ণানদীর বাঁক—সবটা মিলিয়ে সে এক অলৌকিক দৃশ্য। পাগল তো করে দিতেই পারে। এমন কি, একজন যুদ্ধক্ষেত্রগামী জেনারেলকেও! কে জানে সেই রাত্রিটা এইরকম ছিল কিনা। চাঁদের সে কি লুকোচুরি, কি ছুটোছুটি। একবার পাহাড়ের চূড়োয়, একবার গাছের ফাঁকে, একবার নদীর কোলে, একবার রাস্তার বাঁকে আকাশের ফাঁকে—যা তা কাণ্ড। ড্রাইভার ভাগ্যিস আমি নই, মানচন্দ্? তাই ট্রাক চলছিল নিজের মনে। চাঁদের ঐ ঘোর "নখ্‌রা" তাকে মনঃচ্যুত করতে পারেনি। ওসব তার ঢের দেখা আছে।

আজকে রাতে দেখবে একটা মজারু

এক জায়গায় এসে গাড়ি থামল। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ। মিস্টার সেন এতক্ষণে অভিমান ভঙ্গ করে কথা বললেন।

—এখানেই নাইটহল্‌ট করা হবে আমাদের।

—অ। তা আমরা শোবো কোথায় ?

—আপনি কোথায় শোবেন, তার ব্যবস্থা আমি কী জানি ?

মিস্টার সেনের গলায় জেনুইন "বিপন্ন বিস্ময়"।

—"না না আমার কথা হচ্ছেনা"। লজ্জা পেয়ে গিয়ে বলি—"আপনারা শোবেন কোথায় ?"

—আমি তো এই লরিতেই শোবো। আমাদের এত মাল রয়েছে না ?

—লরিতে কোথায় শোবেন ?

—কেন, এই সীটে ? আপনারা নেমে চলে গেলে।

—অ। আর মানচন্দ্‌ ? মাইলা ?

—ড্রাইভারও এখানেই শোবে। এই তো পিঠের কাছে একটা বাংক আছে, ওটা খুলে নামিয়ে নেওয়া যায়।

—মাইলা ?

—ওর আত্মীয় আছে ঐ দোকানে। ওইখানেই শোবে।

তর্জনী দিয়ে একটা ঘর দেখিয়ে দেন তিনি। ঘরটি লম্বামতন—দু'তিনটে দরজা আছে। ঘরে বহুৎ লোকজন। হৈ হল্লা করছে।

—দোকানটা কিসের ?

—হোটেল আর কি। সরাইখানা।

—ওখানেই তাহলে থাকা যাবে তো।

—যায়। তবে আপনি পারবেন না। লেডিজদের ব্যবস্থা নেই।

—তাহলে? ডাক্তারবাবু ওখানেই ঘুমোবেন?

—না না, ডাক্তারসাব তো আইবিতে যাচ্ছেন। আইবি-তেই থাকেন ওঁরা।

তাকিয়ে দেখি ডাক্তার গুটি গুটি চলেছে। সেদিকে, অন্ধকারের ভেতরে একটা পাকা একতলা বাড়ি। সামনে গেটওলা বাগানমতন। ভেতরে কিছু জীপ দাঁড়িয়ে আছে। তার ডানদিকে এই ছাউনিঘরে সরাইখানা। বাইরেও কিছু লোকজন। তক্তাপোশে বসে বসে, হাতে বাটি ধরে কী সব খাওয়া দাওয়া করছে। এগুলো রাস্তার বাঁপাশে, রাস্তার ডানপাশে খাদ।

ট্রাকের শব্দ থেমেছে বলে অন্য একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে—খুব কাছেই জলপ্রপাতের গর্জন হচ্ছে।

—আইবিটা কী ব্যাপার?

—আইবি জানেন না? কি আশ্চর্য!

মিস্টার সেনের মুখে ভাষা জোগায় না।

—বিলাতফেরৎ মানুষ, আইবি জানেন না?

—ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ? তাদের সঙ্গে ডাক্তারের কী?

এবার আমি সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। এসব ডেন্‌জারাস এরিয়া। এ ব্যাটা ডাক্তার কিসের স্পাই, কে জানে? হয় তো ঐ জন্যেই কথা-বার্তা বলে না। আইবি-র সঙ্গে যোগাযোগ। আমি এখন কী করি? ওদিকে শুনি মিস্টার সেন বলছেন—

—ইণ্টেলিজেন্স-টেন্স জানিনা ম্যাডাম, আইবি হইল গিয়া ইনিস-পেক্‌শন বাংলো। এই লাইফে ফাস্ট টাইম একজন এডুকেটেড ম্যান্ মীট

করলাম যে জানে না আইবি কী বস্তু!

অত্যন্ত ব্যাজার মুখে, তিতিবিরক্ত হয়ে, কেবল "ছিঃ"-টুকু না বলে, আর থুঃ করে থুথুটা না-ফেলে, সেন মশাই নেমে চলে গেলেন। সরাই-খানার দিকে।

আমি নিচে নেমে দাঁড়িয়েছি, ভাবছি কী করি, মানচন্দ্ ফিরে এল।

—আপ আইবি-মে যাইয়ে মেমসাব। উধরহী জাগা মিল্ যায়েগা।

—তোমরা এখন কী করবে, খাবে?

মানচন্দ্ একটু লাজুক হেসে মাথা চুলকে বলল—"সাফ সাফ বাতা দুংগা সাব? আব তো জরা ড্রিংক কর্না। গাড়ী চল্নেকা টাইমমে এক বুঁদভি নেহি পীউংগা। হম্লোগোঁকো দেওতাকা মনা হ্যায়।—গাড়ীসে উতার্কে রাতমে পীয়ো। ও ঠিক হ্যায়। দিনভর খালি চায় পিউংগা। বস্। হিল্ ড্রাইভিং বহুৎ খতর্নাক্ কাম হ্যায়। পীয়েগা তো জান্ চলা যায়েগা।"

এরই মধ্যে এক ঢোঁক হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে! মানচন্দ্ আবার বলে, —"আপকো বতানে আয়া, কি সুব্বাহ পাঁচ বজে গাড়ী স্টার্ট করেগী। ঠিক ঠিক্ টাইমপে আনা। হম্লোগ ঠাহরেঙ্গে নহঁী। ডাগ্দর সাবকো ভি জরা বতা দেনা জী।"

—"আরে হমেঁ ছোড়্কর্ মত যাও ভাই। ফির্ ক্যায় সে যাউংগী য়হাঁসে?"

—"বহুৎ গাড়ি মিল যায়েগা সাব দিন মে। দিনভর গাড়ী আতা যাতা হ্যায়।"

ওদিক থেকে ডাক্তার লম্বা লম্বা পা ফেলে ফিরে আসছে। আমি সেদিকে এগিয়ে যাই। আমাকে দেখামাত্র সে অ্যাবাউট টার্ণ করে আবার বাংলোর দিকে চলতে সুরু করে দেয়। আমিও যাই। আমাকে যেতেই হবে। বাংলোয় একটা ঘর ঠিক করতে হবে তো। ডাক্তার এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলে। এই প্রথম সে নিজে থেকে আমার সঙ্গে কথা বলছে।

—চৌকিদারকে ডেকে সাড়া পাচ্ছি না। বাংলোতে লোক আছে।

—চৌকিদারকে খোঁজা যাক, চলুন। ও থাকে কোথায়?

—এই তো পেছনদিকে।

পেছন দিকে কয়েকটা ছোট পাকাঘর।

—চৌকিদার! চৌকিদার! দুজনে মিলে চেঁচাই। দরজায় ধাক্কাও দিতে থাকি।

একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে। পাহাড়ী মেয়ে।

—চৌকিদার নেই।

—কোথায় গেছে সে?

—ওই যে, চটিতে।

—চলুন ডাক্তারবাবু, চটিতে যাই!

—চটীতে গিয়ে কি পাওয়া যাবে ওকে?

—বলছে, ওখানে রয়েছে, পাওয়া যাবে না কেন? ওর ডিউটি নেই বাংলোয়? চলুন চলুন ডেকে আনি।

ডাক্তারের বড্ড তুলতুলে নরম স্বভাব দেখছি। চটিতে গিয়ে বাইরে লাজুক লাজুক ভাবে ঘোরাঘুরি করে। শেষে আমিই চেঁচাই।

—চৌকিদার হ্যায়? আইবিকা চৌকিদার হ্যায়? আইবিকা চৌকিদার?

—জী হজৌর।

এক মিনিটেই হাজির হয় একটি মানুষ। সেলাম সমেত। ভালকরে দেখে বলে—

—ও, ডাগ্‌দর সাব?

একটু যেন মিইয়ে যায় অ্যাটেনশনটা।

—চটিতে যান। দেখুন যদি কিছু হয়।

—মানে?

—ঘর সব ফুল্। দেখছেন কত জীপ এসেছে? এম. এল. এ. এসেছেন এখানকার! তাঁর পার্টি নিয়ে।

—একটাও ঘর নেই?

—একটাও না।

—সব ফুল্?

—স-ব ফুল্।

—কী হবে তাহলে?

—ঐ তো বললাম। চটিতে দেখুন। নিশ্চয় জায়গা হয়ে যাবে।

ডাক্তার ভাবিত হয়।

চুপ করে যায়।

এবার আমার পালা।

আমি বলি,—বসবার ঘরটা তো খালি?

—বসবার ঘর? চৌকিদার অবাক হয়ে তাকায়।—হ্যাঁ, সেটা খালি।

—ঠিক আছে। ওটা আমাকে খুলে দাও।

—ওটা ? ওখানে তো কাউকে—

—নইলে এম এল এ কে ডেকে দাও, কথা বলছি। একটা ঘর ছেড়ে দিক।

—ডাকব ? কিন্তু মেমসাব, এম এল এ সাব যে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন ! এখন ডাকব কেমন করে ? তার চেয়ে চলুন বসার ঘরটাই—

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলেই হবে—

—কিন্তু খাট-বিছানা নেই—

—না থাক। চেয়ার টেবিলে তো আছে। সোফা কৌচ ?

—তা আছে।

—চল, দেখি কেমন ঘর। চলুন ডাক্তারবাবু। আপ্‌ভি আইয়ে।

ঘর খুব বড় নয় তবে ছোটও হয়। বরং বড়ই। আধখানাতে বৈঠকখানা আর আধখানাতে একটা বিরাট ডাইনিং টেবিল পাতা, অনেক চেয়ার ঘেরা। বৈঠকখানাতে বেতের চেয়ার, বেতের সোফা। সেই সোফায় শোওয়া সম্ভব নয়। দুটি সীট, যেন দুটি ইঁদারার মতো বসে গেছে। হঠাৎ মাথায় এল একটা বদ্ খেয়াল।

—চৌকিদার, চলো তো মেরে সাথ্।

—কিধার মেমসাব ?

—আও তো জরা। চটি-মে যানা।

চটির বাইরে কয়েকটা তক্তাপোশ। কিছু মাতাল সেইসব তক্তাপোশে বসে মদ খাচ্ছে। ভাতও খেয়েছে মনে হয়, বাটি পড়ে রয়েছে। আমি গম্ভীর ভাবে বললুম—আপ লোগ মেহেরবানী কর কে এ-তক্তাসে উতার যাইয়ে। এ-তক্তা আই-বি-মে লাগেগা। কটোরা-উটোরা হটাইয়ে জল্‌দি !

তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে মাতালেরা কটোরা ঘরে রেখে এল। এবং তিনজন মাতাল আর একজন চৌকিদার তাড়াতাড়ি একটি তক্তা-পোশ মাথায় করে আই-বি তে নিয়ে যেতে লাগলো। আমি গম্ভীর ভাবে তাদের আগে আগে গিয়ে তক্তাটি বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখতে সাহায্য করলুম। এতটা সহজে হবে আমিও ভাবিনি! লম্বু ডাক্তার এই তক্তা-পোশ ট্রান্সফার অপারেশন পর্ব দূরে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করছে। মাতালেরা তক্তাপোশ রেখে দিয়েই চটিতে ফিরে গেল। কোনো বক-শিসের পরওয়া করে না এরা, স্বাধীন জাতি। চৌকিদার বলল—বিস্তারা? মেমসাব? আমি তো অবাক। বিছানাও জুটবে নাকি? গম্ভীর ভাবে বলি—হাঁ, লাও। ডবল ব্ল্যাংকেট, ডবল শীট, ডবল পিলো। গদ্দা হ্যায়?

—জী, গদ্দা তো নহী? ঔর দো ব্ল্যাংকিট দে দুঙ্গা।

মুহূর্তের মধ্যে "দুগ্ধফেননিভ শয্যা" যাকে বলে, তাই তৈরি হয়ে গেল। —"দু'রূপাইয়া, বেডিং চার্জ।"

পাঁচটা টাকা হাতে দিয়ে বলি—বহুৎ সুকরিয়া। থ্যাংকিউ। অব্ অ্যায়সা করো থোড়া চায় তো পিলা দো? ঔর এক লালটিন রাখ্ দো ঘরমেঁ।

ডাক্তার এবার বলল—

—চটি মে জাগা মিলেগা? চৌকিদার?

—আপা বোলনেসে কিঁউ নেহি মিলেগা? এবার আমার একটু মায়া হয়। নাঃ। ওকে একটু সাহায্য করা উচিত।

—ওই অতবড় টেবিলটা আছে তো। ওতেই আপনি শুয়ে পড়ুন না? ওর কাছে কি আরও বেডিং নেই?

—বেডিং তো আমার সঙ্গেই আছে।

—কোথায়?

—ট্রাকে।

—সেইটে নিয়ে এসে, শুয়ে পড়ুন।

—এই ঘরে ?

—আবার ঘর পাচ্ছেন কোথায় ?

—কিন্তু—মানে এই ঘরেই ?

—তাতে হয়েছেটা কী ? আপনিতো তিনবছর আগে ডাক্তার হয়েছেন, আমি তেরো বছর আগে ডাক্তার হয়েছি। আপনার বাপের বয়িসী আমি, বুঝেছেন ?

—আপনিও ডাক্তার ? কি আশ্চর্য। এতক্ষণ বলেননি ?

আমিও ডাক্তার, কিন্তু মেডিক্যাল ডাক্তার নই। তবে আমাকে ডক্টর সেন বলতে দোষ নেই। নিন, এবার বেডিংটা আনুন। ভয়ের কিছু নেই। আপনারই বয়িসী আমার বড় বড় দুটো মেয়ে আছে। (একটার তখন ১৩, একটার ৯ !)

—না না ভয়ের কি আছে ? ভয় কে পেয়েছে ! ডাক্তার একটু বাদে বেডিং নিয়ে এসে টেবিলের ওপরে রাখলো। কিন্তু পাতলো না। বসেই রইলো। চৌকিদার বলল—স্টোভ ধরাই ! চা খাবেন ক'জন ?

ডাক্তার বলল, আমিও খাব।

চৌকিদারের কাছে বলতে, বাথরুমও যোগাড় হয়ে গেল। ঐ এম এল এ দের একটি বাথরুমে বাইরে দিক থেকেও ঢোকা যায়। চৌকিদার আমার জন্য সেটা খুলে, আলো দিয়ে দিল। কোনো অসুবিধেই নেই।

যতক্ষণ চা হচ্ছে, ততক্ষণের জন্যে আমি একটু হাঁটতে গেলুম বাইরে। সেই ঝর্ণার শব্দটা এখন কানমন ভরে ফেলছে। বেশ চাঁদের আলো ফুটফুটে। পথ ফাঁকা। কেউ নেই। পাহাড়ের গায়ে গাছগুলো স্থির হয়ে চাঁদের আদর খাচ্ছে। নদীর ধার দিয়ে আওয়াজ লক্ষ্য করে হাঁটতে

থাকি। বুনোফুলের গন্ধে পথ ভরা। জ্যোৎস্নায় সব ফুলেরই রং অবশ্য শাদা—পাহাড়ী নদীটা অনেক নীচে। শব্দটা আরো দূরে। গাছের পাতায় নানারকমের অচেনা পোকামাকড়, কত ধরনের শব্দ করছে। চটির মৃদু হৈচৈও এখানে শোনা যাচ্ছেনা—শুধু ঝর্ণার শব্দ, আর পতঙ্গের ধ্বনি। কী অদ্ভুত শান্ত পরিবেশ। হাঁটতে খুব ভাল লাগছে। আর আমার পায়ের শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতেও। একটা বাঁক ঘুরে এক মিনিট নদীর ধারে দাঁড়াই। নদীটা দেখতে ঝুঁকে পড়ি। তারপরেই—বুক ধড়াস্! তারপরেই, ভয়ে হাত পা জমে বরফ। আমি তো হাঁটছিনা, তবে আমার হাঁটার শব্দের প্রতিধ্বনি ওঠে কেমন করে? ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি? পরক্ষণেই আরো একটা ভয়ের ঝাপটা এসে লাগে। ভূতুড়ে কেন হবে? নিশ্চয় আর কেউ। আর কেউ। আর কেউ। এই নির্জন পাহাড়ে, নদীর ধারে রাত সাড়ে বারোটা বাজে—কে যেন কাশে। হ্যাঁ। স্পষ্ট। আবার কাশি।

—হু ইজ দেয়ার?

হঠাৎ গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠি। কোন্ হ্যায়?

—লালওয়ানী। —লম্বুডাক্তার এসে দাঁড়াল। খুব উত্তেজিত, কোনো কারণে। হাঁপাচ্ছে।

—আর ইউ ম্যাড? ক্রেজী? নিউরটিক?

—কেন?

—এত রাত্রে, এই নির্জনে, এভাবে কেউ হাঁটে? ওফ্! কী ডেনজারাস লেডি! চলুন। আইবিতে চলুন। ওখানেই বাথরুম আছে।

—বাথরুম তো আছেই। বাথরুম দিয়ে কী হবে?

—তবে কীজন্য এদিকে আসছিলেন?

—এমনি। বেড়াতে। ঐ যে ঝর্ণার শব্দটা ওটা আবিষ্কার করতে। চা কি হয়ে গেছে ?

—কে জানে চা হয়েছে কিনা। আমি তো আপনাকেই ফলো করছি দূরে দূরে, নট নোয়িং দ্য পারপাস অফ ইয়োর ওয়াক। ঝর্ণার শব্দ! ওটা তো দু' মাইল দূরে। ইউ আর সার্টেনলি আ ক্রেজী লেডি! মাই গড্!

ক্রেজী শব্দটার সঙ্গে লেডি শব্দটি এমন পাশাপাশি কখনও দেখিনি বা শুনিনি। বেশ মানিয়েছে দুজনকে। ক্রেজী লেডি। মিসেস গান্ধীকে অবশ্য বছরখানেক আগে, ইমারজেন্সির সময়ে একথা বলতে পারত। আমাকে নয়। আমি ক্রেজী নই, লেডি তো নইই।

—কাম, লেট্স গো ব্যাক—বলেই বিশাল এক হাঁচি দিল লম্বু।

—আপনার সোয়েটার নেই ? বেশ ঠাণ্ডা। খালি শার্ট পরে এলেন কেন।

—সোয়েটার পরবার সময় ছিল কি ? অত রাত্রে আপনি একা একা···আমি তো ভয়ে ভয়েই তক্ষুনি পেছন পেছন—হাঁচ্চো!

—কী লজ্জা! এই নিন, আমার শালটা খুব লম্বা আছে, আদ্ধেকটা আপনি জড়িয়ে নিন। সবটা দেব না, আমারও ঠাণ্ডা লাগানো চলবে না।

—না না না না আপনার শাল আমি জড়াব কি! চলুন বরং দৌড়ে দৌড়ে চলুন—তাহলে শীত করবে না—দৌড়ে দৌড়ে আই-বিতে ফিরে দেখি চৌকিদার চা ঢাকা দিয়ে রেখে চলে গেছে। মাথার কাছে লণ্ঠন। আমরা চা খেতে খেতেই সে কোত্থেকে উদয় হল আবার।

কাল সকাল ৫টায় আপনাদের ট্রাক ছেড়ে দেবে। ড্রাইভার বলেছে তুলে দিতে।—দেবো কি ?

—অতি অবশ্যই তুলে দেবে। ৪॥ টেয়। আর প্লীজ, এক কাপ করে চা-ও দিও! কেমন?

—জরুর। জরুর। গুডনাইট সার্। গেলাশ নিয়ে চলে যায় চৌকিদার।

—শুয়ে পড়ুন ডাক্তার লালওয়ানী। গুডনাইট।—আমি শুয়ে পড়ি।

—গুড নাইট। লম্বু টেবিলের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে।

শুলুম বটে। কিন্তু শুয়ে স্বস্তি হচ্ছে কই?

—আপনি শোবেন না? ডাক্তার?

—এই শোবো। —টেবিল থেকে পা দুলতেই থাকে। লণ্ঠনের আলোয় দেয়ালে নানারকম ছায়া কাঁপে। বড় হয়, ছোট হয়। বাইরে ঝর্ণার শব্দ। জংলী পোকার ডাক। ঘরের মধ্য একটি যুবক নিদ্রাহারা।

—যাচ্চলে। বড্ড অস্বস্তি করলে তো? এবারে উঠে বসি। বসতে বসতেই চোখ ছাদের দিকে যায়। এবং, হঠাৎ দেখি, আরে? আধখানা ঘর ভাগ করেছে পর্দা টানার তারে! তার নয়, ডাণ্ডা। দেয়াল ঘেঁষে ঝুলছে ভারী পর্দা। এতক্ষণ উত্তেজনায় লক্ষ্য করিনি, ঘরটিকে ড্রয়িং ও ডাইনিং দুভাবে ভাগ করার ব্যবস্থা আছে। বাস। লেডিজ আর জেণ্ট্স দুটো ওয়েটিংরুম হয়ে যাক বেশ! আমি চিরকালই খেলতে ভালবাসি। হে ভগবান, তুমি আছো। তুমি আজ বেচারী লালওয়ানীর সতীত্বরক্ষার ব্যবস্থা করলে। জয় জয়।—

আস্তে আস্তে ডাকি—আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই—

—ডাক্তার! ওই ছাখো, কী জিনিস! দেখেছো?

পর্দা। কার্টেন্স!

—হুঁ হুঁ! বাববা! দারুণ! এবার ঐ পর্দা টেনে দিয়ে শুয়ে পড়ো

দিকিনি, লক্ষ্মী ছেলে।

বাস দুজনের দুটো ঘর হয়ে গেল বেশ ?

আগেরকালের জাপানে নাকি এটাই চালু ছিল শুনেছিলুম, এমনি করেই কাগজের পর্দা টেনে ঘর ভাগাভাগি হতো। দেয়াল ছিল না।

পর্দা দেখে ডাক্তারের সে কী সরল আহ্লাদ। লাফিয়ে নামল। মুহূর্তের মধ্যে ঘর ভাগাভাগি করে নিজেকে অদৃশ্য করে ফেললে। করলে কি হবে পর্দার তলা দিয়ে হাঁটু থেকে জুতোমোজা পর্যন্ত দেখা যেতে লাগলো। ড্যাডি লং লেগস বোধহয় হেডিং খুলছে। পর্দা টেনেও দেয়ালে নানাবিধ প্রেতছায়া নাচছে। মেঝের লণ্ঠনটার শীশ আরো কমিয়ে দিলুম। নাচও একটু কমলো দেয়ালে। এবার নিদ্রা।

—গুডনাইট ডক্টর! টাক্ ইওর সেলফ ইন নাউ! বলতে বলতে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলুম—কই ? শুলোনা তো ? ওই ছাখো আবার টেবিলেই উঠে বসেছে। পর্দানশীন ডাক্তারের বুটজোড়াটি দুলে দুলে সারা। যাকগে, যা খুশি করুক গে।

মানুষের কত চাই ?

মাথার ওপরে ছাদের ব্যবস্থা ছিলনা, ছাদ হলো। ঘর হলো। খাট ছিলনা, খাট হল। আব্রু ছিলনা। আব্রু পর্যন্ত হলো। এখনও শান্তি নেই ? আরও কী চাই তার ? আমি এঘর থেকে চলে না গেলে বুঝি তার স্বস্তি নেই ? কিন্তু সেটা তো হবার নয়। —রাগ হয়ে গেল এবারে।

—ডাক্তার ?

—ইয়েস ম্যাডাম ?

—শুয়ে পড়ছোনা কেন ?

—

—শোবে না ?

— .....

—লুক হিয়ার। আই হ্যাভ নো ঈভিল ডিজাইনস্ অন ইউ। হোয়াট ফ্রাইটেনস্ ইউ সো ? টেল্ মি !

—আরে—না, না, না,—ওঃ ! কী মুশকিল ! কী যে বলেন, সত্যি ! ইউ আর আ ক্রেজী লেডি ! ট্রুলি, ডিয়ার গড্ ! দ্য থিংস ইউ স্যে ! ওঃ—

ডাক্তার লজ্জা পেয়ে গড়গড় করে কথা বলে গেলো। কিন্তু শুয়ে পড়লো না।

[আমি ক্রেজীও নই আমি লেডিও নই। তুমিই ক্রেজী, তুমিই লেডি। নইলে কেউ খাটবিছানা পেয়েও শোয়না ? ঘরে অন্য লোক আছে বলে লজ্জা পায় ? যতই জাঁদরেল হই, মেয়েই তো ? তুমি সারারাত জেগে বসে থাকলে বরং আমি তোমার যতটা ক্ষতি করতে সক্ষম হবো, তুমি ঘুমোলে কি ততটা করতে পারবো ? ঘুমোনোই তো বেশি সেফ্। বুদ্ধু !]

মুখে বলিঃ—"ডোণ্ট ওয়ারি ডক্টর, প্লিজ রিল্যাক্স, আই প্রমিস ইউ কম্প্লিট মর‍্যাল অ্যাণ্ড ফিজিকাল সেফ্টি—"

[হাহাহাহাহাহাহাহা বালকের দল, মার কোলে যাও চলে নাই ভয় !]

—"এভরিথিং উইল বি ও. কে। জাস্ট ইউ রিল্যাক্স প্লীজ ! ট্রাই টু শ্লীপ। ডক্টর ? আর ইউ লিসেনিং ? গুড নাইট।"

[দয়া করে শুয়ে পড়্ বাছা, নইলে যে এবার আমারই ভয় করছে ! পাগলটাগল নয় তো ? পাগলের সঙ্গে এর ঘরে রাত কাটানোর ভয় ঢুকেছে প্রাণে—নইলে এত লজ্জা কিসের ? এটা তো বাসরঘর নয় ! ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। যা হয় হবে। জয় জয়। গুড নাইট, ড্যাডি লং লেগস।]

"—চায়, মেমসাব !"

মাথার কাছে চৌকিদারের হাঁকে ঘুম ভাঙলো।

—"গুড মরনিং, মেমসাব।"

—"গুড মরনিং। চৌকিদার। থ্যাংকিউ।"

—"ট্রাক রেডি হো গিয়া।"

—"এ বেডিং লে যাও।" ওদিক থেকে হঠাৎ ডাক্তার বলে। পর্দার ওপাশে ড্যাডি লং লেগ্‌স পা দোলাচ্ছে। কী রে বাবা? শোয়নি নাকি? এর মধ্যেই উঠে পড়ে বিছানা বেঁধে রেডি? নাকি বিছানা পাতেইনি মোটে? আহা রে।— "হায়! ভীরু কপোতী আমার!" বলে এক্ষুনি ওকে "বক্ষে টানিয়া লওয়া" উচিত হয় আমার। দস্যু মোহন স্টাইলে। ও রকম কিছুই তো সে ভাবছে আমাকে। আমার উপস্থিতিতে বেচারীর 'প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ' উপস্থিত হয়েছে। অবিশ্যি এতে আমার আহ্লাদই হচ্ছে বেশ। আমার মতো এই নিরীহ প্রাণীর অস্তিত্বও যে কারুর পক্ষে এত ভয়াবহ হতে পারে আগে টের পাইনি। আমার মস্ত দুঃখ প্রত্যেকটা বন্ধু তাদের স্বামীদের আমার হাতে অর্পণ করে দিব্যি নিশ্চিন্ত থাকে এমনই আমি নিরামিষ মনুষ্য। কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করে না।

যা হোক, গলা ছেড়ে—"হম্ তুম্···এক কম্‌রেমে বন্দ হো—ঔর চাবী খো জায়ে···" গেয়ে ওঠবার প্রবল বাসনাকে অতি কষ্টে দমন করে বললুম—

—"গুড মরনিং ডক্টর। ডিড ইয়ু স্লীপ ওয়েল ?"

—"ইয়েস, থ্যাংকিউ।"

—"ওয়াণ্ট সাম টী ?"

—"ইয়েস, থ্যাংকিউ।"

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে দেখি ব্রিলক্রিম-ট্রিম মেখে চুল পাট পাট করে ডাক্তার রেডি। গায়ে সবুজ সোয়েটার। চা খেতে খেতে ডাক্তারই আই-বি র খাতায় সই করলে। ফলে আমি আর সই করতে পেলুম না। কেননা একেই ঘরটা ঠিক অর্থে 'ঘর' নয় তাছাড়া একটাই ঘর দুজনকে দেওয়া আইনসিদ্ধ নয়। চৌকিদার যে অসহায় অবলাপ্রাণীদের উদ্ধার করছিল সেটা সরকার বুঝবে না। খাতায় এখন দেখলুম, এই জায়গাটার নাম হলো ঃ "জামীরী"। এতক্ষণে।

—"মাত্র আড়াই টাকা ভাড়া ?" আমি অবাক!

—"একা বলেই আড়াই টাকা," চৌকিদার সখেদে জানালো—"ম্যারেড হলে দেড় টাকা লাগত। আনম্যারেডদের বেশি ভাড়া।" যাবার সময়ে ওকে আবার দুটো টাকা দিতেই এবার চৌকিদারই অবাক। তার হঠাৎ-খুশির হাসিই বলে দিল জামীরী টুরিস্টে অভ্যস্ত নয়। সরকারী কর্মচারী আর কণ্ট্রাক্টররাই যাতায়াত করেন, বিশেষ বকশিস দেবার দরকার হয় না তাঁদের। এসব জায়গার চৌকিদার অন্যান্য টুরিস্ট ডাক-বাংলার চৌকিদারদের চেয়ে ভিন্নগোত্রের।

আধ-ফোটা ভোরের জামীরী আশ্চর্য সুন্দর। খাদের মধ্যে নদীটা খুব স্রোতস্বিনী, চারিদিকে হেমন্তের রঙিন গাছপালা, আর কত যে ঝর্ণা! ছোট্ট ছোট্ট ঝর্ণায় পাহাড় ভর্তি। ঠিক দার্জিলিঙের পথে আগে আগে

যেমন দেখেছি ছেলেবয়সে। গুণে শেষই করা যেতনা, এত ঝর্ণা।

মাঝে মাঝে পাহাড়ী বস্তি—বাচ্চাগুলো ভারি মিষ্টি দেখতে। আর বেড়ালগুলো সবাই ছাইরঙের, আর খুবই মোটকা।

মানচন্দ্ যে রাত্রে শরাব পিয়া, এখন তার বিন্দুমাত্রও চিহ্ন নেই। ফের ধূপ কাঠি জ্বেলেছে। ফিটফাট্ সববাই। মাইলা মানচন্দ্ সুপ্রভাত জানাতে মিষ্টি হাসলো। মিস্টার সেনের আজ একটুও নেশা নেই। হেসে বললেন —"গুড মরনিং, মিসেস সেন। গুড মরনিং ডক্টর সাব।"

পাহাড়ী ভোরের তুলনা হয় না। বেশ ঠাণ্ডা। শালে কুলোয়নি, হাতকাটা সোয়েটারটাও পরেছি। যা দেখছি চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। এত সুন্দর বনপথ, আমি আগে ভারতবর্ষের কোনো পার্বত্য অঞ্চলে দেখিনি। দীর্ঘ গাছগুলোর গা জড়িয়ে বিশাল বিশাল পাতাওয়ালা লতা উঠেছে, কত রকমের ফুল ফুটে আছে এই কার্তিক মাসে, তার ঠিক নেই। 'কামেঙ' নামের নদীটা সমানেই পথের পাশ দিয়ে ছুটছে। কেন যেন প্রায় সব পাহাড়ী রাস্তার পাশ দিয়েই একটা না একটা নদী ছোটে? বড় হয়ে ছাত্র বয়সে রকি মাউন্টেনে কলোরাডো নদীর খাদ ধরে নদীর পাশ দিয়ে গাড়িতে যেতে যেতে ছেলেবেলায় আবিষ্কৃত এই অত্যন্ত অরিজিনাল বিস্ময়কর তথ্যটি অমর্ত্যকে বলতেই তিনি বেচারী লজ্জা রাখবার পথ পান না। "সেকি, তুমি কি জানতেনা, যে নদীগুলোই পাহাড় কেটে কেটে উপত্যকা বানায়? তাই নদীর তৈরি করা খাঁজ দিয়ে দিয়েই মানুষ পথ করে নেয়? নদীর গা ঘেঁষেই রাস্তা ছোটে, রাস্তার গা ঘেঁষে নদী ছোটেনা!"

তখন থেকে জ্ঞান হয়েছে। তাবলে কিন্তু ছোট বেলার ভুল দৃষ্টিটা বদলায় নি। সেই যে, বাল্যকালে, বাবামার সঙ্গে ইণ্টারলাকেনে যাবার

পথে আল্‌পসের গায়ে অপূর্ব একটা দুধ-ধবধবে দুর্ধর্ষ নদীকে লাফাতে লাফাতে রেল গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়োতে দেখেছিলুম। সেই থেকে এই ধারণাটা বদ্ধমূল যে নদীরাই রাস্তার সঙ্গে দৌড় পাল্লা দেয়। আমি যেহেতু রাস্তাটাকে দেখতে পাচ্ছিনা, তাই ওটাকেই ধরে নিচ্ছি মূল বলে। এই সমগ্র উপত্যকার নামই কামেঙ উপত্যকা। কামেঙই এই অঞ্চলের প্রাণধারা। কামেঙ নদীই আমাকে তুলে নিয়ে এল তাওয়াং পর্যন্ত।

জামীরী থেকে দেদ্‌জা। ছোট জায়গা। সেখানে একটা পাহাড়ী বস্তিতে নেমে চা খেলুম। সেখান থেকে টেঙ্গা। টেঙ্গা আরেকটু বড় জায়গা। সেখানে খেলুম ব্রেকফাস্ট। চা, টোস্ট। ওরা ডিম খেল। রাস্তাও কেবলই আরো সুন্দর হয়ে উঠছে, পাহাড়ও তাই। এবং ট্রাক থেকে পিছন ফিরে নামতে আমার কারুর করুণা হস্তের প্রয়োজন হচ্ছে না। উঠতে অবশ্য এখনও একটু সাহায্য লাগে। নতুবা ট্রাকবিহারে দিব্যি এক্সপার্টিজ লাভ করে ফেলেছি।

টেঙ্গায় ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে, মিস্টার সেন বললেন, "বম্‌ডিলাতে কোথায় থাকবেন আপনি? ডাক্তারের নাহয় হাসপাতাল, কি মেডিক্যাল সেণ্টার, নানান জায়গা আছে। ওরা তো কামেঙের মেডিক্যাল সার্ভিসের লোক। কিন্তু আপনি থাকবেন কোথায় এই তিনদিন?"

—"তিনদিন? মানে?"

—"আমরা তো বমডিলার আশেপাশেই এখন থাকবো তিনদিন। তারপর রওনা হবো তাওয়াং। এখানেই কাজ আছে আমাদের পয়লা পর্যন্ত।"

—"সেকি কথা ? ডাক্তারও থাকবে ? বম্‌ডিলায় ?"

—"আমি কী জানি ? আপনি জানেন না তার প্ল্যান কী ? আপনারই বা কী প্ল্যান ?"

'প্ল্যান' এই শব্দটিকে আমি খুবই মান্য করি। খুব সম্ভ্রম করি। কিন্তু হায় আমার জীবনে তার ঠাঁই প্রায় নেই বললেই চলে।

—"আমার আবার কী প্ল্যান ? যত তাড়াতাড়ি পারি তাওয়াং যাবো। বম্‌ডিলায় থামবার ইচ্ছে নেই। থেমে কী হবে ? থাকবোই বা কোথায় ?"

—"সে দরকার হলে, আমিও ব্যবস্থা করে দিতে পারি। অনেক বাঙালী ভদ্রলোক আছেন বম্‌ডিলাতে সপরিবারে। তাছাড়া বাংলোও আছে। হোটেল টোটেলও আছে নিশ্চয়।"

—"না না, আমি তাওয়াং চলে যাবো।"

—"কিসে করে যাবেন ? আমরা তো যাচ্ছি না।"

—"ও—হো !"

—"সেটাই বলছি।"

—"ডাক্তার ?"

—"ইয়েস ম্যাডাম ?"

—"এরা এখন তিনদিনে বম্‌ডিলাতে থাকবে ! জানতে কি তুমি ?"

—"তাই নাকি ? কি মুশকিল। জানতুম না তো ? আমি তো শুনেছিলুম তাওয়াং যাচ্ছে।"

—"কী করবে তাহলে ?"

—"দেখি। অন্য একটা ট্রাক ধরতে হবে। বম্‌ডিলা-তে নিশ্চয় অন্য ট্রাক মিলে যাবে। নইলে কারুর জীপ। কিংবা লোকাল বাসও অনেক সময়ে পাওয়া যায়। চলে যাওয়া যাবে।"

—"ও ডাক্তার! আমিও তোমার সঙ্গে যাব কিন্তু।" ডাক্তার কোনো উত্তর দিল না।

বলেই বুঝেছি এটা বলা ভুল হলো। এইবার ডাক্তারের ভয় ধরে যাবে। সর্বনাশ করেছি!

"—ডাক্তার, আমি তোমার চেয়ে কুড়ি বছরের সিনিয়র। তোমার বাপের বয়িসী। আমাকে মিছিমিছি তুমি ভয় পেও না—[আমি আছি গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে···]"

—"ও নলি টোয়েন্টি? নট টু হাণ্ড্রেড?"

একটা বোমা পড়বার মতন কথা বলে ফেলল ডাক্তার।

কী ভেবে বলল?

বিরক্ত হয়েই বলল, সন্দেহ নেই।

ভাল করে ওর দিকে তাকিয়ে দেখি মুখে অল্প অল্প হাসির চিহ্ন।

বিরক্তি বলে মনে হচ্ছে না। ডাক্তার আবার মুখ খুল্‌ল ঃ

—ইউ কাণ্ট বি ওলডার দ্যান মাই এলডেস্ট সিস্টার। মাই ফাদার ইজ সেভেনটি টু।

—ওই একই হল। যাঁহা বাহান্ন।—মোটকথা, আয়াম নট টোয়েন্টি সিক্স লাইক ইউ। ডোণ্ট বি টু শাই, তাহলে দুজনেরই খুব অসুবিধা হবে।

—নট টু ওয়ারি, মিসেস সেন। উই'ল ফাইন্‌ড আওয়ার ওয়ে টু তাওয়াং।

বম্‌ডিলাতে নেমে গেলুম মানচন্দের ট্রাক থেকে। মিস্টার সেন হচ্ছেন ট্রাকের ঐ র‍্যাশনগুলির ইন্‌চার্জ। ট্রাকের সঙ্গে সঙ্গে মাল নিয়ে দোকানে বিলি করা তাঁর কাজ, এবং হিশেব রাখা। মানচন্দ্‌কে জিজ্ঞেস

করি—"ভাড়া কত দিতে হবে ?"—"ভাড়া ?" মাইলা হাসে। মানচন্দ্‌ও হাসে।—"কিছু দিতে হবে না। এটা কি বাস ? না রেল গাড়ি ?" মিস্টার সেন বলেন।—"আপনাকে লিফ্‌ট দিলাম। এ গাড়ির ভাড়া তো দিচ্ছে আমাদের কোম্পানী। যদি বকশিস কিছু দিতে চান তবে দ্যান ড্রাইভার-ক্লীনারকে। সেটা আপনার খুশি।"

ডাক্তার কুড়ি টাকা দিল।

দেখাদেখি আমিও।

মানচন্দ্‌, মাইলা, ওতেই খুব খুশি।

—"গুডবাই মানচন্দ্‌ ফির্‌ মিলেঙ্গে। থ্যাংকিউ মাইলা। বাই বাই। চলি তাহলে মিস্টার সেন। খুব ভালো লাগলো।"

—"আমারও খুব ভালো লাগলো। যান, ঐদিকে যান, ঐখানটায় সব ট্রাক এসে দাঁড়ায়। তাওয়াংয়ের লিফ্‌ট ঠিক মিলে যাবে।"

ফিকর্‌ নট

সত্যিই, মিলে গেল।

আরেকটা র‍্যাশনট্রাক। এখানে ট্রাক ভর্তি গাদা গাদা কিছু নেই। অল্প কিছু মালপত্র কয়েকটা বস্তায় রয়েছে। ড্রাইভারের নাম ঘনশ্যাম ছেত্রী, অল্পবয়সী নেপালী ছেলে! সে ছাড়া আরও দুটি ছেলে আছে, কিন্তু তারা গাড়ির ভিতরে রইল না, খোলা লরীতে চড়তেই তাদের বেশি ভাল লাগে। ভেতরে কেবল ডাক্তার, ড্রাইভার আর আমি। ড্রাইভার খুব ফুর্তিবাজ ছেলে, মানচন্দের মতো গুরুগম্ভীর নয়। আমার ধারণা ছিল ট্রাকড্রাইভার মাত্রেই মোদো মাতাল, ভয়ঙ্কর মদ খেয়ে গাড়ি

ছোটায়। অথচ মানচন্দ্ বলল হিল্ ড্রাইভিং-এর ট্রাডিশন অন্য! স্টিয়ারিংয়ে থাকার সময় মদ স্পর্শও করে না ওরা। দেবীর অভিশাপ লাগে।

ঘনশ্যামকে জিজ্ঞেস করলুম—"তুমি মদ খাও ?"

ঘনশ্যাম মাথা চুলকে বলল—"জরুর, মেমসাব!"

—"এখন খেয়েছ ?"—অমনি জিব কেটে ফেললে।

—"দিনমে কভী নেহী মেমসাব! নাইট হল্ট কা টাইম মে। ডিউটিপর পীনে সে পাপ লাগতা ড্রাইভার কো।"

অতএব কি জাঠ, কি নেপালী, হিল ড্রাইভিংয়ের একই ধর্ম। মদ ছুঁলে স্টিয়ারিং ছুঁতে পারবে না।

তা পথও তো তেমনি।

একের পর এক হেয়ারপিন বেন্ড।

চুলের কাঁটার মাথাটা যেমন গোল, পাহাড়ের গায়ে রাস্তা ঠিক সেই-ভাবে বোঁ করে ঘুরে যাচ্ছে। আর সারাটা পথ ভর্তি নানারকমের নোটিস সাঁটা। সমস্ত নোটিসই মনে হচ্ছে আর্মির ড্রাইভারদের জন্যে। কি জানি, তারা সিবিলিয়ান ড্রাইভারদের ধর্মে দীক্ষিত নাও হতে পারে। বেশির ভাগ সাইনবোর্ডেই প্রথমে লেখা—FIKAR NOT, তারপরে নানারকম উপদেশ। Better late than never! Someone is waiting for you,—সবচেয়ে আমার মনের মতন হলো এইটে ঃ What's the hurry, when passing from hills to heaven ? আরো বহু উপদেশামৃত—Look for a tiger at every turn! বা Accident to you, misery to others, smile and drive, Live and let live! Be soft to my curves! রাস্তার ধারে ধারে মাঝে মাঝে আর্মির ক্যাম্প আসছে।

সেখানে নোটিস মারা—THEIRO! M. P. KO REPORT KARO! এবার টের পেলুম রোমান হরফে হিন্দি লেখা কী বস্তু! FIKAR NOT মানে তবে ফিকর্ মৎ, Not to worry-র হিংরিজি (বা ইন্দি) ?

দিরাং বস্তিতে পৌঁছে চা খেলুম। বিশাল, প্রবল দিরাং নদীর ওপরে মস্ত বড় ক্যাম্প আছে দিরাংজং। আবার ট্রাক চলল, ওপর দিকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠা ওড়নার মতন রাস্তাটা বেয়ে। ক্যাম্পগুলোতে আবার সিনেমা হল আছে, ওয়্যারহাউসের মতন টিনের ছাউনি—তার নাম Ball of Fire ; ঐ নামে সিনেমা হল বেশ ক'টাই চোখে পড়ে। কী হচ্ছে ? হিন্দি ছবি! বাইরে কাগজের পোস্টার সাঁটা।

রাস্তা দিয়ে কেবলই সাঁজোয়া গাড়ির সারি যাচ্ছে। ঝড়ঝড়ে রোগা বাস একটা কি দুটোই দেখেছি মোট। আমাদের মতন ট্রাক কয়েকটা দেখা যাচ্ছে অবশ্য মাঝে মাঝেই। তবে রাস্তাটা প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করে আর্মিই। টাটা-মার্সিডিসের তৈরি 'শক্তিমান' মিলিটারী ট্রাকের শোভাযাত্রা যাচ্ছে মাঝে মাঝেই, অল্পবয়সী ছেলেতে গাড়ি ভর্তি। দেখলে উত্তর ভারতীয় বলেই মনে হয়—শিখ্ সৈন্য সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। হয় তো শিখ্‌রা এমনিতেই চোখে পড়ে বেশি বেশি।

'রামা ক্যাম্পে' লাইড খেতে থামা হলো। রামা ক্যাম্পে আমার প্রথম উত্তেজনা, বিপুল লোমে ভরা ছোটোখাটো মহিষের মতন জন্তুটি। কী জন্তুরে বাবা ? তারপরে লেজটি দেখেই চিনে নিলাম তারে সখি, চিনে নিলাম তারে! ওই দীর্ঘ চামরের মতো পুচ্ছ যার সে চমরী ভিন্ন কেউ নয়। প্রথম চমরী গাইটি দেখে, মহা খুশি হয়ে, চটিতে ঢুকলুম খেতে। চমৎকার ভাত, মাংস, গরম গরম চা। গাবদা গোবদা লোমে ঢাকা

আহ্লাদী ভুটিয়া কুকুরেরা পথে পথে ঘুরছে। যত দেখছি, ইচ্ছে করছে তুলে নিয়ে যাই সব ক'টাকে। খেয়ে উঠে চটির পিছনে একটা ঝর্ণার জলে হাত মুখ ধুলুম। ওটাই দেখা গেল ওখানকার মুখ ধোয়ার বেসিন। কী সুন্দর ঠাণ্ডা জল। কী চমৎকার শ্যাওলা ঢাকা পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। কত ফার্ন হয়েছে ঝর্ণার ধারে ধারে। মুখহাত ধুয়ে কী তাজা টাটকাই যে লাগলো শরীর কি বলব!

আহীর গড়ের কাছ থেকেই নিচের দিকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়তে থাকে। নর্থ আমেরিকাতে যাকে বলে 'ফল,' বা 'অটাম্ কালার্স'—পাতাঝরার আগে বনে জঙ্গলে একটা রঙের আগুন লাগে ওদের দেশে। কিছু গাছের পাতার রং বদল হয়—হলুদ-গেরুয়া-কমলা-বাদামী, সিঁদুরে-লাল, রক্তলাল, আবীর-লাল,—যেমন মেপ্‌ল, কিম্বা ওক,—আবার কিছু কিছু গাছ চিরশ্যাম, তাদের শান্ত সবুজের ফাঁকে এদের বর্ণচ্ছটা—আশ্চর্য একটা নেশা ধরায়। এই সময়ে, উইক-এণ্ড ছুটিতে দল বেঁধে হেমন্তের রঙের বাহার দেখতে বেরুনো, আমেরিকানদের একটা বার্ষিক শখের মধ্যে পড়ে।

কোথা থেকে এসে পড়েছি আমি এই 'শীত সাহসিক হেমন্ত লোকে'র মধ্যে? আমার নিজের দেশেই যে এমনধারা হৈমন্তী মায়া আছে, কোনোদিনও কি জানা যেত, না যদি এসে পড়তুম এই পূর্বপার্বত্যে!

রাস্তা ক্রমশই পাহাড়ী, বন ক্রমশই হালকা, বাতাস ক্রমশই ঠাণ্ডা, ঝর্ণা এখনও প্রচুর। সঙ্গে—জু বলে এক জায়গায় বিকেলে চা খেলুম। পরমাসুন্দরী দুটি মেয়ে এসে চা দিল। গল্পও জুড়ল ঘনশ্যামের সঙ্গে। তাদের পরণে তিব্বতী বাকু, আর শাদা ব্লাউজ, কোমরে এপ্রন। তাদের

একটা ছোট গ্রাম্য মণিহারী দোকানও আছে। অনেক প্রাত্যহিক দরকারের জিনিষের সঙ্গে অদ্ভুত সুন্দর গরম তিব্বতী জ্যাকেটও বিক্রি করছে, মাত্র ৫০৲ তে। চীনে সিল্কের ওপর জরিতে ও রেশমে কারুকার্য করা, ভেতরে তুলো ভরা জামা। রাজকীয় দেখতে। খুব গরম। আছে বাকু, আছে শতরঞ্চির মতন এপ্রন। ফেরবার পথে কেনা যাবে। তবে এখানে চা-টা বেশ।

ক্রমশ দিনের আলো নিবে আসছে। সামনে পড়ল আবার একটা গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামেই একটা সাইনবোর্ড আছে, গ্রামের নাম লেখা। এই নামটা পড়েই বুকের ভেতর ধস্ নাম্‌ল।

—'শাংগ্রিলা'!

—শাংগ্রিলা তো সেই আশ্চর্য তিব্বতী গ্রাম? হিমালয়ের তুষার-রাজ্যের এককোণে সেই চিরযৌবনের গ্রাম, মহাকাল যেখানে হাত ছোঁয়াতে ভুলে গিয়েছেন। 'দি লস্ট হরাইজন' ছবির সেই মায়াময় জাদুগ্রাম, তারই তো নাম শাংগ্রিলা?

এতদূরে এসে পড়েছি?

তারপর দেখি পাহাড়ের গায়ে আরেকটিও বিশাল সাইনবোর্ড লটকানো—The Lost Horizon—এবং তার সঙ্গে দীর্ঘ একটি ইংরিজি ভাষায় নোটিস, অথবা উদ্ধৃতি। কিন্তু আমাদের ট্রাক তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল এত জোরে, যে পাহাড়ী হেমন্তের সান্ধ্য আলো-আঁধারির মধ্যে প্রাণপণে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে তুলেও পড়তে পারলুম না। কেবল বোঝা গেল: —"ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল বন্ধ"—কী বন্ধ কেন বন্ধ সেটা না জানে ডাক্তার, না ঘনশ্যাম। তারা এও জানে না, যে শাংগ্রিলার মানুষরা অজর, অমর। এতই অজ্ঞ? এত

কাছাকাছি থেকেও! দুজনের কেউই 'লস্ট হরাইজন' ছবি দেখেনি, নামও শোনেনি। ঘনশ্যাম যদিও মাঝে মাঝে 'অংরেজী পিকচার বি দেখলেতা হ্যায়'।

সত্যি সত্যি যে অনেকদূরে এসে পড়েছি, রূপকথার রাজ্যে পৌঁছে গেছি, নিউ ইয়র্ক—লণ্ডনের চেয়ে ঢের দূর, ঢের অচেনা দেশে—তিব্বতের রহস্যঘন ওড়্‌নার ছায়ায়—সেটা এক মুহূর্তে রক্তের ভেতরে টের পাইয়ে দিল এই একটি নাম—শাংগ্রিলা!

কিন্তু ওইটুকুর মধ্যেই যা দেখা গেল, তাতে জরাহারা চিরযৌবন'দের বদলে চোখে পড়ল প্রধানত শিখ্‌ জোয়ানরা।

বিরাট আর্মি ক্যাম্প এখন শাংগ্রিলা!

এবার পাইন বনে টাক পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বাড়ছে। চড়াই পথ। পরের গ্রামটির নাম বৈশাখী। ছোট গ্রাম। সমুদ্র থেকে এগারো হাজার পাঁচশো ফুট উঁচুতে। পথ এবারে আরো চড়াই। শিগগিরি সে-লা এসে গেল। সে-লা পাস প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে। বিশ্বে এটাই নাকি দ্বিতীয় উচ্চতম পথ—উচ্চতম পথটিও এই হিমালয়েই—পশ্চিমপ্রান্তে। লাদাখের লাহুল স্পিটি। (তখনও "কারাকোরাম হাইওয়ে" খোলেনি। জানিনা এখনও এই হিসেবটাই ঠিক আছে না কারাকোরামের কাছে হার মেনেছে!)

একটা পাথরের স্মৃতিসৌধ আছে সে-লা পাসে। তাতে লেখা This road from SELA (13,714) to Tawang dedicated by Mrs. Ruth Marley on 14 December 1972 to commemorate the work done by these units of 14 Border Roads Task Force, Fikar Not Fourteen, & to remember the men of the force who died with snowboots on.

এতক্ষণে FIKAR NOT এর পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করলুম। বনজঙ্গল-পাহাড় কেটে, ঠাণ্ডায়-হিমে-বরফে কষ্ট পেয়ে, মাসের পরে মাস তাঁবুতে থেকে যারা এই রাস্তা তৈরি করেছে, তারাই 'ফিকর্ নট্'। সত্যিই তো তারা যদি ফিকর্ নট্ না হবে, তবে কি আমি ?

একটু দূরেই নাকি একটা গুম্ফা আছে, সে-লা গুম্ফা। খুব জাগ্রত দেবতা সেখানে, খুব পুরোনো তিব্বতী বইপত্তরও আছে, ঘনশ্যাম জানালো। কিন্তু যাওয়া যাবে না। গাড়ির পথ নয়। হাঁটার সময় নেই। অতএব গুম্ফা দেখার প্রশ্ন নেই।

সব সময়েই একটা ঘন কুয়াশার চাদর দিয়ে সে-লা পাস ঢাকা থাকে। আরও দুয়েকটা লরি থেমেছে। যদিও কোনো চা-দোকান নেই। লোকেরা কী করতে নামছে তাহ'লে ? ও, কুয়াশার আড়ালে কিছু প্রাকৃতিক কর্ম সমাপন হচ্ছে ! পাথরের পিছনে গিয়ে। গাছপালার পর্দা তো নেই এখানে !

গাড়ি ফেলে ডাক্তার ও ঘনশ্যাম খুব ফিলসফিক্যালি দূরে দূরে হাঁটতে চলে গেল দেখে আমিও উল্টো দিকে হাঁটতে সুরু করি।

যেদিকেই মনে হয় একটু আড়াল আছে, আবিষ্কার করি একজন মনুষ্য আগেই সেখানটা আবিষ্কার করে ফেলেছে।

মাটিতে অল্প অল্প বরফ ছড়ানো। একটা ধূসর হেমন্ত গোধূলির রঙে পাহাড়ী পথটা মোড়া। কয়েকটা রামছাগল, দেখা গেল, শিং উঁচিয়ে কান নাচিয়ে আমাকে দেখছে। তাদের রাখাল একটা বাচ্চা ছেলে। কোথা থেকে এসেছে ? কাছাকাছি কোনো গ্রাম তো নেই। অনেক হেঁটেছে নিশ্চয়। এবারে ফিরে যাক। সন্ধে তো হল। আমিও ফিরি লরিতে।

রাস্তা এর পরে নামতে সুরু করেছে—নামতে নামতে আশ্চর্য একটা হ্রদে এসে পৌঁছয়—এখানে খুব বরফ। বরফে চারিদিক ঢেকে গেছে। এই রকমই একটা হ্রদ একবার যেন প্লেনে পামীর পার হবার সময়ে ওপর থেকে দেখেছিলুম। শাদাতে সবুজে আশ্চর্য বরফ-জলের রং। জানিনা মানস কেমন সরোবর। এই হ্রদটি সম্পূর্ণ জমে, তুষারহ্রদ হয়ে আছে। দূরে শাদা বরফঢাকা এক সারি পাহাড়। তাতে হঠাৎ কোথা থেকে ডুবন্ত সূর্যের আলো এসে কমলা বেগুনী রং মাখিয়ে দিল। পাহাড়ের কোলেই হ্রদ। তার ধার দিয়ে খচ্চর যাবার পথ। হঠাৎ দেখি একটা শ্লেজ গাড়ি যাচ্ছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে চারটে কুকুর—লোমেভরা, বলিষ্ঠ কুকুর। শ্লেজে একটা বাচ্চা ছেলে, একটা ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে। ছেলেটার মাথা গা সব মুড়িসুড়ি দেওয়া। যেন একটি এস্কিমো। এক-মুহূর্তের জন্যে পুরো দৃশ্যটাই পরিণত হল মেরুপ্রদেশের। ওই দিগন্ত-প্রসারিত তুষারহ্রদ, তার তীরে শাদা পাহাড়ের সারি, সামনে এই শ্লেজগাড়িতে ওই শিশু—সবটাই এত ভূগোলবই-ভূগোলবই, যে আমার নিজের অস্তিত্বটাই অবাস্তব মনে হ'ল ওইখানে।

—"যশবন্ত গড় হয়েছে জোয়ান যশবন্ত সিংয়ের নামে"—বলল ঘনশ্যাম ছেত্রী।

—"১৯৬২-র যুদ্ধে যশবন্ত সিং নামে এক শিখ জোয়ান একলাই এই আউটপোস্ট আগলে ছিল। দলকে পালাতে সুযোগ দিয়ে একাই গুলি চালিয়ে গিয়েছিল সে। যাতে গুলির শব্দে চীনেরা ভাবে এখানেই আর্মি রয়েছে। আসলে তখন সবাই নেমে গিয়েছিল, যশবন্ত ছাড়া। ও নিজেই এই কাজটা বেছে নিয়েছিল অন্যদের প্রাণ বাঁচাতে। নইলে সবাই যেত। শেষ পর্যন্ত চীনেরা এসে শুধু ওকেই মেরে ফ্যালে। সেই

থেকে যশবন্তগড় নাম।"

ডাক্তার বললে—"বাকীটাও বলে দাও ?"

—"বাকীটা ?" ঘনশ্যাম হাসলো।

—"জোয়ানরা বলে যশবন্ত এখনও ঘাঁটি ছেড়ে যায়নি। এই আউট-পোস্টে কোনো সান্ত্রীর ঘুমিয়ে পড়বার উপায় নেই। যেই ঘুমোবে, অমনি এক বিরাশী সিক্কার থাপ্পড় এসে পড়বে তোমার গালে। ডিউটির সময়ে ঘুমুলে, যশবন্ত সিং ছেড়ে দেয় না।"—

—"এমনিতে কিছু দৌরাত্ম্যি করেনা তো যশবন্ত সিং ? এই যে আমরা যাচ্ছি এখান দিয়ে, ঠেলে ফেলে দেবেনা তো রাস্তা থেকে ?" ডাক্তার হাঁহাঁ করে ওঠে—"নো, নো, হি ইজ আ বেনেভোলেণ্ট স্পিরিট—"

—"আই সী।"

—"তিব্বতীরা খুব স্পিরিটে বিশ্বাস করে। ভূতকে বলে 'হাং'। বহু বিভিন্ন জাতের ভূত-প্রেত আছে ওদের। পাহাড়ীরা সবাই দেখি ভূতবিশ্বাসী জাত। মিলিটারিও ঠিক তাই।" দুর্ঘটনায় মৃত্যু যাদের নিত্যসঙ্গী, তাদের বোধহয় অপদেবতায় আর অতৃপ্ত আত্মায় বিশ্বাস হওয়াটা স্বাভাবিক।

অফ মেন অ্যাণ্ড ট্রাউটস্

নুরুয়ানাঙে একটা ট্রাউটফার্ম আছে। কামেঙ্ নদীর একটা শাখাতে বাঁধ দিয়ে আটকানো হয়েছে, যেখানে ট্রাউটের বাচ্চা ছাড়া হয়। ট্রাউটের স্বভাব স্রোতের বিপরীতে ঠেলে যেতে চেষ্টা করা, কৈমাছের মত। ট্রাউট লাফও মারে মন্দ নয়।

অক্সফোর্ডের কাছাকাছি একটা ট্রাউট ফার্মে দেখেছি কী ভাবে কৃত্রিম উপায়ে ছোটো চৌবাচ্চায় স্রোত আর ঢেউ সৃষ্টি করা হচ্ছে আর ট্রাউটরা কেবলই তাতে লাফ মারছে (এটাই তাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর) আর ছিটকে দু'চারজন পড়ছে কঠিন শুকনো সিমেণ্টের মেঝেয়। অমনি বাঁশের ডগায় বাঁধা জালে করে তাদের ফের তুলে রাখা হচ্ছে জলে। ফের ওতে করেই ধরে নিয়ে তাদের বিক্রীও করা হচ্ছে খদ্দেরের কাছে।

আমার শ্বশুরমশাই যেতেন কুলু মানালিতে ট্রাউট ফিশিং করতে। ওখানে পার্বত্য ঝর্ণায় ট্রাউট আছে খুব। কামেঙ নদীর ট্রাউট ফার্মিং বিরাট সরকারী প্রকল্প। শুনলুম কাশ্মীরেও আছে এরকম। নুরুয়ানাঙে ট্রাক থামলো। ইতিমধ্যে ট্রাকের পিছনে আরও একটি সওয়ারী উঠেছে। কে জানে কোন্ গ্রাম থেকে। গোড়ায় যে দুটি পাহাড়ী ছেলে ছিল, তার একজন ট্রাকের ক্লীনার। আরেকজনের পোশাক পরিচ্ছদে স্বাচ্ছল্যের স্পষ্ট ছাপ। ঠিক গ্রামের লোক নয়। ঠিকেদার জাতীয়ও নয়। নুরুয়ানাঙে সবাই নেমে পড়লুম। চা খেতে যাওয়া হবে।—

ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে শুনি সে ছাত্র, তেজপুরে পড়াশুনো করে। বাবা মা থাকেন তাওয়াঙের কাছাকাছি এক গ্রামে। হাঁটতে হাঁটতে একটা ঘটনা ঘটলো।

হঠাৎ দেখি পাথুরে পথের ওপরে একটা মাছ পড়ে আছে। জ্যান্ত, না মরা? ছাত্রটি নিচু হয়ে মাছটা কুড়িয়ে নেয়। মাঝারি মাপের। চার পাঁচ শো গ্রাম ওজন তো হবেই। ধরতেই, হঠাৎ মাছ একটা শাদারঙের জলীয় দ্রব্য ছিটিয়ে দিল ছেলেটির ঝকঝকে নতুন পুলওভারের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী ছেলেটির মুখের সুকুমার কান্তি পালটে যেন একটা মুখোশ নেমে এল। ছেলেটি হাঁটু মুড়ে বসে, একটা পাথর

তুলে নিয়ে ঠুকে ঠুকে মাছটাকে মেরে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। এবং আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

এই আচরণটার মধ্যে একটা প্রাকৃতিক জৈব প্রতিশোধস্পৃহা রয়েছে। 'জিঘাংসা' শব্দটা কী বীভৎস, না? এই তো 'জিঘাংসার' মুখ। একটা অবলা জীব, তার জৈব প্রকৃতিতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে আর একটি বলবান জীব জৈব প্রকৃতিতে সেই আক্রমণের প্রতিশোধ নিয়েছে। এমন তো নয় যে মাছ আমরা ধরিনা, ছাগল মারি না। মুরগী কাটি না। কিন্তু এটার মধ্যে অন্যরকম কী যেন একটা বন্য গন্ধ আছে, মাছে মানুষে তফাৎ নেই।

এমনি সময়ে এক পাহারাওলা হাজির হয়ে—নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিনা—ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করলো। মাছ খুন করার অপরাধে! মাছ ধরা, ও মারা ট্রাউট ফার্ম অঞ্চলে দণ্ডনীয় অপরাধ। ছেলেটি বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল, বেশ খানিক তর্জন গর্জন করে, শেষে সান্ত্রী তাকে মুক্তি দিল, কিছু ঘুষ টুষ না নিয়েই!!

নুরুয়ানাঙ্ ইন্‌ন্

ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া, বাঁধ দেওয়া ঝর্না নদীর একধারে ছোট্ট একটা চায়ের দোকান। ঝুপড়ির মধ্যে। ধাবারই পাহাড়ী সংস্করণ। ভেতরে অন্ধকার। প্রথম ঘরটিতে একদল মানুষ বসে আছে। চা খাচ্ছে, বাটি করে খাবার খাচ্ছে। ওখানেই রান্না হচ্ছে। পাশেই আরেকটি আরো ছোট্ট ঘর, তার মাঝখানে একটা টিনের মধ্যে গন্‌গনে আগুন জ্বলছে, ওটাই ফায়ার প্লেস। এটার নাম 'বুখারী'। কাশ্মীরে যেমন 'কাংড়ী',

লোকে চাদরের তলায় বুকেও জড়িয়ে থাকে কাংড়ীর ছোট্ট সংস্করণ, বুখারী ঠিক তেমন নয়। কাঠের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি। কাঠের আগুনের তাতে ঘরটা বেশ গরম। বুখারী ঘিরে কিছু টুল পাতা, একপাশে বেঞ্চি টেবিল। আমরা প্রথমেই দু কাপ করে চা খেলুম, তারপর এক এক বাটি থুপ্‌পা খেলুম। কী বিশ্রী খেতে এই থুপ্‌পা। নুন নেই লংকা নেই তেল নেই ঘী নেই মাংস নেই সব্জী নেই কী যে আছে কে জানে? কয়েক টুকরো করে শুকনো চমরী গাইয়ের মাংস নাকি থাকে আর থাকে কিছু শস্তায় কেনা আর্মি সারপ্লাস মীট। এত বিস্বাদ বস্তু ফেনের মতন খেতে, সকলে সেটাই সোনামুখ করে খেয়ে নিলুম যা খিদে পেয়ে গেছে। তাছাড়া ঠাণ্ডাটাও একেবারে হঠাৎই পড়ে গেছে, ঝুপ করে। গরম গরম থুপ্‌পাটা গলার নলীর মধ্যে দিয়ে যে পেটের মধ্যে যাচ্ছে, সেই যাত্রাটি বেশ সুখকর। থুপ্‌পা শেষ করে আবার এক বাটি করে চা। চা আসছে চীনে বাটিতে করে, এমনি কাপে কি গেলাশে নয়। ঘরে এত ধোঁয়া পরস্পরের মুখ দেখা যায় না। কাঠের ধোঁয়ায় আমার প্রবল এলার্জি, কলকাতা, কি শান্তিনিকেতন কিম্বা দিল্লী হলে এতক্ষণ ধরাশায়ী হয়ে যেতুম! কিন্তু পথে পথে যখনই ঘুরি আমার সঙ্গে থাকেন এক পথিকদের দেবতা, যিনি সবরকমে আমাকে রক্ষা করে চলেন। মোট ৬ কাপ চা, দু'বাটি থুপ্‌পা খাবার খরচ পড়ল তিনটাকা। ডাক্তার এ টাকাটা নিজেই দিল। আমাকে দেড় টাকা দিতে দিল না।

সেই কাঠের ধোঁয়া ভরা ঘুপচি ঘরে জোর আলো জ্বেলে দেয়নি কেউ—বুখারীর আগুনেই যেটুকু আঁধার ঘুচছে। অন্ধকার মেখে বসে আছে কিছু কম্বল জড়ানো মূর্তি।

—"ওরা ছাং খাচ্ছে।"

—"ছাং কী বস্তু?"

—"বিয়ারের মত।"

—"অ।"

—"বক্‌শিও খাচ্ছে।"

—"সেটা কী?"

—"স্ট্রংগার লিকর।"

—"চলুন, চলুন"—তাড়া দিল ঘনশ্যাম ছেত্রী।"—রাত দশটা হয়ে যাবে পৌঁছুতে। জাং-য়ে থামতে হবে। কিছু জিনিস দেবার আছে।" ডাক্তার বলল, তাকেও থামতে হবে জাং-য়ে। উঠে পড়লুম নুরুয়ানাং ইন্ থেকে।

জাং এই পূর্ব-প্রান্তিক অঞ্চলে শেষ সৈন্যশিবির। এর পরে সেনানিবাস নেই। না চীনের, না ভারতের। মোট চল্লিশ মাইল বোধহয় (নাকি কিলোমিটার? কে জানে?) এইরকম মিলিটারি-ফ্রী অঞ্চল। সেই জীপ-বাবু বলেছেন মাটির নিচে সব বাংকার তৈরি করা আছে, তাতে গিজগিজ করছে একদিকে শুধু চীনে, আর একদিকে ভারতীয়। কিন্তু আমাকে কেউই হায় তার ঠিকানা জানাবে না। সে-দৃশ্য আমি দেখতে পাবো না স্বচক্ষে!

জাং-য়ে ট্রাক গেল নিজের মনে ঘুরতে, আমাকে নিয়ে ডাক্তার নেমে পড়ল এক জায়গায়, ছেত্রীর সঙ্গে একটা সাক্ষাতের জায়গা ঠিক করা রইল।

ডাক্তারের সঙ্গে যাঁদের বাড়িতে গেলুম মিলিটারি ব্যারাকের মধ্যে, তাঁর নাম কর্ণেল দেবদত্ত, তিনি কাশ্মীরী। তাঁর রূপসী স্ত্রী, আর দুটি দেবশিশুর মতো ছেলেমেয়ে তাঁর কাছেই রয়েছে। ওখানে নিশ্চয় আর্মি-র ইশকুল টিশকুলও আছে তার মানে। কর্ণেল দেবদত্তের স্ত্রী ও

বাচ্চারা আমাকে দেখে মহাখুশি। প্রথমেই ভাবলেন ডাক্তার বুঝি বউ নিয়ে এসেছে। বোঝা গেল এই অঞ্চলে স্ত্রীলোক অতিথি এরা দেখেন না বড় একটা।

তখন অনেক রাত। দশটা বাজে। বাচ্চারা শুয়ে ছিল। আমাদের দেখে উঠে পড়ল। মিসেস দেবদত্ত আমাদের গুলাবজামুন খেতে দিলেন। কফিও দিতে চাইছিলেন। কিন্তু সময় ছিল না। আর্মি ডিজপোজ্যাল্‌স থেকে ডাক্তার কিছু ব্র্যাণ্ডি আর মিল্কমেড কন্‌ডেন্সড মিল্ক কিনে রেখেছিলো এখানে, সেইগুলো নিয়ে নিল। কথা বলতে বলতে দেরি। ওদিকে হর্ণ শোনা গেল। অমনি ছুট্‌ ছুট্‌ ছুট্‌।

ডাক্তারের দু'হাতে ধরা রয়েছে বাজার-করা কাগজের কার্টন। কারুর হাতেই টর্চ নেই। দীর্ঘ পাহাড়ী পথ। যে পথে এসেছিলাম সেটা নয়—যাবার সময়ে অন্য পথে যাচ্ছি। গাড়ি থাকবার কথা অন্যত্র। নতুন, অচেনা রাস্তা। অন্ধকারে অন্ধের মতো ছুটছি ডাক্তারের পেছু পেছু। আমার ব্যাগে যে টর্চ ছিল, সেটা মনে পড়ল ট্রাকে চড়বার পরে। পাথুরে পথ—কিন্তু কি ভাগ্যি, নুরুয়ানাঙ্‌ কি সে-লার মতন বরফ পড়ে নেই। ওরই মধ্যে পায়ে কী একটা লাগলো ছুটতে ছুটতে। কুড়িয়ে নিলুম। ডালিম। কিম্বা বেদানা হতে পারে। ছোট্ট। পথে দেখেছি বটে বাচ্চারা পাকা ডালিম খাচ্ছে, কাঁচা কাঁচা পীচফল ডাঁশা পেয়ারার মতন কচকচিয়ে খাচ্ছে, বিরাট লাউয়ের মতন ভীম-শশা, পথের-ধারে-বসে-থাকা অলস বৃদ্ধ, কোমরের ভোজালী দিয়ে কেটে কুটে খাচ্ছেন। ছোট ডালিমটা কুড়িয়ে নিয়েই দৌড়োই—হঠাৎ সামনে দীর্ঘ একটা আলো এসে পড়লো। দূরের লরা থেকে ড্রাইভার হেড লাইটটা জ্বেলে দিয়েছে, আমাদের পথ দেখাতে। আর অসুবিধা হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রাকে উঠলুম।

চোখ দিয়ে কার্টনটা দেখিয়ে ড্রাইভার চোখ টিপে বল্‌ল—"রম্‌ ?"

—"ব্র্যাণ্ডি।"

—"একই বাত।"

নিষ্ঠুর আলোর বৃত্তে

শান্ত রাস্তায় খানিকটা উত্তেজনা গড়ে উঠলো। মজা নয়, উদ্বেগেরই ব্যাপার। ট্রাকের হেডলাইটের বৃত্তের মধ্যে আটকা পড়ে গেল হঠাৎ দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী, দুটো বেঁটে পাহাড়ী ঘোড়া। নিশ্চিন্ত নিভৃত পার্বত্য অন্ধকারে হাঁটছিল দুজনে, হঠাৎ তাদের তাড়া করল নিষ্ঠুর আলোর তীর। ঘোড়ারা প্রাণপণে ছুটেও ছুটন্ত ট্রাকের আলোর থাবার নাগাল আর ছাড়াতে পারে না! ঘনশ্যাম ছেত্রীকে যত বলছি, আলো বন্ধ করো,—সে বলে, তা কখনো হয়?—সে আলো কমাচ্ছে, আর বাড়াচ্ছে—তাতে আরো ঘাবড়ে, এলোমেলো ছুটতে থাকছে পোনি-দুটো। আমার একবারও মনে হোলো না যে বলি—'স্পীড কমাও, ওদের পেরিয়ে যেতে দাও তোমার আলোর বেড়া'—এই সমাধানটা অনেক পরে খেয়াল হলো। ততক্ষণে ট্রাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত ঘোড়া দুটো প্রায় চাপা পড়ে-পড়ে! আমার কেবলই ভয় করছে পা পিছলে, কি ঘাবড়ে-টাবড়ে, পড়ে না যায় খাদের মধ্যে। আমার সমস্ত মনটা অস্থির হয়ে প্রাণভয়ে ছুটন্ত ঘোড়া দুটোকেই জড়িয়ে ধরল, যতক্ষণ না রাস্তাটা হঠাৎ চওড়া হল, আর ওদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল ঘনশ্যাম ছেত্রীর দানবীয় ট্রাক।—শিকারে আমি যাইনি কখনো, কিন্তু বুঝতে পারলুম, শিকারীর তাড়া খেলে জন্তুদের কীরকম

লাগে। এই বোকা ঘোড়া দুটো বুঝতে পারেনি, এ পশ্চাদ্ধাবন শিকার-সন্ধানীর নয়। ওদের কাছে হয়তো মানুষ মাত্রেই পশুখাদক, মানুষ মাত্রেই শিকারী—সব জন্তুরাই নিশ্চয় ভয় পায় মানুষকে। মানুষই একমাত্র প্রাণী জীবজগতে যে নিজের জাতভাইকে নিজেই মেরে ফ্যালে! জন্তুরাও মারামারি করে, আহত করে, কিন্তু নিহত করার উদ্দেশ্যে নয়, পরাজিত করার উদ্দেশ্যে। পরাজয় স্বীকার করে নিলেও, তাকে মেরে ফ্যালে একমাত্র মানুষই। জন্তুরা নাকি ছেড়ে দেয়।

আন্ধে কিনারে আন্ধে রাতে যায়ে তো যায়ে কাঁহা

এক জায়গায় ট্রাক থামিয়ে ডাক্তার বলে—

—"আমি এইখানেই নেমে যাবো। এইখানে আমার বাড়ি।" সে নেমে ট্রাকের পিছন থেকে বেডিং নামাতে যায়।

—"আপনি কোথায় নামবেন?"—ছেত্রীর প্রশ্নে আমার সর্বপ্রথম খেয়াল হয় যে তাওয়াঙে আমার কোনো রাত্রির আশ্রয় নেই।

—"আমি? এখানে আই-বি নেই?"

—"এখানে সার্কিট হাউস্ আছে, কিন্তু সে তো এখন বন্ধ। সেখানে কেউ নেই। আপনি কি চিঠি নিয়ে এসেছেন?"

—"নাঃ। চিঠিপত্র তো নেই?"

এমন সময়ে দেখি মালপত্তর নামিয়ে নিয়ে, ডাক্তার গুটি গুটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে

—"গুডবাই, ডক্টর সেন।"

—"দাঁড়ান দাঁড়ান, ডাক্তার। সার্কিট হাউস খোলানোর কোনো

উপায় আছে ?”

—“এত রাত্রে ? সাড়ে দশটা বেজে গেছে তো—এখন এখানে বিদ্যুৎও নেই, সবাই ন’টায় শুয়ে পড়েছে।”

—“তাছাড়া এ.ডি.সি বম্‌ডিলাতে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে।” ছেত্রী বলে।—“ওঁর কাছে চিঠি নেই, কেউ দেবে না সার্কিট হাউস খুলে।”

—“তাহলে আমি কোথায় যাই ? কোনো হোটেল টোটেল ?”

—“এখানে ? হোটেল কোথায় ?” হেসে ফ্যালে ট্রাক ড্রাইভার। —“কিছু ব্যবস্থা না করেই এসে পড়েছেন ? কার কাছে এসেছেন ? যাবেন কোথায় ?”

হায় রে ঘনশ্যাম ছেত্রী !

যদি জানতেম, এসব মৌল প্রশ্নের জবাব, তোমায় জানাতাম !

—“এসেছি গুম্ফার কাছে। যাব গুম্ফায়।”

—“সে তো কাল সকালে। এখন ?”

—“আমি যাচ্ছি”—তাড়াতাড়ি ডাক্তার বলে। “আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে”—

—“সেকি কথা ? কোথায় যাচ্ছেন মশাই আমাকে ছেড়ে ? আমিও যে যাচ্ছি”—

—“কোথায় ?”

—“কেন, আপনার বাড়িতে ?”

—“না না, সে হয়না, আমি ব্যাচেলর।”

—“তাতে কী ? ব্যাচেলর বলে কি গাছতলায় থাকেন ? ঘরবাড়ি নেই ?”

—“ঘর আছে, কিন্তু লোকজন নেই”—

—"ভালই তো, তাহলে জায়গায় কুলোবে"—

—"কিন্তু, এ কখনও হয় না—আমি একা থাকি, আমার বাড়িতে"—

—"একটাই ঘর ?" ড্রাইভার প্রশ্ন করে।

—"ঘর চারটে। কোয়ার্টার্স তো।"

—"তবে আবার কি ? মেমসায়েবকে নিয়ে যান। নইলে তো আমাদের বাড়িতেই নিয়ে যেতে হবে। বস্তিতে কী করে থাকবেন উনি ? কষ্ট হবে না ?"

—"আমি একটা ঘর হলেও যেতুম ভাই শ্যাম তোমার সঙ্গে। আমি যে ভালো লোক, এটা তো প্রমাণিত তথ্য। তবে, এত ভয় পাচ্ছো কেন ?"

—"বাহাদুর কী ভাববে, তাই ভাবছি।"

—"বাহাদুর কে ?"

—"আমার কাজের লোক।"

—"তবে তো তুমি একা নও ? তবে আর তোমার ভাবনা কী ? বাহাদুরই তোমাকে পাহারা দেবে। চল, চল, এই নাও আমার বাক্সটা ধর, আমি নামি।"

অন্ধকার থেকে এগিয়ে এসে একটি মূর্তি ডাক্তারের বাক্স বেডিং মাথায় তুলে নিয়ে পথ হাঁটতে সুরু করে। ডাক্তার আমার বাক্সটা নেয়, খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ছেত্রীকে ডাক্তার কত দিল দেখিনি, আমি কুড়িটাকা দিই। সারাটা পথ পান-তাম্বুল খাওয়াতে খাওয়াতে এসেছে। একবার পকেট থেকে কিছু ফটো বের করে দেখিয়েছে। কিসের ফটো, কিছুই বোঝা গেল না। ছেত্রী বলল—"তাওয়াংয়ের হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টের ছবি। আমি নিজের ক্যামেরায় তুলেছি।" জলের চিহ্ন দেখলাম না সেই ছবিতে যদিও। ওটা সুন্দরবনের টাইগার প্রজেক্টের

ছবিও হতে পারে, অথবা বাঁকুড়ার খরার। যাই হোক খুব আমুদে ছেলে। টাকাটা প্রথমে নিতে আপত্তি করে, তারপর পকেটে পুড়ল। হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করে 'গুডবাই' করলুম—খুব খুশি!

তারপর এগোলুম ডাক্তারের পেছু পেছু। একজনের পিছনে আর একজন হাঁটতে হয়, সরু রাস্তা। আমার মনে পড়ল টর্চের কথা। টর্চ বের করে জ্বাললুম। রাস্তা ঠিক বলা যায় না, পাহাড় কেটে এবড়ো খেবড়ো পায়ে চলার শর্টকাট মতন। একটা পাঁচিল লম্বা পায়ে ডিঙিয়ে টুক করে ডাক্তার ঢুকল। এবং তারপরই মুশকিলে পড়ল। আমাকে নিয়ে।

—"গেট উল্টোদিকে। এটা আমার বাড়ির পেছন দিক। তুমি দাঁড়াও। আমি আসছি। অনেকটা হেঁটে ঘুরে আসতে হবে তোমাকে নিয়ে।"

—"কিসের জন্যে? আমি কি পাঁচিল ডিঙোতে পারিনা নাকি? ভারি তো একটুখানি বেঁটে পাঁচিল"—বলতে বলতে আমি হাতের ভরে পাঁচিলে উঠে, পাঁচিল ডিঙিয়ে ফেলেছি।

—"গুড!" আওয়াজটা হাসি হাসি। এতক্ষণে ডাক্তার বোধহয় একটু হাস্যবদন হল। আশ্চর্য। এর কি মাথায় কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? এটুকু মাটির পাঁচিল ডিঙোনো যে এই ব্যক্তির পক্ষে কিছু না, সে তো ওর অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল। জামীরীর ডাকবাংলোয় ঘরের মধ্যে অদৃশ্য পাঁচিলটা অত সহজেই যে গেঁথে ফেলতে পারে।

ভেতরে গিয়ে দেখি বেশ সুন্দর বাংলো। বাহাদুর একটা মস্ত ঘরে বসালো, সেখানে শুধু একটা হ্যারিকেন, আর দুটো কাঠের পিঠ উঁচু-হাতল সোজা চেয়ার আছে। আর একটা হিমেল ভাব।

আমাকে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলো—

—"চা খাবেন ?"

—"নিশ্চয়ই।"

—"দুধ-ভাত ?"

—"থাকলে, খাবো।"

—"রেঁধে দিচ্ছে।"

—"আমি একটু চান করতে চাই। দুদিনের পথের ক্লান্তি চান না করলে যাবে না।"

—"তাহলে তাড়াতাড়ি তৈরি হ'ন, জল গরম করছে। তবে রাত্রে মাথায় জল দেবেন না। কেবল গা-হাতপায়। সঙ্গে সঙ্গে ওভারকোট পরে নেবেন, নইলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এখানে খুব চোরা-শীত।"

আমি মনে মনে ভাবছি, আমি তো এর চেয়ে ঢের বেশি ঠাণ্ডায় থেকেছি ভাই, মাইনাস ত্রিশে, নাকের ডগাটি তৈমুরলং এসে তরওয়াল দিয়ে কেটে নিলেও কিচ্ছু টের পেতুম না তখন।

কিন্তু সে তো বাইরে।

ঘরের ভেতরে সেণ্ট্রাল হীটিংয়ের অতিরিক্ত হাঁসফাঁস-করা গরমের নিশ্চিন্ত আওতায় থেকেছি। চান করে বেরিয়েই ঠাণ্ডা লাগার ভয়টি আমেরিকায় নেই। কিন্তু আমার প্রথম যুগের ইংলণ্ডে খুবই ছিল। চান করে বেরিয়েই অর্থাৎ বাথটবের গরমজল থেকে উঠেই তো হিমশীতল হি-হি-করা বাথরুমে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে গা-মোছা, জামা পরা, তারপর হিমশীতল শোবার ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি কম্বলের তলায় ঢুকে পড়া, হট্ ওয়াটার বট্‌ল সমেত। বট্‌ল মানে বোতল নয়, ব্যাগ। সেই ইংলণ্ডে ক্রমশ হীটিং প্যাড এল, এল ইলেকট্রিক ব্ল্যাংকেট, এখন তো সেণ্ট্রাল হীটিং যথেষ্ট চালু। শোবার ঘরে হীটার থাকতো না প্রায়ই, ফায়ার প্লেসও না। শোবার ঘর নাকি ঠাণ্ডা হওয়াই স্বাস্থ্যকর,

তখন সবাই বল্‌ত। বোধহয় পাছে কোনো উপায়ে asphyxiation না হয়ে যায় তার জন্য এই foolproof উপায়। ট্রিনিটি কলেজে, ছাত্রাবস্থায়, অমর্ত্যদের আবার এক বাড়িতে ছিল শোওয়া, আরেক বাড়িতে স্নান। দুই বাড়ির মধ্যে পেরুতে হত বিরাট উঠোন। শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা লাগার পাকা সুব্যবস্থা আরকি। ফলে ছেলেরা সাপ্তাহিক স্নানটি আরও কমিয়ে পাক্ষিক, মাসিক, এমনকি ত্রৈমাসিক করে ফেলতো। শীত যেমন বাড়তো, স্নানদিনের সংখ্যাও তেমনি কমতো।

কিন্তু সেসব পঁচিশ বছর আগের কথা। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও না। এখন ট্রিনিটিতেও নিশ্চয় সেণ্ট্রাল হীটিং হয়েছে, অ্যাটাচ্‌ড শাওয়ার হয়েছে। ছেলেরা হয়তো রোজ রাত্রেই স্নান করে শোয়। জমানা বদল গয়া।

চা খেয়ে উঠতেই, বাহাদুর বলে গেল গরমজল দিয়েছে। বাথরুমটি পাশেই। সেখানে দুটি ঠাণ্ডা জলের কল, ও শাওয়ার। হায়! ঐ শাওয়ারের মত অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন শোভা বোধহয় কলকাতার সাহেব বাড়ির ফায়ার প্লেসগুলোও নয়। কলের নিচে ধোঁয়াচ্ছে বাষ্প-আবৃত একটা ক্যানেস্তারা। তাতে আমার চানের জল। সরু করে ঠাণ্ডা জলটা খুলে জল মেশাতে দিয়ে ঘরে এলুম জামাকাপড় তোয়ালে সাবান নিয়ে যেতে। দু'মিনিটও নয়। গিয়ে দেখি জল ঠাণ্ডা হিম। কল থেকে সরু একটা আইসিক্ল ঝুলছে। নাঃ, বিলেত আমেরিকায় আমার এই অভিজ্ঞতা হয়নি। বাহাদুর একটু পরে আবার গরমজল দিল। নলের ওপরে গরমজল ঢেলে জলের ধারা ফিরিয়ে আনলো। স্নান শেষে সত্যি বেশ তাজা বোধ হলো। ডাক্তারের শোবার ঘরটি বেশ গরম। দৌড়ে সেখানে ঢুকে পড়ি। ঘরের মাঝখানে একটি 'বুখারী', তাতে চিম্‌নি

লাগানো। সেই চিমনির জল ছাদ ফুঁটো করে উঠেছে। ওটা ঘরের মাঝখানে থাকায় মেঝেটা ছিন্নভিন্ন। একপাশে ছোট পড়ার টেবিল, চেয়ার, বুকর‍্যাক। দেয়ালে আয়না, তাকে চিরুণী, দাড়ি কামানোর জিনিসপত্র, ব্রিলক্রিম, পাউডার। অন্যপাশে সরু খাট বিছানা। একলা মানুষের ঘর। আর কী বা লাগে? বুকর‍্যাকটা ঘাঁটতে গিয়ে অবাক। কোথায় হ্যাডলি চেজ থাকবে, হ্যারল্ড রবিন্‌স থাকবে, তা নয় ভগবদ্গীতা রয়েছে, আর উপনিষদ্। আর কিছু, থ্যাংক গড, আগাথা ক্রিষ্টি।

ডাক্তার একটু বেরিয়েছিল। টর্চ নিয়ে অত রাত্রে কোথায় গেল জানি না। ফিরল বগলে বিরাট এক বেডিং নিয়ে।

—"এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ধার করে এনেছি।"

—"আমার জন্যে বুঝি?"

—"না। আমার জন্যে। আপনি আমার খাটে শোবেন।"

বাহাদুর দুধ আর ভাত এনে দিল। তাই খেয়ে নিয়ে শোবার জন্যে তৈরি হচ্ছি ডাক্তার বলল—"একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নিন এবারে। এখানে ঠাণ্ডায় উপকার হবে।" মন্দ আইডিয়া নয়। ঠাণ্ডায় উপকার হোক না হোক, শরীরে তেজ তো হবে। কাল কেমন দিন যাবে কে জানে? ডুডু তো খেলুম, এবার ব্র্যাণ্ডুও খাই!

একের পিঠে দুই / চৌকি পেতে শুই

দু'চামচ ব্র্যাণ্ডি আমি তো চট করে খেয়ে ফেলেছি। ডাক্তার অল্প অল্প করে খাচ্ছে। অথচ কথা বলছে না। আমি শুয়েই পড়েছি।

—তুমি কোথায় শোবে ?

—ওঘরে।

—বিছানা হয়ে গেছে ?

—বাহাদুর করে দেবে।

—ও ঘরে ঠাণ্ডা লাগবে না তো ?

—না।

—ও ঘরে 'বুখারী' আছে ?

—না।

—ও ঘরে খাট আছে ?

—না।

—ও ঘরে কার্পেট আছে ?

—নাঃ। ও ঘরে পর্দাই নেই, কার্পেট !

—বাঃ, বেড়ে ঘর তো ? ওঘরে তোমার শোওয়া হবে না ভাই। নিজের ঘরে নিজে শোও। আমিই ওঘরে যাচ্ছি। থাকতুম তো রাস্তায় পড়ে, তারচেয়ে হাজার গুণে ভাল এই ব্যবস্থা। ওঘরে আমি শোবো।

—না না। আপনার এই ঘর। 'বুখারী' আছে খাট আছে। ওঘরে আপনি শুতে পারবেন না। আমি শুচ্ছি।

উঠলুম। ওঘরে গিয়ে দেখি বিশাল শূন্য ঘরের মেঝেয় একটি সরু

বিছানা। হিমঠাণ্ডা একটা বাতাস ঘরে ঝুলে আছে। ঢুকলেই গায় কাঁপুনি দেয়। বাহাদুর শুয়ে পড়েছে বাইরে—করিডরে। দোরের কাছে হ্যারিকেন জ্বলছে।

হায়রে এখানে শুলেই তো নিমোনিয়া হবে! এইখানে শ্রীমান ডাক্তার "তড়বড়িয়ে বুক ফুলিয়ে শুতে যাচ্ছেন রাতে?" অথবা এই শ্রীমতী? পাগল?

আমি বললুম—"ও.বাহাদুর, ডাক্তারবাবুর বিছানা তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে এস। তোমার বিছানাও শোবার ঘরের সামনে কর। এ-ঘরে খুব ঠাণ্ডা যে।"

বাহাদুর বিছানা শোবার ঘরের মেঝেতে এনে পেতে দিল। ডাক্তার মুখে খুব আপত্তি করলেও বাধা দিল না। এই ঘরটিই যা গরম। ও ঘরটা সত্যি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। করিডর তার চেয়ে ঢের গরম। বন্ধ জায়গা তো? অন্য ঘরটায় জানলার কাচ ভাঙা, আরো ঠাণ্ডা।

প্রথম সমস্যা, পোষাক। কী পরে শোবো? কেউ কিছু না আলোচনা করেই দুজনে যা পরে বের হই, তাই পরেই বিছানায় শুতে গেলুম। শুধু জুতোজোড়া খুলে রেখে।

নেক্সট প্রবলেম ছিটকিনি। খোলা থাকবে, না আঁটা থাকবে? দরজা বন্ধ না রাখলে ঘরের হীট বেরিয়ে যাবে।

এদিকে বন্ধ করলে বাহাদুর···? তাই ডাক্তারের ইচ্ছে ছিটকিনি খোলাই থাক। শেষ পর্যন্ত ছিটকিনি লাগিয়েই শোওয়া হল। বাহাদুরকে ডেকে এনে শোওয়ানো হ'ল ঠিক দোর গোড়াটিতে। নেহাৎ ঘরের মধ্যে শোওয়ানোর ঠাঁই নেই, তাই। বাহাদুরের মুখে তো কোনো ভাব বৈচিত্র্য ফোটে না, তাই বোঝা গেল না সে কী মনে করছে। ডাক্তার এই স্বজন রহিত বিদেশে কেন যে বাহাদুরকে জ্যাঠামশায়ের

মতন মান্য-ভক্তি করে চলেছে, সেটাও বোঝা গেল না। যে আভ্যন্তরীণ আপত্তি এবং উদ্বেগগুলোর জন্ম হওয়া উচিত ছিল এই আমারই মধ্যে, যেহেতু আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি।

একে তো বায়োলজিক্যালি, নারীর স্বাভাবিক প্রকৃতিগত ভাবে, অপরপক্ষে সোশিওলজিক্যালি, সামাজিক নীতির অনুশাসনের ফলে এগুলো নারীরই ভূষণস্বরূপ। অথচ সেগুলোর চিহ্নমাত্র আমার চরিত্রে নেই, আর এই যুবক, এই ছ' ফুট লম্বা সিন্ধী ডাক্তারটি সেই সব বাধা-বন্ধের দড়ি-শেকলে হাত-পা বাঁধা হয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। বেচারী! দূর থেকে যাকে অবিকল অমিতাভ বচ্চনের মতো দেখায়, যার চোখের রং নীল, সে কেন এমন?

আমার এখন বেজায় লোভ হচ্ছে একটু ছেলেটাকে খ্যাপাতে। যাব নাকি, একবার ঃ—"আজ হোলি খেলবো শ্যাম তোমার সনে, একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে"—বলে রোম্যান্টিকালি তেড়ে? কী করবে তাহলে ডাক্তার? জহরব্রত নেবে? কুক্‌রী বের করে হঠাৎ খুন খারাপি করে ফেলবে? নাকি সেই সুখকর আশা-আশঙ্কার আধে-আঁধুরেতেই জামীরীতে সারারাত ঘুম হয়নি তার? পুরুষের চরিত্র, দেব সেন ন জানতি। ন চিন্তয়তি চ।—"স্লিপ ওয়েল, ডক্টর—ইট্‌স্‌ ভেরি কাইন্‌ড অফ ইউ টু অফার মি আ শেলটার। গুড নাইট, ডক্টর।"

আমি তো আরামে-গরমে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়লুম। ডাক্তারও তার মেঝের বিছানায় নিশ্চয়ই মৌজেই ঘুমিয়ে ছিল। নিজের ঘরের উষ্ণ নিরাপত্তায়, এবং দোর গোড়ায় বাহাদুরের হুঁশিয়ার পাহারায়, তার

অনিদ্রা হওয়ার কারণ ছিল না। থাকলই বা ঘরে একটা গুণ্ডা হাতীর মত দোর্দণ্ডপ্রতাপ মেয়ে!

প্রথম দিনের সূর্য

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে, মেঝেয় ডাক্তার ঘুমন্ত। দোর খুলে, করিডরে বাহাদুর নেই। বাইরের দরজাটি খোলা। বেরিয়ে, সামনেই আশ্চর্য এক ছবি।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা, সূর্য প্রায় উঠে পড়েছে, চারিদিকেই পাহাড় ঘেরা—সেই পাহাড়ের পিছন থেকে সূর্যের ছটা বেরুচ্ছে, ছোটোবেলায় যেমন সূর্যের ছবি আঁকতুম। দূর দূরান্তের তুষার শিখরে সেই সূর্যের আলো ছিট্‌কে গিয়ে পড়ছে গাছপালা বিশেষ দেখা যাচ্ছে না, চারিদিক স্তব্ধ। অবিশ্বাস্য গম্ভীর শান্ততায় ঢাকা। ভোর বেলাকার ছবি, অথচ ভোর বেলাকার শব্দ নেই। একটিও পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না।

ঠিক বাড়ির সামনেই একটা ভাঙা তিব্বতী মন্দির। গুম্‌ফা। তাক্ করে ঠিক তার পিছনেই সূর্যটা উঠছে। যেন থিয়েটারের স্টেজ সেটিং। হবে না? এই সূর্যটাই তো কন্যাকুমারিকায় দুখানা বাঁকা নারকোল গাছের ঠিক মাঝখানে কায়দা মেরে ডুবছিল, যেবার রাজ-সরসম্মার সঙ্গে গেলাম,—ঠিক বস্তাপচা ক্যালেণ্ডারের শস্তা ছবির নকল করে। এখানেও নাটকীয় মুহূর্ত ঠিক সৃষ্টি করে নিয়েছে। দৃশ্যপট সাজাতে বুড়ো সূর্যের জুড়ি নেই। ওর তুল্য অভিজ্ঞ আর কে? হ্যাঁ আছে আরেকজন, চাঁদ।

একটাও পাখি না-ডাকা, এমন বিপুল নিঃশব্দ, কেমন গা ছম্ ছম্ করে। কোটটা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ি। ঐ গুম্ফার দিকে। ওটা তাওয়াং

গুম্ফা নয়। তাওয়াং গুম্ফা মস্ত বড়ো ব্যাপার—দুর্গের মতো, কেল্লার মতো, এবং তারই ভেতরে মন্দির। কাল ট্রাকে আসতে আসতে ঘনশ্যাম ছেত্রী বলেছে। পথে এক জায়গায় একটা গ্রাম দেখিয়ে বলেছে—"এখানে জং ছিল, কেল্লা—খাম্পারা এসে মোম্পাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ক'রে খাজনা আদায় করত। এখানে মাটির নীচে গুহাঘরে বন্দীদের আটকে রেখে দিত—খাম্পারা আসতো তিব্বত থেকে—খুব নিষ্ঠুর জাত। শেষকালে মোম্পারা একদিন ওদের মেরে ধরে তাড়িয়ে দিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে লাগলো।"—আমার মনে হলো, সেটা নিশ্চয় ইংরেজদের আসার পরে। ছেত্রীই বললো—"তাওয়াং গুম্ফাতেও জং আছে—বাইরে—গুম্ফাতে বহুৎ সোনা তো, জং না থাক্‌লে সব কেড়েকুড়ে নিয়ে যেত খাম্‌পা ডাকুরা।"

কিন্তু এই গুম্ফাটাতে নিশ্চয় মোটেই সোনাদানা নেই। ছোট্ট মন্দির, পাথরের তৈরি খুদে দোতলা বাড়ি। কেল্লাটেল্লার ব্যাপার নেই। ঢুকতে গিয়ে দেখি সামনের বারান্দাময় কী যেন একটা শস্য ছড়ানো। শুকুতে দেওয়া হয়েছে। ঘাসের বীজের মতো দেখতে। আর তারই মধ্যে গোটা চারেক লোমঝুলঝুল কুকুর আরাম্‌সে শুয়ে আছে।

আমাকে দেখবা মাত্র কুকুরগুলোর কী প্রচণ্ড চীৎকার, নির্জন শীত সকালের শান্ত স্তব্ধতা খান-খান হয়ে গেল।

আমি কুকুর ভয় পাইনা, ভালবাসি। এগিয়ে গিয়ে শিস্ টিস্ দিয়ে ওদের ভোলানোর চেষ্টা করতেই, ওরে ববাবা! আরও জোরে জোরে হল্লাগুল্লা সুরু করে দিল। গুম্ফাবাসী সন্ন্যাসী কুকুরের ব্যাপারই আলাদা। তখন গুম্ফায় ঢোকবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে প্রদক্ষিণ করতে গেলুম। ওরাও চুপ করে গেল। বাইরে প্রেয়ার হুইল রয়েছে। ঘোরালেই ওম মণিপাম হুম্ বলা হবে একশো আটবার। বাইরে থেকে

একটা সরু পাথুরে সিঁড়ি উঠে গেছে গুম্ফার দোতলায়। সেখান থেকে নেমে এলেন এক গেরুয়াধারী লামা।

—"নমস্কার।"

—"...।" তিনিও নমস্কার করলেন।

—"গুম্ফাকা অন্দর যা সক্‌তা ?"

—"... ।" তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন, কিন্তু কী যে বললেন বোঝা গেলনা। তাঁকে দেখে কুকুররা মহা উল্লসিত, বেঁটে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তাঁর পিছু পিছু মন্দিরের ভেতরে এসে ঢুকল। মন্দিরে কুকুর ঢুকতে আগে দেখিনি। একটু অস্বস্তি হল না, তা বলব না। কুকুরদের পশ্চাদ্ধাবন করলুম আমি।

ভিতরটা বেশ বড় একটি হলঘর। শেষ প্রান্তে পূজাবেদী ইত্যাদি। সেখানে একটি স্তম্ভ, তাতে থাকার কথা বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু আছে কী ? পাঠক, বিশ্বাস ধারণ করুন। বেদীর ওপরে ঘৃতপ্রদীপের সামনে ভক্তিভরে প্রতিষ্ঠিত,—কে ? গান্ধীটুপি জহরকোট পরা নেহরুর প্লাস্টার অফ প্যারিসের মূর্তি। তারই সামনে জ্বলছে ধূপধুনো। চারিপাশে ইন্দিরা গান্ধী এবং সঞ্জয় গান্ধীর ফোটো ঝুলছে। বড়ো বড়ো পোস্টার সাঁটা রয়েছে সঞ্জয়ের বাণী উদ্ধৃত করে। সব চেয়ে মজা লাগলো 'তাংখা'গুলি দেখে। তিব্বতী তাংখা তো আগেও দেখেছি। সিল্কের ওপর মাটির রং দিয়ে আঁকা তিব্বতী দেবদেবীদের ছবি, ওপরে-নীচে জরি-সাটিনের ব্রোকেড আঁটা, ফ্রেমের মতো করে নীচে ওপরে কাঠের রুল ভরা, আর তলায় ঝালর।

এখানে ঠিক সেই রকম বহু তাংখা, কেবল দেবদেবীর ছবির জায়গায় আছে ইন্দিরা, সঞ্জয়, এবং জবাহরলালের সিংগল এবং গ্রুপ ফোটো-গ্রাফ। কখনো একা, কখনো ভিড়ের ছবি। সভার বক্তৃতামঞ্চের

ছবিও ঢের।

এটা তো বড্ড দূরে, আর বড্ড উঁচুতে, এখানে কি এখনও খবর আসেনি, যে ইন্দিরা-সঞ্জয় আর গদীতে নেই? ১৯৭৭ এর নবেম্বর মাস।—মার্চ মাসেই তো রাজনীতির আকাশ থেকে সঞ্জয়-উল্কার পতন হয়েছে। বেদীতে দূরে দূরে কয়েকটি ধূলিমলিন, ম্রিয়মান, অপূজিত, অবহেলিত বুদ্ধমূর্তি অবশ্য পড়ে আছে। ধূপ-দীপ জ্বলছে জবাহরলালের সামনে।

বাইরে প্রেয়ার হুইল ঘোরালে কি এই গুম্ফার 'মানি' যন্ত্রটি "ওম্ মণিপদ্মে হুম্" এর বদলে অন্য কিছু মন্ত্র বলে? "নেহরু পদ্মে হুম্"? আমার অবাক মুখচ্ছবি দেখে বৃদ্ধ লামাটি বলেন—"নেহরু-গুম্পা, নেহরু গুম্পা!"

তারপর বাইরে উঠোনে আসেন, কুকুরের পাল সমেত। উঠোন অযত্নে, আগাছায় ভরা। তৃণহীন, ছাগলনাদিতে অলংকৃত। সেখানে একটি ঘণ্টাতলা আছে, পাথরে বাঁধানো। লামা ধীর পায়ে এসে ঘণ্টাটি বাজান। কেন বাজান? চমৎকার গম্ভীর ধ্বনি, পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়। আমি কিছুই বুঝিনা।

ভাষার সেতু নেই দুজনের মধ্যে।

আস্তে আস্তে ফিরে যাই।

কুকুররা কিছু বলে না।

তাড়া করে না।

যে চলে যায়, তার পথে বাধা নেই। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ অন্য একটা ঘণ্টার মিষ্টি শব্দ পাই। একটা নয়, অনেকগুলো। টুং টাং টুং টাং টুং। একটি বাড়ির ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসে হৃষ্ট পুষ্ট একটি চমরী গাই। গলায় চৌকো ঘণ্টা বাঁধা। যেমন ঘণ্টা

দেখেছি আল্প্‌সের টিরোল অঞ্চলের গরুদের গলায়। তারপর আরেকটি, তারপর আরেকটি। একপাল ঘণ্টাঝংকৃত চমরী গাই নিয়ে দায়িত্বপূর্ণ পায়ে চরাতে যাচ্ছে, দুটি তিব্বতী কুকুর! বিলিতি বইতে যাদের বলে শীপ-ডগ। তাদের পিছনে লাফাতে লাফাতে আসছে একটি ক্ষুদে লাঠি হাতে, অতীব ক্ষুদ্র একটি প্রাণী, তার নাকের সামনে সর্দি সবুজ হয়ে আছে, গায়ে নোংরা মোটা ভুট্‌কম্বলের বাকু, পায়ে জড়ানো জড়ানো রঙীন ফিতের মতন তিব্বতী জুতোমোজা। ফুটন্ত গোলাপফুলের মতন মুখটি। আমার দিকে অবাক চাউনি ছুঁড়তে ছুঁড়তে চলে গেল। বাঃ, চমরী গাইদের গিন্নিবান্নি রাখালীটি তো ভাল? বয়েস বছর চারেকের বেশি মনে হল না।

নেহরু গুম্ফার উঠোনে সেই লামার বাজানো গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির পরে, এই হালকা টুং টাং—দুটো মিলে চমৎকার একটা সুরেলা আমেজ সৃষ্টি করেছে; এই কূজনহীন ভোরের নগ্ন নৈঃশব্দ্য তবু কিছুটা ঘুচিয়েছে।

ডাক্তারের কোয়ার্টারটি সামনেই। ঢুকেই দেখি ডাক্তার বারান্দায়। দু' হাতে দু' কাপ চা। দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল—"কোথায় গিয়েছিলেন? আমি ভয় পাচ্ছি, নতুন জায়গা, হারিয়ে টারিয়ে না যান!"—হায়রে, হারাতে চাইলেও কি হারাতে পারবো এই জনহীন জনপদে? ঘরবাড়ি নেই গাছপালা নেই মানুষজন নেই শুধু তো পাথর! পাথরের সঙ্গে মিলে মিশে হারিয়ে যাবো, এমন অবস্থা এখনো হয়নি! হলে অবশ্য মন্দ হয় না।

ডাক্তারের ঘাড়ে সেই যে গভীর রাত্রে চাঁদনিরাতের পেত্‌নি পিসি হয়ে চেপে বসলুম, সার্কিট হাউসে, যাবার আর চেষ্টাই করলুম না,

কেননা সেটা একটা উঁচু শৈলচূড়ায় একলা বসে আছে। সেখানে বন্ধু পাব কোথায়? বাহাদুর ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছে—"এক হফ্‌তা তো ঠাহ্‌রিয়ে, মেমসাব? ইধরপে কোঈ মেহমান নেহী আতা—"শুনে শুনে ডাক্তারও মনে বল পেয়ে এখন বলছে—"নো পয়েণ্ট ইন ইওর মুভিং আউট, নাউ দ্যাট আই হ্যাড বড়োড দ্য বেডিং"—

আমিই বা আর আপত্তি করি কেন? অসুবিধে কিছু তো নেই, বরং একটা ভাল বন্ধু পেয়েছি। লাজুক, কিন্তু মানুষটা মোটেই খারাপ নয় ডাক্তার। তা না হ'লে আমাকে দুপুরের আগেই আরও চারজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়? ডাক্তার কর, যাঁর বাড়ি থেকে বিছানা ধার করা হয়েছে, আর ডাক্তার মহান্তি, এঁরা দুজনে উড়িষ্যার, ডাক্তার গুপ্তা বিহারের।

ডাঃ করের বাড়িতেই লাঞ্চ্‌ খেলুম, ওঁর স্ত্রীর রান্না ট্রাউট মাছের ঝোল, ডাল, ভাত, আলুভাজা। খুব ভাল লাগলো।

লাঞ্চের পর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে যার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল ডাঃ লালওয়ানী, সেটি একটি "সারপ্রাইজ"। সেই প্রায়-কিশোরী মেডিকাল অফিসারটি ডাঃ স্বপ্না চৌধুরী, সদ্য পাশ করা বাঙালী মেয়ে। স্বপ্না তার কোয়ার্টারে আমাদের ধরে নিয়ে গেল, সেখানে বিধবা মায়ের সঙ্গে থাকে সে। ছিম্‌ছাম্‌ সংসারটি দেখে খুবই ভাল লাগলো। পুত্র-সন্তানের কাজ করছে মেয়ে। এই পাণ্ডববর্জিত দুর্গম প্রবাসে জেনারেল হসপিটালের জাঁদরেল মেডিকাল অফিসার কে? না, একটি অবিবাহিতা ছেলেমানুষ বাঙালী মেয়ে। ওর মায়ের হয়ে আমারই তো গর্বে ছাতি দশহাত! স্বজনশূণ্য দেশে অবশ্য ওঁদের স্বাভাবিক ভাবেই মন বসছেনা, বদলির অপেক্ষায় আছেন। স্বপ্নাকে দেখে আমি যত না অবাক,

র‍্যাশনট্রাকে চড়ে বিনা প্রয়োজনে বিনা পরিচিতিতে এমন হুট্ করে আমি তাওয়াং চলে এসেছি বলে, স্বপ্না এবং তার মা ততোধিক অবাক। এমনও করে মানুষ? চাকরি বাকরিতে নয়, কাজেকর্মে নয়, শুধু শুধুই?

হ্যালো, মিসেস লালওয়ানী

ডাক্তার চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতেও নিয়ে গেলেন, এবং আরও কয়েকজন হোমরা চোমরা অফিসারের বাড়িতে। এই ঘোরাঘুরির সময়ে রাস্তায় একটা জীপ দাঁড়ালো।

—ডাক্তার! হ্যাল্লো! তাই বল, এই জন্যে দেশে গিয়েছিলে? মিসেস লালওয়ানীকে আনতে? হ্যাল্লো, হ্যাল্লো! ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে চেঁচাতে লাফাতে লাফাতে এক ব্যক্তি নামলেন জীপ থেকে। পাহাড়ী চেহারা। খাকি পোশাক, শোলার হ্যাট, মিলিটারি নন। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

—হ্যালো! প্লীজড টু মীট ইউ। আমি কিন্তু মিসেস লালওয়ানী নই। আমি ডক্টর সেন। আপনি?

—দুঃখিত। দুঃখিত। আমি দেউরি। আমি ভেবেছিলুম—

—আপনিই প্রথম নন, অনেকেই এখানে এরকম ভেবেছেন—তাতে কিছু না। ডক্টর লালওয়ানী কিছু মনে না করলেই হল!

—আমাদের এ-ডি-সি, ডাক্তার সসম্ভ্রমে বলে। —আমার মুখে বোধহয় একটা প্রশ্নচিহ্ন ফুটেছিল—যার উত্তরে ফিসফিস করে "অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনর"—জীপের পিছন থেকে কেউ একজন

বলেন। তারপর "নমস্কার, আমি সুভাষরঞ্জন ঘোষ। এখানে অ্যাগ্রি-কালচারাল অফিসার।"

তারপরেই দেউরিকে আমি বলছি শুনতে পেলুম—"আমাকে একটা জীপ দিতে পারেন? তাওয়াং গুম্ফা দেখতে যাব? আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি—গাড়ি ছাড়া তো যাওয়া যাবে না"—

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়, গাড়ি দেব বইকি ডক্টর সেন, আপনি আগে চলুন আমাদের অফিসে একটু চা-টা খাবেন"—তক্ষুনি সেই জীপেই তুলে নিলেন মিস্টার দেউরি আমাদের।

চমৎকার মানুষ। নিজে অরুণাচলের ঐ অঞ্চলেরই ট্রাইবাল মানুষ। আই. এ. এস. অফিসার। চমৎকার অফিস তাঁর, আধুনিক সরঞ্জামে সাজানো। যেতেই একটি সুন্দরী সারমেয়ী এসে দেউরিকে আদর অভ্যর্থনা করলে। —"কী সুন্দর কুকুর!"

—"আমাদের পাহারাদার। নাইট ওয়াচম্যান। সম্প্রতি আটটি সন্তানের মা হয়ে ব্যতিব্যস্ত আছেন, এই যা। প্রচণ্ড পাওয়ারফুল ওয়াচ্‌ডগ।"

—"আটটা? আমি একটা নিয়ে যাব?"

—"নিশ্চয়ই। কোন্‌টা চাই? ওদের নিয়ে এস তো"—মুহূর্তেই আটটি তুলোর বল এনে সেপাইরা অফিসের কার্পেটের ওপরে ছেড়ে দিলে। যেটি সবচেয়ে মোটা অথচ সবচেয়ে চঞ্চল আমি সেটাই বাছলুম। আজকে তো নয়, সেই যাবার দিনে নিয়ে যাব। ততদিন মার কাছে থাক।

—"গুম্ফা দেখাতে ডক্টর সেনকে কে নিয়ে যাবে? ঘোষ সাহেব?" সেটাই ঠিক হল।

তাওয়াং গুম্ফা

আমি তো ইতিহাস লিখতে বসিনি। তাওয়াং গুম্ফার কথা নানা জায়গায়ই আছে। আলাদা করে বলবার মতন কিছু বিশেষ জ্ঞান আমার নেই। লে-লাদাখের গুম্ফাও শুনেছি নাকি এই রকমই। বিরাট ব্যাপার। বাইরে দিকে বহু জনবসত্ পাথরের ঘরবাড়ি, কেল্লার মতন দেওয়ালের ভেতরে গুম্ফার চত্বর। চত্বরে খুব দীর্ঘ একটা খুঁটি, সারাগা উজ্জ্বল নানারঙে রং করা, তাতে মস্ত নিশান উড়ছে। দেয়ালের বাইরে দিকে একজায়গায় বহু খুঁটির জঙ্গল, তাতে বহু শাদা নিশান। শুনলুম আত্মাদের শান্তির জন্যে আত্মীয়রা ওগুলো দান করে। গুম্ফার বাইরে বিরাট ঘণ্টা ঝুলছে। ভেতরে অনেক তরুণ লামা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছে। আশ্চর্য একটা উদাত্ত সুর। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেও পবিত্র গুম্ফা ঘরে ঢোকার আগে লাফিয়ে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজিয়ে ঢুকছে।

ভিতরে নানাবয়েসের ছাত্র-লামার পড়াশুনো চলছে। আট থেকে আঠারো তো বটেই।

গোলমাল বাধলো প্রধান গুম্ফার ভিতরে ঢুকে, বুদ্ধমূর্তি দেখতে গিয়ে। মূল বৃহৎ ঘরটির মধ্যে আরেকটা ছোট ঘর। সেখানে কাচের দেওয়ালের ওপাশে 'ঠাকুর' আছে। অর্থাৎ বুদ্ধমূর্তি। মস্তবড় একটি ঘৃতপ্রদীপ জ্বলছে, প্রদীপটা পিতলের বোধহয়, দেখতে সোনারই মতন। —সুভাষবাবু বল্লেন—"পিওর চওঁরীঘিউ।" একটি প্রকাণ্ড রূপোর বাটিতে জল রাখা। কিন্তু ঠাকুর কৈ? বেদীর ওপরে পদ্মাসনে বসা দুটি

শ্রীচরণ। তারই সামনে ধূপ, দীপ, জল। উঁকিঝুঁকি মেরে বুদ্ধমূর্তির বাকীটা দেখা গেলনা। সুভাষবাবু বললেন—"সিঁড়ি দিয়ে, বাকীটা সিঁড়ি দিয়ে।"—দোতলার উঠে ভয়ে ভয়ে দেখি ঐযে বরাভয়ের মুদ্রায় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত। স্কন্ধকাটা মূর্তি। মন ভরল না।

আবার সিঁড়ি।

সত্যি সত্যি দুটি শব্দের অর্থ এমনভাবে মর্মে মর্মে বুঝিনি আগে। —একটা হল "ক্রমশ প্রকাশ্য", আর অন্যটা—"আপাদমস্তক"। তাওয়াং গুম্ফার বুদ্ধ এই দুটি শব্দেরই মূর্তিমান মর্মার্থ। তাঁর পা থেকে মাথা অবধি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেল। সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে দেখতে পেলাম তাঁর প্রসন্ন হাসি আর অর্ধনিমীলিত চোখ।

ত্রিশচল্লিশফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তি সিংহলেও দেখেছি, কিন্তু সেই সব মূর্তি খোলা আকাশের নিচে। শ্রবণবেলগোলার জৈন মহাবীরের দীর্ঘ মূর্তিটিও এমন গুম্ফাঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে নেই। একতলায় পা, তিনতলায় মাথা বললে ব্রহ্মদৈত্যের কথাই মনে পড়ে, বুদ্ধমূর্তির কথা নয়। এভাবে দ্বিতল-ত্রিতলের গৃহ-স্থ ঘরোয়া হিসেবে ঐসব মূর্তি তো ধরা পড়ে না। নাঃ এভাবে দেখে সুখ নেই।

মন ভরল না। মূর্তির বিরাটত্ব তো হাড়ে হাড়ে টের পেলুম, কিন্তু কৈ, মর্মে মর্মে শিহরণ তো উঠল না? প্রতিবার সিঁড়ি ভাঙবার সময়ে যে একটু একটু করে মনটাও ভেঙে ভেঙে যায়। এই বিশাল পিতল প্রতিমাটি যদি একটু দূর থেকে দর্শকের সামনে এক নজরেই উদ্ভাসিত হ'ত পরিপূর্ণভাবে, তার প্রতিক্রিয়া হত অনেক বেশি।

চীনে যাইনি। কিন্তু জাপানে দেখেছি তো, কিরোটোতে ও নারুতে বিরাট বিরাট বুদ্ধমূর্তিগুলি মন্দিরের ভিতরেই—। মস্ত উঁচু ছাদের নিচে

বিশাল ঘরে, দর্শককে একনজরেই দেখা দেয় সেই মহান্ মূর্ত প্রতিমা, আর তার ফলও হয় শ্বাসরোধকারী।

এই গুম্ফার মূল ঘরটিও খুবই বড়ো, কিন্তু জানিনা কেন বুদ্ধমূর্তিটিকে রাখা হয়েছে এমন আলাদা একটা খুপ্‌রির মধ্যে বাক্স বন্দী করে। কিসের এত সতর্কতা। লিফ্‌টের জন্য তৈরি ঘরের মত সরু লম্বা একটা ফাঁক তৈরি করে তার মধ্যে মাপে মাপে বসানো আছে এই মূর্তি। কিন্তু এই টুকরো টুকরো দেখায়, পায়ের পরে হাত, হাতের পরে মাথা,—এতে অখণ্ড দর্শনের তৃপ্তি কই? এ তো কমিক ষ্ট্রীপের মতন দেবদর্শন। দেখলুম বটে, কিন্তু না-দেখারই মতো। একটা অপূর্ণতা, একটা খিদে-তেষ্টা রয়েই গেল।

আমি আগে বুঝতুম না সব সাহিত্যেই প্রেমিকরা তাদের ভালোবাসার নারীকে পূর্ণ নগ্নতায় দেখতে চায় কেন? আজ তাওয়াংয়ের বুদ্ধমূর্তির খণ্ড খণ্ড দর্শনে বুঝতে পারি, পোশাক আশাকের ফাঁকে ফাঁকে ভালোবাসার মানুষটিকে দেখা যায় না। ও দেখায় 'দর্শন' নেই।

একদিকে কাচের আলমারির মধ্যে সহস্র বুদ্ধমূর্তি, (বোধহয় পেতলেরই, কিন্তু) বলল তো সোনার। তারপর দেখলুম, সেই অসামান্য গ্রন্থাগার। সারাজীবনে পুঁথি এমনিতেই দেখেছি দু'চারটে মাত্র! এখানে দু'হাজারের বেশি বৌদ্ধ পুথি এমনিতেই দেখেছি দু'চারটে মাত্র। এখানে দু'হাজারের বেশি বৌদ্ধ পুঁথি রাখা আছে। প্রত্যেকটি হলদে কাপড়ে জড়ানো, দড়ি দিয়ে বাঁধা। যত্ন করে তাকে সাজানো। নিয়মিত ঝাড়া মোছা হয়। আমাদের কোনো আধুনিক গ্রন্থাগারের stack এর মতন দুরবস্থা নয় তাদের। এসব বই পড়বার সৌভাগ্য আমার নেই। আমার মাষ্টারমশাই স্যার হ্যারল্‌ড বেইলি এখানে এলে,

তাঁর আহ্লাদের অন্ত থাকত না। তিনি এর মর্মোদ্ধার করতে পারতেন।

সুভাষবাবু বলছিলেন অরুণাচলে গ্রামে গ্রামে গুম্ফা আছে, আর গ্রাম্য গুম্ফাগুলোতেও গ্রন্থাগার আছে। সেইসব আর্কাইভ্‌স্‌ মোটে ঘাঁটাই হয়নি। সেখানে ঐতিহাসিকদের অনেক মালমশলা মজুত। স্থানীয় ইতিহাস সেখানে জমা আছে। ইংরেজরাও এদের ঘাঁটায়নি, চীনেরাও লুটে পুটে নেয়নি। সবই এখনও রয়েছে। গবেষকরা কেউ সেগুলো ব্যবহার করেন না। বুঝতে পারি, সেখানে অজস্র মিথ্‌ পাওয়া যাবে। অনেক হীরেমুক্তো, অনেক ফোকলোর। শুধু তো ওতে রাজামন্ত্রী আর লামাদের ইতিহাসই নেই। কিন্তু তার প্রস্তুতি আমার কোথায়? অপ্রস্তুত অবস্থায় গিয়ে পড়েছি, কিছুই কাজে লাগাতে পারলুম না। কিন্তু খুব ইচ্ছে হল একটা গ্রামে গিয়ে মোম্পা উপজাতির কোনো পরিবারের সঙ্গে থাকি।

যেই মনে হল, অমনি সেটা সুভাষবাবুর কাছে পেশ করলুম। হাসিমুখে উনি বললেন—"অসম্ভব হবে কেন? দেখি চেষ্টা করে। ভাবতে দিন একটু।"

আনি-গুম্ফা

দূরে পাহাড়ের মাথায় আরেকটা শাদা গুম্ফা দেখা যায়। ওটা কী?

—"ওটা আনি-গুম্ফা। অনেকটা পথ খচ্চরের পিঠে চড়ে যেতে হবে। গাড়ি যায় না। হাঁটতেও, চড়াই তো, পারবেন না।"

—"আনি-গুম্ফা আবার কী? নেহরু-গুম্ফার মতন? কারুর নামে?"

—"না, আনি হলো সন্ন্যাসিনী। আনি-গুম্ফা সন্ন্যাসিনীদের মঠ।

সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। নানারি আর কি। ভারতবর্ষে মাত্র দুটি আছে। এই তাওয়াঙে একটা, আর ধরমশালায় একটি, দালাই লামা যেখানে। খুব রেয়ার জিনিস। ক'দিন যদি থাকেন, খচ্চর ঠিক করে, আপনাকে পাঠিয়ে দেব ইয়েশির সঙ্গে।"

—"ইয়েশি কে ?"

—"একজন আনি। আমাদের বন্ধু। হিন্দি জানে। তাওয়াঙেরই মেয়ে। এখন এসেছে।"

—"সত্যি ? তার সঙ্গে আলাপ হয় না ?"

—"কেন হবে না ? আজই আলাপ করিয়ে দেব'খন। এই তো, পাশেই শিউ-বসতিতে ওদের বাড়ি। ওর বাবা মা এখানে আছে। বস্তি মানে কিন্তু স্লাম্ নয়, বসতি।"—

ফেরার সময়ে আলাপ করে এলুম শিউবস্তিতে গিয়ে ইয়েশি আনির সঙ্গে। সে আমাদের লাঞ্চে নেমন্তন্ন করলো পরদিন। নিশ্চয় যাব, নিশ্চয় যাব। কী সুন্দরী মেয়েটা ! বছর উনিশকুড়ি বয়েস। ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলতে পারে, ভাঙা ভাঙা ইংরিজিও।—"আমরা ফিমেল মাংক" ইয়েশি একগাল হেসে বলল—"আমাদের পাপ করতে নেই। মেয়েদের এমনিতেই অনেক পাপ হয়, আনি হয়ে পাপকর্ম করলে আরো বেশি বেশি পাপ হয়ে যায়।" একেবারে শিশুর হাসি তার মুখে। সাত ভাইবোনের সবচেয়ে বড় মা বাবা তাকে আনি করে দিয়েছে। এতে তারও পুণ্য, তার বাবা মায়েরও পুণ্য। তিন ছেলে হলে, মেজ ছেলেকে লামা করতেই হয়, গুম্ফাতে পাঠানো আইন। মেয়েদের বেলা কোনো আইন নেই। ইচ্ছে, শখ হোলো, তো আনি হোলো। বহু সন্ন্যাসিনী আছে, বাচ্চা মেয়েরাও হতে পারে। ইয়েশি পনেরো বছর বয়সে

গুম্ফাতে গেছে, এখন তার বয়েস কুড়ি।

—"সকালে উঠে কী করো মঠে ?"

—"পুজো করি। পুজো করতে হয়। ঘুম থেকে উঠে ঝাঁটপাট দিয়ে ধূপ জ্বেলে, বুদ্ধকে রূপোর বাটিতে পুজোর পানি দিয়ে, চা খাই। তারপর পুজো করি। যেদিন বেশি বেশি কাজ থাকে, সেদিন পুজোটা কম কম করি। পুজো করে নাস্তা খাই। কভি রোটি, কভি জাউ, কভি হালুয়া। বস্তিতে এসে র‍্যাশন নিয়ে যাই, উদূখলে আটা ভাঙি, কাজ কি কম ? সন্ন্যাসিনীদের অনেক কাজ।

পয়সা ? না আমাদের পয়সা নেই। পয়সা অন্য লোকেরা দেয়। যখন বাড়ি যাই, বাড়ি থেকেও পয়সা দেয়। চল্লিশজন আনি থাকি গুম্ফাতে। পনেরো দিন অন্তর তিনচার জনে মিলে রান্না করি। সুবা-শ্যাম পূজা করি। পড়াশুনোও করি। পাঁচছ'টি ছোটা-আনিকে এক একজন বড়া-আনি বসিয়ে তিব্বতী ভাষা শেখায়। পুঁথি পড়তে শেখায়। সারাদিন পড়াশুনো হয় তাদের। হেড-আনি আছেন একজন। চাবী থাকে তার কাছে। ধর্মগ্রন্থের চাবী। এ ছাড়া আর চাবী দেবার কী আছে আনিদের ?

অবশ্য হ্যাঁ, জীবনে আনিদের অনেক কিছু 'মনা হ্যায়।' যেমন—'ঝুট নাহি বোলনা, চোরী নাহি কর্‌না, শাদী নাহি কর্‌না, প্যার নাহি কর্‌না, আদমীকা সাথ কুছ্‌ নাহি কর্‌না, বাত-উত্‌ কুছ্‌বি নাহি! কিসিকা সাথ বাত কর্‌না, ঘুম্‌না ফির্‌না, তো বদনাম হো জায়েগা প্যার কর্‌ লিয়া বোলকে। তব্‌ভি কোঈ কোঈ আনি ভাগ্‌ যাতা, কিসিকো মিল্‌ গয়া, তো গুম্ফা ছোড়কে ভাগতা, শাদী কর্‌ লেতা।' ফাইন দিতে হয় অবশ্য, আনি-লামাদেয় 'চায় খিলানা পড়তা'।

যারা পালায় না, তিনচার বছর সন্ন্যাস নেবার পরে ভালো করে

একটা পুজো হয় হাজার/পাঁচশো/দুশো/একশো যে যেমন পারে, আত্মীয়-স্বজন গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে পুজো দেয়। তারপরে সে ভালরকম সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হয়ে যায়।"

তিন শত্তুর

এই সব গল্পগুজব হচ্ছিল শিউ-বস্তির সীমানায় এক তিব্বতী চা-দোকানে। তিব্বতী নমক্-চায় খেতে খেতে। ডাক্তারের সঙ্গে কাল তাওয়াঙে এখানে ওখানে ঘোরবার সময়েও চা-ঘরে ঢুকে চা খেয়েছি। তখনই শিক্ষাটা পেয়েছি, তিব্বতী "টী-সেরেমনি"টা কেমনধারা। গোল কালোরঙের কাঠের সুদৃশ্য বাটির ধারে ধারে পেতলে আর তামার পাত বসানো ও পুঁতির রঙীন কারুকার্য। চায়ের স্বাদ অনাস্বাদিতপূর্ব।

আমি ধাবার চা খেয়েছি, এক ফুট্ দু' ফুট, হ'তে হ'তে গজের চা—(ছোট করে' কড়া করে'), চীনে-চা খেয়েছি, যূঁইফুলের গন্ধ ভাসানো, জাপানী চা খেয়েছি, হাঁটুমুড়ে বসে, দু'হাতে বাটি ধরে, সবুজ রং, বুনো গন্ধ, খেতেও (যতই কায়দা করে পরিবেশন করুক) বন্য। কুম্ভমেলায় সাধুর তৈরি প্রসাদী চা-ও খেয়েছি, এলাচ-দারচিনির গন্ধে, মালাইয়ের স্বাদে, পায়েস-পায়েস। কিন্তু তিব্বতী চায়ের তুলনা হয়না। মুখে ছুঁইয়েই চমক লাগলো। মনে হলো কেউ আমার সঙ্গে ঘোর বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। কান্নাই পেয়ে গেল। এত বীভৎস স্বাদের চা নিজে তৈরি করে খেলেও হয়না। আমিই বিশ্বের নিকৃষ্টতম চা-কর বলে জানতুম। কিন্তু গোটা তিব্বতী জাতটা আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। স্বেচ্ছায়, পূর্ণ সচেতন প্রয়াসে কেউ কখনও এমন একটা পানীয়

প্রস্তুত করতে পারে ?

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের রুচির ওপরেও ঘেন্না এসে গেল। গল্প শুনেছিলুম তিব্বতে রেকর্ডেড প্রথম বাংলা শব্দগুলি হচ্ছে—"ভাল, ভাল, খুব ভাল।" এই শব্দগুলি উচ্চারণ করেছিলেন অতীশ দীপঙ্কর জীবনের প্রথম পাত্র তিব্বতী চা পান করবার পরে। হায়, একজন বাঙালী হয়ে এই স্বাদজ্ঞান ?

ঘোর নোন্‌তা। ঘী-দেওয়া, আঁশটে গন্ধ, তেল-ভাসানো,—অ্যাঃ—মুখে দিয়েই সত্যি সত্যি গা গুলিয়ে বমি এসে যায়। অনেকটাই অবশ্য আশাতীতের ধাক্কা! খাওয়া ভীষণ মুশকিল। অথচ, ডাক্তার বললো, চা শেষ করতেই হবে। ফেলে দেওয়া অপমান। এমনকি দোকানেও। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি গোলাপ জলের ঝারির মতন গড়নের, মস্ত বড়ো কুঁজোটাইপ চা-দানি। তার থেকে চা ঢেলে দিচ্ছে একটি রূপসী, দুর্গন্ধময়ী তরুণী, ভুবনমোহিনী তার হাসিটি। ভাষা বুঝিনা কেউ কারুর। প্রতিবার চা ঢেলে কুঁজোটি ঠক্ করে মাটিতে নামিয়ে রাখছে। তারপর আবার তুলে কাপে দিচ্ছে। এরকমই নিয়ম। জগতের যাবতীয় বীরত্বপূর্ণ কর্তব্যনিষ্ঠা, দুঃসাহসিক কাজকর্মের কথা স্মরণ করতে-করতে ক্যাসাবিয়াংকার পদ্য মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে যেই বাটিটি খালি করেছি, অমনি পেটের মধ্যে প্রচণ্ড গুলিয়ে উঠেছে। আপ্রাণ মনোবলে সেটা দমন করেছি,—অমনি মিষ্টি মিষ্টি হেসে, আবার আমার চায়ের শূন্য বাটি পরিপূর্ণ করে দিল মেয়েটি! এই অমানুষিক দৃশ্যে আমার সত্যি কান্না পেয়ে গেল এবারে। ডাক্তার সহানুভূতির সঙ্গে আস্তে আস্তে বললে—"উপায় নেই। তিনবার খেতেই হবে। নিয়ম। এরা কিন্তু ভীষণ রিচুয়ালবাদী, নিয়মমাফিক চলে। কষ্ট করেও খেয়ে নিন। খারাপ তো কিছু না। শরীরের পক্ষে ভালই। চমরী গাইয়ের মাখন

ওতে আছে, চমরীর দুধ আছে, নুন, আর চা। আছে তো এই! খেয়েই ফেলুন। যে দেশের যা! ফেলা চলবে না কিনা? তাহলে ট্রাইবালরা অপমানিত হবে।" দ্বিতীয় বাটি শেষ হ'তে না হ'তে তৃতীয় বাটি। তৃতীয় বাটি শেষ করতে এক ঘণ্টার ওপর লাগলো। সঙ্গে ছিল অবশ্য একরকম শুকনো নিমকি, তেল-তেলে জিলিপি, আর বিস্কুট। সেইসব দিয়েই ব্রেকফাস্ট সেরেছিলুম তাওয়াংয়ের প্রথম প্রভাতে। সেই প্রথম নমক্-চা খেতে শিখলুম। এফটা ফুটদুয়েক লম্বা-মতন কাঠের উদূখলের ভেতরে মেড়ে মেড়ে ওই চা তৈরি হয়। সেটা দেখতে ভারী সুশ্রী যন্ত্র।

কে বলবে তার গর্ভ থেকে অমন দুর্দান্ত বিস্বাদ বস্তু বেরুবে?

যাই হোক শিউ-বস্তির এই চা-দোকানে আর বোকা বনিনি। দিব্যি খেতে লাগলুম প্রথম কাপটি। কিন্তু ফুরিয়ে যেতেই ভয়-ভয় করতে লাগলো। "ও বাবা! আরো দু' কাপ বাকী!" বলে ফেলতেই সুভাষ-বাবু হাসতে হাসতে বল্লেন—"কায়দাটা শিখে নিন! খানিকটা খেয়ে, কাপটাকে মাটিতে নামিয়ে রাখবেন। তাহলেই ওরা বাটিটা ভরে দেবে। আবার খানিকটা খেয়ে, ফের মাটিতে বাটি রেখে দেবেন। ওরা আরেকবার ভরে দেবে। তাহলে এই দেড়বাটিতেই তিনবার পরিবেশনের কাজটা মিটে যাবে। রিচুয়ালও রইল, পেটও রক্ষে পেলে। তবে কি দু' একদিনের মধ্যেই অভ্যেস হয়ে যাবে। আর বিস্বাদও লাগবে না, চমরী-ঘিয়ের জন্যেই ঐ আঁশটে গন্ধটা হয়। আমার তো এখন তিব্বতী চা খেতে বেশ ভালই লাগে।"

—"আপনি হাফ্‌তিব্বতীই হয়ে গেছেন বোধহয়, দশবছর এই তিব্বতে থেকে।"

"—সর্বনাশ! তিব্বত বলবেন না ম্যাডাম, দিস্ ইজ ইনডিয়া! দেখছেন না চতুর্দিকে কেমন 'আওয়ার ইণ্ডিয়া' পোস্টার মারা?

—"আমরা ভারতীয় বলে গর্বিত' প্ল্যাকার্ড টাঙানো? কলকাতায় কখনো এসব দেখেছেন? কিম্বা দিল্লিতে?"

—"কিন্তু দেশটা যে তিব্বত তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? মানুষগুলো তিব্বতী উপজাতি, তাদের ভাষা তিব্বতী, তাদের খাওয়া দাওয়া, পোশাক আসাক, ধর্মকর্ম, সবই তিব্বতী, মায় কুকুর বেড়াল গরু ছাগলগুলো পর্যন্ত তিব্বতী, টিবেটান হাউন্ড, লাসা আপসো, আর ইয়াক্—তবু বলবেন এটা তিব্বত নয়?"

—"জ্বালালেন ম্যাডাম আপনি! কবিতা ফবিতা লেখেন, না জানেন পলিটিকস, না জানেন হিস্ট্রি, না অ্যানথ্রপলজি—তিব্বতী কালচার মানেই যে তিব্বত নয়, এটাও বোঝেন না? জলপাইগুড়ি তো আঠারো শো ষাট সত্তর পর্যন্ত ভূটানের অন্তর্গত ছিল। তা বলে কি ওটা ভূটান? দার্জিলিং তো তার বিশ ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত সিকিমের অংশ ছিল, তাবলে কি দার্জিলিং এখন সিকিমে? যে তাওয়াং হবে তিব্বতে? চীনেরা যে কথা বলে, আপনিও, সেই কথা বলবেন?"

সত্যি, বড্ডই মুখ্যুর মতন কথাবার্তা বলছি।

—"আচ্ছা, চীনেদের আপনি দেখেছিলেন?"

—"কী করে দেখব? আমি তো সাতষট্টিতে এলাম। তবে যে-পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল, চীনেদের তৈরি সেই পথটা দেখেছি! লাসা-

তাওয়াং রোড। দশদিনের মধ্যে ব্যাটা চীনেরা আশ্চর্য রাস্তা বানিয়েছে, সত্যি। এত বছর, পনেরো বছর তো মেইনটেনাসের নামগন্ধ নেই। তবুও একদম ঠিকঠাক আছে। জীপ যেতে কোনোই অসুবিধে হয়না।"

ঐ পথেই কিছুদূর গেলে, মানস সরোবরে রাস্তা। অপূর্ব এরিয়া, জানেন? মাইল দশেক পর্যন্ত যাওয়া যায়, কেউ কোনো বাধা দেয় না, এ. ডি সির পারমিশন নিয়ে পিকনিকে গিয়েছিলাম। অদ্ভুত একটা নীল পদ্মতারা দীঘি আছে। কত হাঁস। এই রাস্তা থেকেই মাইল কয়েক ভিতরদিকে গেলেই কৈলাস, মানস সরোবর।" বলেন কি? এইখানেই? এত কাছে?—মানস? কৈলাস? বাঃ! অমনি, "আমিও যাব, আমিও যাব" করে ভয়ানক ঝুলোঝুলি সুরু করলুম। তাতে যখন হলো না, তখন—"চুপি চুপি চলুন যাই" বলেও অনেক গূঢ় চেষ্টাচরিত্র করলুম। কিন্তু নো লাক্। অনড় হয়ে সুভাষরঞ্জন বললেন:—"অমন হট করে হয়না। পারমিশান চাই।" তবু দয়া করে খানিকটা আমাকে ঘুরিয়ে আনলেন ওই স্বপ্নের রাস্তাটার পাশ দিয়ে। অনেকখানি উঁচুতে সোজা পরিষ্কার, চওড়া রাস্তা চলে গেছে উত্তর পশ্চিমে। এক্কেবারে কৈলাস, মানস সরোবর পার হয়ে সেই লাসানগরীর চির-রহস্যের আড়ালে। আর ঐখানেই সেই অধরা মাধুরী—ম্যাকমাহন লাইন।

—"লাসা-তাওয়াং রোড?" মিস্টার সাইগল বললেন, "এঞ্জিনিরারিংয়ের একটা অসামান্য উদাহরণ।"

ওখানকার চীফ এঞ্জিনিয়ার মিস্টার সাইগলের বাড়িতেই পরোটা সব্জী খেতে খেতে রাত্তিরবেলা গল্প হচ্ছিল। ছেলেদের মধ্যে তাস আর রাম্‌ও চলছিল, চওড়া তক্তাপোশের ওপরে। সাইগলদের বাচ্চাদুটি তারই এক ধারে। শুচ্ছেনা কিছুতেই, আড়চোখে তাকাচ্ছে, হাসছে।

খালি দুষ্টুমি করছে। তাওয়াং-এই ইশকুলে পড়ে তারা। মিসেস সাইগলের ইচ্ছে, বড় হলে কোনো ভালো বোর্ডিংয়ে দেওয়া ওদের।

—"লাসা-তাওয়াং রোড তো একটা মেয়ের তৈরি"—মিসেস সাইগল বলেন।

—"সেকি ? সত্যি ?"

—"হ্যাঁ, ছাব্বিশ বছর বয়স্ক একটি চীনে মেয়ে, আর্মি এঞ্জিনিয়ার। তারই তৈরি এই রাস্তা।"

এঞ্জিনিয়ার সাহেব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।—"চোখে না দেখলে বিশ্বাস হ'তনা যে এই অলটিচ্যুডে এই অ্যাভেলেবল মেটিরিয়াল্‌স দিয়ে এমন রোড বিল্‌ডিং সম্ভবপর। এবং সময়ই বা কত ? দশ দিন। ঐ পথে আসবে কী ? না হেভী ভিহিক্লস। ট্যাংক ইত্যাদি। একটা আশ্চর্য, প্রচণ্ড অ্যাচীভ্‌মেণ্ট এই লাসা-তাওয়াং রোড। লোকাল পাহাড়ীদের কাজে লাগিয়ে পাথর দিয়ে জলা-জমি ভর্তি করেছে। মাটি শক্ত হলে তাতে কাঠের বীম আড়াআড়ি ভাবে, রাইট অ্যাঙ্গেলে ফেলেছে। বীমগুলো সাজিয়েই রাস্তাটা তৈরি করেছে। ঐ সব কাঠ আসবার পথে গাছ কেটে তৈরি করে নিয়েছে, নিজেরাই বয়ে এনে ফেলেছে কেননা এ অঞ্চল তো ট্রীলাইনের ওপরে, এখানে বড় গাছপালা গজায় না। ওদিকের উপত্যকা থেকেই গাছ কেটে বীম বানিয়েছে। সব সেই মেয়ের বুদ্ধি!"

এই সেই বিখ্যাত ম্যাকমাহন লাইন। ৪০০০—১৯০০০ ফুট অলটিচ্যুডে বিস্তৃত এই তাওয়াং বর্ডার সাবডিভিশন্‌, কামেঙ্‌ ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে। পাশেই, লুম্‌লা গ্রামের ওপরে তিব্বত—ভূটান সীমান্ত। সে-লা পাসের ওপাশে আছে বুম্‌লা পাস, সেটাই ভূটানে যাবার রাস্তা। সে-লার

চেয়ে আরও একটু উঁচু। আমার খুবই ইচ্ছে হ'ল, বুম্‌লা গিরিপথে বেড়াতে যাবার, এবং সেখান দিয়ে ভূটানে যাবার—কিন্তু হাতে তো মোটে সময় নেই। ছুটি খতম্‌। কলেজ এবারে খুলে যাবে।

সত্যি সত্যি তো বনের পাখিটি নই আমি; শেকল না থাক, তবু দাঁড়েরই পাখি। খাঁচায় থাকিনা বটে, কিন্তু ফিরে ফিরে যেতেই হয়। সেইখানে যে দানা-পানি বাঁধা আছে! আর, বনের পাখিরও তো বাসা থাকে, বাসাতে লাল টুকটুকে হাঁ-করা ছানারা থাকে। ফিরতে হয় তাকেও।

মুক্তি কখনো নিশ্চয় নয়! আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে। আর আমরা তো তুশ্চু প্রাণী। উড়াল দিই, ফিরেও আসি।

—"তিব্বতী গ্রামে যাবেন বলছিলেন? এই যে লামা পেমা খাণ্ডু, ইচ্ছে করলে এর বাড়িতে থাকতে পারেন গিয়ে। এ হিন্দি বলতে পারে।" সুভাষবাবুর সঙ্গে সুন্দর দেখতে একটি তরুণ লামা আমাকে "নমস্তে" বলছেন।" কথা হয়ে গেল, বিকেলবেলায় ওর ছোট্ট গ্রামে, সাম্‌প্রুং (চমপ্রুং?) যার নাম, জীপ আমাকে নিয়ে যাবে। পেমা খাণ্ডুই আমাকে রিসিভ করবেন সেখানে। এখনই গ্রামে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিতে হবে তাঁকে। বেচারী এ. ডি. সির অফিসে কী কাজে এসেছিলেন, হঠাৎ সুভাষবাবু ওঁকে ধরে ফেলেছেন। এ. ডি. সি. আজ তাওয়াঙে নেই, কাজও উদ্ধার হচ্ছে না। আমি তো মহা উল্লসিত। দুপুরে যাচ্ছি ইয়েশি আনির বাড়ি মধ্যাহ্ন ভোজনে, ডিনার খাব লামা পেমা খাণ্ডুর বাড়িতে। 'তিব্বতী লাইফ' তবু খানিকটা দেখা হবে। লামাদের, আর আনিদের জীবনযাত্রার ধরণ সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা হবে।

এস্. টি. ডি. ! !

শিউ-বস্তিতে, ওদের বাড়ির সামনে ইয়েশি আনি অপেক্ষা করছিল। একমুখ হেসে আমাদের দোতলায় নিয়ে গেল। নিচে একটা বড় ঘর, উপরে একটা ছোট্ট ঘর। সব তিব্বতী বাড়িতেই কেবল এই দুটি ঘর থাকে। নিচেরটি ঘরসংসারের, বসবাসের, উপরেরটি পুজোর। এটাই ছেলেপুলের পড়ার ঘর, বা অতিথি এলে বসানোর।

নিচের ঘরে পুরো সংসার। রান্না খাওয়া শোওয়া বসা। উপরেরটি ছিমছাম। নিভৃত। ছোট্ট দেড়তলার ঘর। ওর বাবা সেখানেই অপেক্ষা করছেন। আমাদের স্বাগত জানালেন, বসালেন। ছোট ছোট ভাই-বোনেরা উঁকিঝুঁকি মেরে যেতে লাগলো। নিমন্ত্রিত তিনজন। ডাক্তার, আমি, আর সুভাষবাবু। সকালে ডাক্তারের ডিউটি ছিল। লাঞ্চে তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে তার 'এস. টি. ডি. ক্লিনিক' থেকে।

—"এস. টি. ডি. ক্লিনিকটা কী বলুন তো? টেলিফোনে তো একটা STD সার্ভিস চালু হয়েছে—এটাও বুঝি টেলিফোনের কিছু?" হটাৎ দেখি ডাক্তার সেই আগের মতন লালচে হতে সুরু করেছে! টুকটুকে লালই হয়ে গেল। ব্যাপার কী?

সুভাষবাবুও কিছু বলছেন না।

তাঁকে অবশ্য কেউ সুভাষবাবু বলেনা, আমিই জোর করে বলছি। সবাই ওঁকে মিস্টার ঘোষ বলেই ডাকে। এখানে ওসব বাবু-ফাবু চলে না। এ হচ্ছে মিলিটারি এরিয়া বলে কথা! এখানে এমনি সিবিলিয়ানদের পুলিশ পর্যন্ত নেই, কেবল সি. আর. পি। হুঁঃ।

তবুও, আমি সুভাষরঞ্জনবাবু বলেই ডাকতে থাকি তাঁকে। একটা যাচ্ছেতাই গেঁয়ো বাঙালিয়ানায় মাঝে মাঝে আমাকে পেয়ে বসে। 'মিষ্টার অমুক' আমার একদম ভাল লাগে না।

—কী ব্যাপার ? এস. টি. ডি. ক্লিনিকটা কী ?

—এটা কি জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়ে গেছে ? কেন ?

—ওটা কি মিলিটারির কোনো সিক্রেট কোড-ফোড নাকি ? থাক তাহলে ! কিন্তু কেউ কিছুই বলছেন না কেন ?……

আমার পরের পর প্রশ্নে উত্ত্যক্ত হয়ে সুভাষবাবু বলেন—"ওটা হল ভিনিরিয়াল ডিজিজের ক্লিনিক।"……

"……অ ! কিন্তু তাকে তো. ভি. ডি. বলে ! তাই না ? এস. টি. ডি. মানেটা কী ?"

—"ডি. ডি. এখন আউট অফ ফ্যাশন। নতুন শব্দটা হচ্ছে সেকশুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ ! এস. টি. ডি"—

একটু গলা খাঁকারি দিয়ে নিয়ে, আর কলারটা সোজা করে, এবার ডাক্তার নিজেই জবাব দেয়। ও হরি, তোমাকে হর্ রোজ এই রোগের চিকিচ্ছে করতে হয়, আর তুমিই কিনা বিনা কারণে লজ্জায় লাল হয়ে যাও, ঘরে একটা ভদ্রমহিলা থাকলে ঘুমুতে পার না ? হায় রে, কোন্ মানুষের কী শাস্তিই হয়েছে, রুজি রোজগারের জন্যে !

কথা চালানোই উচিত। তাই বলি—

—"এখানে বুঝি খুব S.T.D. হয় ?"

—"হয় না আবার ? এখানে চারটেই তো প্রধান রোগ। কৃমি, কুষ্ঠ, ভি. ডি., আর টি. বি.। বড্ড ভোগে এই সব রোগে পাহাড়ীরা।"

—"বাপ্ রে। চারখানাই বেশ জবরদস্ত্। চট্ করে সারবার নয়।"

—"ভি. ডি. টা পেনিসিলিনে, আর টি. বি. টা স্ট্রেপ্টোমাইসিনে—

আজকাল এ দুটো রোগ তবু অনেকটা কণ্ট্রোলে। কৃমি আর কুষ্ঠটা এখনও ঠিক"—

লাক্ষার কারুকার্যকরা ট্রেতে করে কতগুলি চীনেদর্শন বাটিতে গরম গরম শাদা রঙের পানীয় সাজিয়ে আনে ইয়েশি আনি।

—"সিং ছাং", সুভাষবাবু বললেন, "অ্যাপিটাইজার।"

—"মদ ?"

—"ঐ হলো। ওয়াইন মনে করে খেয়ে ফেলুন। হার্মলেস। এখানে বাচ্চারাও খায়, রিচুয়াল ড্রিংক, গা গরম রাখে। চা যেমন। আসলে এক ধরনের ফিলটার্ড বিয়ার আর কি।"

খেতে খারাপ লাগলো না সিং ছাং। বাটি ফুরোলে আবার। এও তিনবার। ডাক্তার আর ঘোষমশাইয়ের তিন কেন, আরও অনেক বারেও আপত্তি ছিল বলে মনে হ'লো না, কিন্তু খাদ্য এসে পড়ল। মোমো আর থুপ্‌পা। সিং ছাংটা গরম গরম খেতে অনেকটা জাপানী "সাকে"র মতো। বেশ সুস্বাদু পানীয়, খুব তীব্র কিছু নয়।

এবার আমার মাথায় একটা ব্যাপার স্ট্রাইক করলো, বিদ্যুচ্চমকের মতো। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নিশ্চয় তিব্বতী চা খেয়ে ঐ প্রশংসা-বাক্যটি বলেননি, বলেছিলেন নির্ঘাৎ ছাং খেয়ে। কিন্তু একে মধ্যবিত্ত বঙ্গসন্তান, তায় মহামান্য পণ্ডিতপ্রবর—তাঁর তো একটা মান সম্মান আছে ? গল্পটা চালানোর সময়ে আমরা বাঙালীরা তাই ছাংটা আর না বলে, চা বলে চালিয়ে দিয়েছি নিশ্চয়ই। অতবড় পণ্ডিত মানুষটি উষ্ণ মদ্যপানে আহ্লাদিত হইয়া বারংবার গদ গদ কণ্ঠে উচ্চ প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এটা শুনতে যেন কেমন-কেমন !

মোমোর ভেতরে চমরীর সেদ্ধ করা মাংসের পুর ভরা, সঙ্গে লংকার চাটনি, থুপ্‌পাতেও শাকসব্জী এবং মাংস, খুবই স্বাদু দুটোই। ওর মা ট্রে করে খাদ্য এনে আমাদের দিতে লাগলেন, বাচ্চারা হাসিমুখে দরজায় উঁকি দিতে লাগলো।

—"ওরা খাবে না ?"

—"ওদের খাওয়া অনেকক্ষণ শেষ।"

ইয়েশির বাবা আমাদের সঙ্গে খাচ্ছেন, কিন্তু ইয়েশি আর তার মা খাচ্ছেন না।

—আপনারা কখন খাবেন ?

—এইবারে খাবো। আপনাদের হয়ে যাক।

ওরা সাতভাইবোন শুনেছি কিন্তু বাড়িতে অতজনকে দেখা গেল না। কেবল গোটা তিন চার অ্যাণ্ডা গেণ্ডা বাচ্চাই ঘুরছে।

—ইয়েশি খুব যুবতী, কিন্তু শিশুর সারল্য ওর চোখে। খুব সীরিয়াসলি পাপপুণ্যের কথা বলে। তখন চোখমুখের চেহারা কি !—

—"আনিরা শাদি করে না কেন ? ইয়েশি ? লামারা তো করে, শুনলুম ?"

—"ছোটা লামারা শাদি করে, লেকিন বড়া লামারা করে না। ওরা কেবল গুম্ফাতেই থাকে। ওদের ঘর নেই। আনিরাও তো গুম্ফাতেই থাকে। গুম্ফায় যারা থাকে তারা কেউ শাদি করে না। আনিদের কুমারী থাকা নিয়ম। আনি শাদি করলে পাপ হয়।"

—"যারা পালিয়ে গিয়ে শাদি করে ? তুমি যে বলেছিলে ? তাদের কী হয় ?"

—"কিছুই না। শুধু ফাইন হয়। গুম্ফায় থাকতে দেয় না আর। গুম্ফার সব আনিদের একদিন—"চায় খিলানা পড়তা।"

আর যা হয়, তা হয় "মরণকা বাদমে।"

—"মরণকা বাদমে আবার কী হয় ?"

—বাঃ। পাপ হবে না ?—"ভগবানকা দেশমে যানা মুশকিল হো যাতা ইসমে।

একদিনকা পাপসে একজনমকা পুণ্য চলা যাতা—মাটির নিচে পোকা হয়েও জন্মাতে হতে পারে। অন্তত, চঁওরীজনম তো লেনাই পড়েগা, সাঁপজনম ভি হো সক্‌তা"—মোটকথা ভয়ঙ্কর সব শাস্তি যে হবেই, ইয়েশির মনে সংশয়মাত্র নেই।

—"গেটোম্পা দেখেছ ?" ইয়েশি আনি আমাকে জিজ্ঞেস করল। —"তাওয়াং গুম্ফায় ?"

—"না তো। গেটোম্পা কাকে বলে ?"

—"গেটোম্পা কাকে বলে ? আটটা বড় বড় বই, যাতে বুদ্ধদেবের জীবনকথা আর উপদেশাবলী আছে। তিনখণ্ড আবার সত্যি সত্যিই সোনার অক্ষরে লেখা। তিব্বতের জিনিস, এই গুম্ফায় আছে। তবে বোধহয় সবাইকে সেসব দেখতে দেয় না।" সুভাষবাবু বলেন।

আসলে তাওয়াং গুম্ফার প্রধান মন্দির ছাড়াও অনেক ছোট খাটো স্তূপ, মন্দির, তান্ত্রিক মূর্তিটুর্তি ওই মন্দির প্রাঙ্গনের চারিপাশে আছে। আমি সেই সব ঘুরে ঘুরে দেখছিলুম। দেখছিলুম ঘুপ্‌চি ঘরগুলো, যেন জেলখানা, ঘিঞ্জি গলিপথ, এক বৃদ্ধা ভিক্ষুনী নুয়ে পড়ে কেমন চত্বরটা ঝাঁট দিচ্ছেন, চশমা চোখে আরেকজন কিছু শস্য ঝাড়ছেন বাছছেন একটা চৌকোমত কুলোয়। ওপাশে শিউবস্তি সুরু হয়েছে। তার অলিগলি, তার ঝর্ণা কলতলা, তার দারিদ্র্য, তার বাসিন্দাদের দোকানপাট, জীবনযাপন।

দুপুরবেলায় তাওয়াং রেডিও স্টেশনে আমার ছোটখাট একটা সাক্ষাৎকার নিলেন একটি যুবক : কেমন লাগলো এই ট্রাকে চড়ে তাওয়াঙে চলে আসা ? আমি কোথায় কী কী পড়াশুনো করেছি ? এখন কী করি ? কী লিখি ? কী পড়ি ? রেডিও স্টেশনটি একটু উঁচুতে, নির্জন পাহাড়ের ওপর। ব্যারাক বাড়ির মতন কাঠের ঘরদোর।

রেডিও থেকে সুভাষবাবু আমায় তাওয়াঙের আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স সেণ্টারে নিয়ে গেলেন, যেখানে মাত্র তিনদিনের জন্যে উদ্বোধন করতে গিয়েই শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় আটকে গিয়েছিলেন তাওয়াঙের টঙে, হপ্তার পর হপ্তা। সেখানে কার্পেট তৈরির কারখানাটাই সত্যি দেখবার মতন। একটাও কার্পেট বিক্রীর জন্যে তৈরি নেই। সবগুলো তাঁতে। সবই বোনা হচ্ছে। সময় নেয়। ফুল লতাপাতা ড্রাগন স্বস্তিকা চড়া রঙের আশ্চর্য চীনে প্রাচীন ডিজাইনের তিব্বতী উলের গালচে। অর্ডার দিয়ে গেলে পাঠিয়ে দেবে। আমি একটা অর্ডার দিয়ে দিলুম। তিনমাস লাগবে বুনতে, যেতে একমাস তো বটেই। (সেই কার্পেট কিন্তু কোনোদিনই এসে পৌঁছয়নি। এসে পৌঁছয়নি, ডাক্তার আর সুভাষবাবুর প্রমিস-করা রঙিন ফোটোগুলিও !)

কার্পেট বোনা ছাড়া, নানারকমের কাঠের কাজও হচ্ছে সেখানে, কাঠের ফুলদানি, আশট্রে, তৈরি হচ্ছে, রং হচ্ছে। চমৎকার ! কালোতে লালেতে সোনাতে সবুজে অদ্ভুত ঝলমলে সব ড্রাগন আঁকা হয়ে যাচ্ছে তাতে। আমি অনেকগুলো নিলুম। প্লেন, না-আঁকাগুলিও ভারী চমৎকার খুবই সুন্দর দেখতে শাদা ধবধবে কাঠ। সুন্দর একটা নমক্‌-চা-তৈরির যন্ত্র কিনতে খুব লোভ হয়েছিল, সুভাষবাবু বারণ করলেন, বললেন 'কাজে তো লাগবে না'। সেটা সত্যি ! কিন্তু গোলাপজলের ঝারির মতন সেই চা-দানিটা পেলে, কিনতুম। ছিল না। 'বুখারী' ছিল

নানা সাইজের, আর আগরবাত্তি। শুনলুম হাতে তৈরি কাগজ এখানকার একটা বিশিষ্ট শিল্প কিন্তু কিনতে পেলুম না কিছুই। কাঠের পাত্রে ছবি আঁকা হচ্ছিল একটি ঘরে। এক বৃদ্ধ-তিব্বতী, আর কয়েকটি বালক-তিব্বতী দিব্যি গোল হয়ে বসেছে রং তুলি নিয়ে। চমৎকৃত হয়ে দেখি রংটা হচ্ছে ক্যামেল, পোস্টার কালার। কাঠের পাত্রগুলি রং করা হচ্ছে প্রথমে তারপর তাতে কোপ্যাল ভার্ণিশ চড়ানো হচ্ছে। যেমন আমরাও করি কলকাতার বাড়িতে। তাওয়াংয়েও এই রং? দেখে মনটন খারাপ! শুনেছিলুম স্থানীয় কায়দায় মাটির-রং তৈরি করে ব্যবহার করাই নিয়ম। সে আর এই এলাহি সরকারী বাণিজ্যিক প্রকল্পে মানলে চলবে কেন? সে গ্রামেই চলে।

উল্টোরথ

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে ডাক্তার আমাকে তার জীপে তুলে নিলে। এবার উল্টোরথের পালা। চলো মুসাফির বাঁধো গাঠোরিয়া। এবার যাত্রা চম্‌প্রুং গ্রামে, যেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে লামা পেম্পা গে (অথবা পেম্পা খাণ্ডু)। সুভাষবাবু বললেন—"আগামী কাল বিকেলেই দেখা হবে"—সব ঠিকঠাক—আমাকে চম্‌প্রুং গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে একেবারে তেজপুরে পৌঁছে দেবেন ওঁরা, অ্যাগ্রিকালচার বিভাগের বাসে। একটা কী মিটিং আছে, ৩/৪ জনে যাচ্ছেন। পথে চম্‌প্রুংয়ে থেমে, আমাকে তুলে নেওয়া খুবই সরলকর্ম। পেম্পা গের গুম্ফা সবাই চেনে।

—"কুকুরছানার" কী হবে?"

—"কিছু ভাববেন না, আমি যাবার সময়ে নিয়ে যাবো। ওকে নিয়ে তো আপনি চমপ্রুং যেতে পারেন না। রাখবেন কোথায়? আপনি তো থাকবেন গুম্ফা ঘরে।"

—"সেটা কী?"

—"এখানে সবার বাড়িতে দুটো করে ঘর থাকে তো? একটা বসবাসের, আর একটা পুজোর। ঐ পুজোর ঘরটাতেই অতিথিদের রাখে। তাই বলছি।"

—"বেশ, তবে আমি আগে চলে যাই, কুকুরছানা পরে আসুক?"

—"তাই কথা রইলো!"

—"ভুলবেন না কিন্তু"—

—সুভাষবাবু হাসলেন,—"চলুন, ডাক্তারের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই।"

বাক্স গুছোচ্ছি, হঠাৎ একপাশে শক্তমতন হাতে কী যেন ঠেকল। কী এতে? ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। বোমা টোমার মতন ঠেকছে! গোলমতন। অমনি হাতড়ে হাতড়ে সব কিছু টেনে বের করে মেঝেয় ঢেলে ফেললুম। বোমা দুটিও বেরিয়ে পড়ল।—

—দুটি মিল্কমেড কনডেন্সড মিল্‌কের টিন। আমার চোখের জল বাঁধ মানলো না। ডাক্তারের লাজুক, অপ্রস্তুত, আলগা, সুদূর স্বভাবের আড়াল থেকে একটা মমতা মাখা উষ্ণতা উঁকি মেরেই লুকিয়ে পড়ে—এখানে সেটা একেবারেই বর্ণচর্মহীনভাবে ধরা দিয়েছে। দুটি কন্‌ডেন্সড মিল্কের টিনে।

যে-রাত্রে এসে পৌঁছুলুম তাওয়াঙে, জাং থেকে ব্র্যাণ্ডি আর কনডেন্সড

মিল্কের টিন কিনে এনেছিল ডাক্তার। সস্তায় পাওয়া যায়, যদি মিলিটারি বন্ধু বান্ধবরা কিনে দেয়। আমি আবার কনডেন্সড মিল্ক চামচ করে চেটে খেতে খুব ভালবাসি। চা করবার জন্য টিন খোলা হতেই আমি বাহাদুরের কাছে এক চামচ চেয়ে নিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছিলুম। ডাক্তার তো হাঁ! এ কী কাণ্ড? ডবল এম. এ., পি. এইচ. ডি., এফ্ আর. এ. এস,—ধেড়ে ধেড়ে দুই মেয়ের গর্ভধারিনী, প্রধানা অতিথি, চেটে চেটে চামচ করে কনডেন্সড মিল্ক খাচ্ছেন? ওর অবাক নজর দেখে লজ্জা পেয়ে গিয়ে আমি বক্‌বক্ শুরু করি—"বুঝলেন, আমি রসগোল্লা, গোলাপজামুনের চেয়েও এটাই বেশি ভালবাসি! যুদ্ধের মধ্যে আমাদের শৈশব কেটেছে তো, তখন থেকেই রুচিটা তৈরি হয়েছে, লোভটা শিকড় গেড়েছে। সত্যি বলতে কি, এটা আমার রাবড়ির মতন লাগে!"

ব্যাখ্যাটা ডাক্তারের মনে ধরল কিনা জানিনা, সে কোনো কথা না বলে টিনটা নিয়ে এসে, আরেকটু ঢেলে দিল আমার চামচে ভর্তি করে।

তারপর এই ক'দিন সত্যি বলতে কি আমি যে মাঝে মাঝে ঘুরেফিরে অল্পস্বল্প কন্‌ডেন্সড মিল্ক চেটে দেখিনি, তা নয়। তবে ডাক্তারের সঙ্গে এ নিয়ে আর কথাবার্তা হয়নি। আজ যাবার সময়ে আমার ব্যাগের মধ্যে আমার অজান্তে দুটো টিন কে যে ভরেছে তা বুঝতে অসুবিধে হলনা। চোখের জলের আর দোষ কি? বাঙ্গালী মা-মাসির সেন্টিমেন্টের শঙ্খঘণ্টা অনাত্মীয় সিন্ধি যুবকের বুকের মধ্যে হঠাৎ বাজতে শুনলে, তার প্রতিধ্বনি আমার বুকেও না বেজে পারে?

বাহাদুর খুবই দুঃখিত। মাত্র তিনদিন? ফের কবে আসবেন? আর আসবেন না? সে কি?…এত কম দিনের জন্যে কেউ এত কষ্ট করে

এত দূর আসে ?

—"হামলোগ তো সম্‌ঝা কি নয়া মেমসাব্‌ ইধরই বদ্‌লি হো কে চলে আয়েঙ্গে। পুরানা মেমসাব কো জাগা মেঁ। চায় দুকানমে এইসাহী বোলতা থা। দেখো নয়া মেমসাব আ গয়া।"

খুব সন্দিগ্ধ হয়ে জিগেশ করি—"পুরানা মেমসাবটি কে ?"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি উত্তর দেয়ঃ—"আমার কেউ না! উনি এখন বদ্‌লি হয়ে গেছেন। এখানে ডি. সি. ছিলেন এতদিন, মিস নিরু নন্দা, আই এ এস, খুবই সৎ ও কর্মঠ মহিলা। সর্বজনপ্রিয় হয়েছিলেন।"

—"অল্পবয়সী মেয়ে। প্রচুর কাজ করেছেন কিন্তু গ্রামে গ্রামে ঘুরে। এখানে পীচফল আর আপেলের চাষ সুরু করেছেন। আলুর চাষটাও খুব এনকারেজ করেছেন। অবশ্য আগেই সুরু হয়েছিল ওটা, আমরাই তো আলু সাপ্লাই করি এখন আপনাদের শেয়ালদার বাজারে, আর কোলড্‌ স্টোরেজে"—তাওয়াং-এর মহামান্য অ্যাগ্রিকালচারাল অফিসার কথা বলছেন, সন্দেহ নেই! কথা যখন আলু আপেল বিষয়ে, তাঁর ফর্সা মুখটিও আপেলের মতোই টুকটুক করছে আহ্লাদে!

—"ওঃ হো—এবারে বুঝেছি, কী জন্যে জামীরীর আই. বি. তে অমন ঠকাঠক্‌ সেলাম, আর "হুজুর মেমসাব", "জী মেমসাব" ট্রিটমেণ্ট্‌ পাচ্ছিলেন আপনি"—

ডাক্তার হঠাৎ স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে—

—"বাহাদুরের বন্ধুদের মতন ওরাও নিশ্চয় ভেবেছে নতুন মেমসাব এলেন পুরানা মেমসাবের জায়গায়, তা নইলে এভাবে কেউ হুকুম করতে পারে ? তক্তা ওঠাও, ড্রইংরুম খোলাও—বাব্বাঃ। সে কি দুর্দান্ত পার্সোনালিটি! আমি তো থ'! অত রাত্রে চৌকিদারকে দিয়ে চা বানিয়েই খেলেন!"

ডাক্তার হঠাৎ চুপ করে যায়। একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ফেলেছে। অথবা, এর পরেই হয়তো তার মনে পড়ে গেছে চামচভর্তি কন্‌ডেন্সড মিল্কের কথাটা! হ্যাঁ, পার্সেনালিটিই বটে একখানা!

আমি অন্য প্রসঙ্গ পাড়ি সুভাষবাবুর কাছে।

—"নিরু নন্দা এখন কোথায়?"

—"দিল্লিতে, 'বসন্ত বিহারে', ওর বাবার কাছে। ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, হুট্ করে কখনো দিল্লি গিয়ে পড়লে ওকে নিশ্চয় আমাদের কথা জানাবেন। বলবেন এখানে সকলেই ওকে ভালবাসে। সম্মান করে। মনে রেখেছে। টেল হার উই মিস্ হার আলট।

শ্রীমতী নিরু নন্দার কাছে আমারও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এই মেয়েটির সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি, কিন্তু তার সুকৃতির সুফল আমি ভোগ করেছি পরিপূর্ণ ভাবে। চম্‌প্রুং গ্রামে, তুন্‌ড্রিলা গ্রামে পাহাড়ী পোম্পাদের মধ্যে "ডি. সি. মেমসাবের" প্রতি যে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা গড়ে উঠেছিল, আরেকজন স্বাধীন মেয়েকে দেখে, সেই ভালোবাসাই তারা আবার উজাড় করে দিয়েছিল বলে মনে হয়। কেননা আমি তো তাদের জন্যে কিছুই করিনি, একেবারেই অপরিচিত। আমাকে তারা যে ভাবে আত্মীয়ের মত আপন করে নিলো, সেটা মোটেই তুচ্ছ নয়। লোকাল মানুষেরা একেবারে চমৎকৃত। এখানে তো বাইরের লোক বেশি আসে না, এরা মোটে মিলতে-মিশতে অভ্যস্ত নয়, তাই বাইরের লোকদের নিয়ে সংশয় বাতিকে ভোগে। কাউকেই চট করে নিজেদের মধ্যে টেনে নেয় না, বিশ্বাস করে না। বাহাদুর আমার সঙ্গে "পুরানা মেমসাব" এর কী যে মিল পেলো জানিনা, নিশ্চয়ই সেই একই কারণে আমি এই স্বজনসুলভ ভালবাসা পেলুম মোম্পাদের

বাড়িতেও।

এটা কেউই ঠিক আশা করেননি। তাওয়াঙে যাঁরা ছিলেন, সেই ভারতীয় অফিসাররা প্রায় সবাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন আমার মোম্পাদের বাড়িতে গিয়ে বাস করবার অন্যায় আবদার শুনে। একটু বিরক্তও বোধহয়। এ আবার কী আধিক্যেতা! ওরা খুব নোংরা, স্নান করে না, গায়ে উকুন, যাচ্ছেতাই খাবার খায়—"ভাববেন না চাইনিজ খেতে দেবে"—(যাদের চা-ই ঐরকম!) তাদের অবস্থাও অত্যন্ত দরিদ্র, তদুপরি আমি ওদের ভাষা জানি না, এবং ওদের সমাজের সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত নই। যদিও তারা জাত হিসেবে চোর জোচ্চোর নয়, এবং খুবই ভদ্র, তবু, এই আব্দারটা ছেড়ে দিয়ে, বরং জীপ নিয়ে, সারাদিন গ্রামে গ্রামে টহল মেরে ঘুরে এলেই তো হয়! কিন্তু আমি কি এইসব কথায় ভিজবার পাত্র? আমার তো পেম্পা খাণ্ডুর সঙ্গে সকালে কথাই হয়ে গেছে। যাব, আজই যাব। বিকেলবেলায়। সাম্‌প্রুং ভিলেজ।

লামার বাড়ির আব্দার

পেম্পা গে সত্যিই রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলো যখন আমাদের জীপগাড়ি পৌঁছোলো। ডাক্তার নেমে আমার বাক্স এবং আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল পেম্পা গের বাড়ি। বেশ একটু উঁচুতে, খানিক সিঁড়ি ভেঙে, পেম্পা গের গুম্ফাঘর। ডাক্তার বসলোনা, জীপ ছেড়ে দিতে হবে।

—"পরে দেখা হবে, চলি!" হঠাৎই পেছন ফেরে ডাক্তার।

—"কবে? কোথায়? কখন? ধন্যবাদ, ভাই শ্যামসুন্দর, অনেক ধন্যবাদ, এমন বিভূঁই-বিদেশে তোমার মতন একটা ভাই না পেলে আমি

কী করতুম ?”

—“আর কাউকে পেয়ে যেতে। তোমার সঙ্গীর অভাব হবে না কোনোকালে।”

—“কালই তো চলে যাচ্ছি”—

—“আবার তো দেখা হবে—টেক কেয়ার, গুডলাক।”

—“কী করে ? কোথায় ?”

—“হবে হবে, কোথাও না কোথাও”—প্রায় দৌড়ে ডাক্তার গিয়ে জীপে উঠল। ঘোরানো পথ দিয়ে জীপ মিলিয়ে গেল উপরের দিকে। আবার কবে দেখা হবে, ডাক্তার ? কোথায় ?

—“এই আমার গুম্ফা। আমিই এর লামা।” পেম্পা বলে হিন্দিতে। —“আমার বড় ছেলেও লামা, তার বয়েস আঠারো—অন্য একটা গ্রামে তার গুম্ফা—ঐ যে দেখা যায়”—দূরে, আরেকটু নিচের দিকে আঙুল দেখালো সে। সাম্‌প্রুং তাওয়াঙের চেয়ে নিচে; এখানে অনেক গাছপালা, ফলের বাগানে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। সামনেই, নীচের ঢালুতে আরেকটি জনবসতি, ঐ যে, সেখানে আরেকটি ছোট গুম্ফার ছাদ দেখা যায়। তাতে গোধূলির আলো লেগেছে।

পেম্পা সগৌরবে বললো ঃ

—“আমার ছেলেই ঐ গুম্ফার লামা।”

গুম্ফাঘরের মধ্যে জমা অন্ধকার লুকোচুরি খেলছে প্রদীপ আর মোমবাতির সঙ্গে। অমন সুন্দর ধূপের গন্ধে প্রণাম করবার ইচ্ছে আপনিই হয় মনে মনে। মেঝেয় পুরু, নরম, চমৎকার কারুকাজ করা কার্পেট পাতা। ভিতরদিকের গর্ভগৃহে ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু তিনি তো একা নন ? পাশাপাশি বেশ ক'জন বীভৎস মূর্তিমান দেবদেবীর

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের সামনে একটি "চওঁরীঘীউকা দীয়া!" আর তাঁদের সামনে বেশ কয়েকটি মোটাসোটা মোমবাতি জ্বলছে। ভীম-ভৈরবের সবাই দাঁত খিচিয়ে চোখ পাকিয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছেন। বেশ বড় বড় পিতলমূর্তি। মানুষ প্রমাণ দেবদেবীগুলি মোটেই ভাল দেখতে নয়। তুলনায় নিজেকে পরমাসুন্দরী মনে হয়। (একটা চেড়ি-পরিবৃতা সীতা টাইপের সেল্‌ফপিটির অনুভূতিও জাগে!) ওদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে লামা পেম্পা গে-র সঙ্গে গল্প করি। কিন্তু ওরা চোখ যে ফিরিয়ে নেয় না! বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে বিঁধতে থাকে।

পেম্পার বয়েস এখন চল্লিশ। তার স্ত্রীর বয়েস চুয়ান্ন। বিয়ের সময়ে ছিল কুড়ি আর চৌত্রিশ। বাবা মা পছন্দ করে বৌ এনেছিলেন। বাবাও লামা ছিলেন, পিতামহও তাই।

পিতামহ পিতামহীকে পেম্পা দেখেছে, তাঁরা মৃত, বাবা মাও মৃত। "বুই তো বুড্‌টী হোগয়া"—বেশ দুঃখ ভরে বল্‌ল পেম্পা।—"চৌধা সালকা বড়া হ্যায় না?"—বাবা মা অমন বিয়ে দিলেন কেন?—"আচ্ছা লড়কী থা, বহুত কামকা থা, বুড্‌ঢা পিতাজী বুডটী মাতাজীকো দেখ্‌ভাল্ করতা থা—ইস লিয়ে।"

—এখন বুঝি সে আচ্ছা লড়কী নেই আর? আপনাকে দেখ্‌ভাল করে না বুঝি?

—তা করে। খুব খাটে। বাচ্চাদের ছ্যাখে। বাগান টাগান ছ্যাখে।

—কয়টি বাচ্চা?

—এক ছেলে। লামা। তিন মেয়ে। বড় মেয়ের নাম কিন্দন খামো, বয়েস সতেরো, বাড়িতে কামকাজ করে। মেজটির বয়েস চোদ্দ। সে

আনি হয়েছে, আনি গুম্ফায় থাকে। আর ছোটর আট, সে ইশকুলে যায়। তার নাম উড়াকিন খামো।

—এত হিন্দি শিখলেন কোথায় ?

—ইনডিয়ায়। আমি তো অনেকবার ইনডিয়ায় গেছি। তিনবার ধরমশালাতে দালাই লামাকে প্রণাম করতে গেছি। ছাব্বিশে জানুয়ারি দেখতে দিল্লিতে গেছি দু'বার। বুদ্ধগয়া গিয়েছিলাম এই তো চারবছর আগে। তা ছাড়া কুলুমানালি—আমি ইনডিয়াতে অনেকবার গেছি কিনা"—

মনের সুখে পেম্পা কথা বলছে, আর আমি ভাবছি, হায়রে ভারত সরকার ! এত করে "ইহা হয় মাতা ভারত"—"আমরা হই গর্বিত, হইয়া ভারতবর্ষীয়"—ইত্যাদি পোস্টার সেঁটেও এদের ল্যাঙ্গুয়েজটা পোষ মানাতে পারা গেল না ? "ইনডিয়াতে গেছি" কী ভাষা ? এটা শুনলে চীনেরাই বা কী বলবে, পাকিস্তানই বা কী বলবে !

—"সাম্‌প্রুং বস্তি থেকে দশজন গিয়েছিলাম কুলু মানালি, আপেল-চাষের শিক্ষা নিতে। অ্যাপল্ প্রুনিং শিখতে। তখন চারমাস ছিলাম তো—জানুয়ারি থেকে এপ্রিল—ভাল করে হিন্দি বোলি শিখে গেছি। কুলুতে, থানাদার বলে জায়গাটার নাম, সেখানে দেখলাম একজন চাষীর দু'শো একর আপেল ক্ষেত আছে জানেন ? এখানে এত জমিই নেই কারুর। লামাদের তো জমিজমা থাকেই না। চমরীও থাকে না। কেবল ঘোড়া থাকে—চড়ে ঘুরতে হয় বলে।"

—"দালাই লামা কেমন লোক ? কথা বলেছিলেন আপনার সঙ্গে ?"

—"খুব ভালো। আমার মা মারা যেতে ওঁর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁর জন্য টাকা দিতে, দালাই লামার পুজো দিতে। এত ভালো লোক তিনি, গেলে খানা দেন, চায় দেন, যত্ন করে বাত্‌চিত্ করেন, যানেকা

টাইমমে বোলা, 'সাবধানীসে যানা, রাস্তামে বহুৎ গুণ্ডা হ্যায়!' আমরা বিশ পঁচিশজন লামা মিলে গিয়েছিলাম, দালাই লামাকে পুজো করতে, সবাই খুশি হয়ে ফিরেছি।" কথা বলছি, এমন সময়ে দোর গোড়াতে একটি অপরূপ সুন্দরী কিশোরী এসে দাঁড়ায়। তিব্বতী ভাষায় কী কথা বলে। বাইরে তখন অন্ধকার। লামা আমাকে বলেন—

—"আমার বড় মেয়ে, কিন্দন খামো। জিজ্ঞেস করছে খানা এখানেই এনে দেবে না আমাদের বাড়িতে গিয়ে খাবেন? তারপর আবার এখানে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।"

—"ওরে বাবা। এখানে পৌঁছে দেবেন কেন? এখানে রাত্তির বেলা একা একা কে থাকবে?" (এতগুলো ভয়ঙ্কর দর্শন অচেনা দেবদেবীর মধ্যে! চেনা শুনোর মধ্যে ওই যা একা বুদ্ধদেব। অমন হাসিহাসি মুখে আধাবন্ধ চোখে "ভয় নেই, ভয় নেই" বলে হাত তুলে পদ্মাসনে থাকলেই কি হয়? ভয় করবেই! মানুষকে আমি ভয় পাই না, যত অচেনাই হোক। তা বলে তিব্বতী দেবদেবী?) না বাবা! "আমি···আপনাদের বাড়িতেই যাইনা কেন? সেখানেই খাবো, সেইখানেই শুয়ে থাকবো। কিন্দন খামোর কাছে কি শুয়ে থাকা যাবে না?"

—"কেন যাবে না? কিন্তু আপনারই তো কষ্ট হবে। আমাদের গরীব ঘর। লামাদের গেস্টরুম এই গুম্ফা। ইধরই জেয়াদা আরাম হোগা।"

—"জেয়াদা আরাম কে চায়? আমি বাবা একা একা এই এতজন ঠাকুর দেবতার মধ্যে রাতভোর থাকতে পারবো না। মনে হবে স্বর্গেই এসেছি বুঝি। আমি মানুষজনের মধ্যেই থাকতে চাই।"

—"চলুন তবে।" আমার ব্যাগ তুলে নেয় লামা পেম্পা খাণ্ডু।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে খানিকটা হেঁটে গিয়েই পেম্পা গে-র বসতবাড়ি। দরজার বাইরে প্রেয়ার হুইল লাগানো। এখানে সবার বাড়ির বাইরেই এটা দেখছি। চাকাটি ঘুরিয়ে দিয়ে, ঈশ্বরের কাছে আগেই খবরটি পাঠিয়ে, যে হ্যাঁ দিনের কাজ শেষ করে আমি নিরাপদে ঘরে ফিরেছি, তোমারই কল্যাণে, 'তোমার জয় হোক'—বলে, গৃহস্থ তার গৃহে পা দেয়। এটা আমার ভারি পছন্দ হল। যদি পারতুম আমাদের বাড়িতে না হোক অন্তত আমার ঘরের বাইরে আমি এমনি একটা ব্যবস্থা করতুম। রোজ যাতে গৃহে পা দেবার আগেই গৃহদেবতাকে একবার স্মরণ করা যায়। আমার তো বিপদে পড়লে, শুধু বিপদতারণের মুখটি মনে পড়ে। আনন্দে থাকলে আনন্দরূপের মুখখানি মনে থাকে না। ভগবানের কেবলই আমাকে বিপদে ফেলা উচিত, যদি আমাকে দিয়ে তাঁর কথা ভাবানোর ইচ্ছে হয় তাঁর। তাই প্রেয়ার হুইলটা বেশ ব্যবস্থা আমার মত আর যারা, তাদের জন্যে। "ভগবানকে তো ভালইবাসি, কিন্তু পুজো-আচ্চা ভালবাসি না"—টাইপের নিশ্চয় আরো অনেক দুর্ভাগা-দুর্মতি আছে এই জগতে।

প্রেয়ার হুইল ঘোরালে আবার টুংটাং শব্দ হয় সুন্দর। প্রত্যেকেই একবার করে ঘুরিয়ে, দরজা সদর চৌকাঠ পেরুলুম। উঠোন। উঠোন পেরিয়ে কাঠের বারান্দায় (মাথায় ঢাকা নেই) উঠতে হয়। সেখান থেকে, মাথাটি নিচু করে, আর উঁচু পাথরের চৌকাঠ পার হয়ে গুহার মতন ঘরে ঢুকতে হয় নিচু দরজা দিয়ে। শীতের দেশ বলেই দরজা নিশ্চয় এত নিচু। এখানকার মানুষরা বেঁটে নয় বিশেষ। লম্বাও নয় অবশ্যই। কিন্তু পেম্পা, ও তার মেয়েকে, বাঙ্গালী মতে, লম্বাই বলা যায়।

ঘরে ঢুকতেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা।

—"কারমো, আমার পত্নী!" বসে বসে কিছু পান করছে সে। একটি

হাত জামার মধ্যে ভরা। হায়রে একেই বুড্‌টী বলছিল নেমকহারাম স্বামী ? কোথায় বুড্‌টী ? হ্যাঁ বলি রেখা দেখা দিয়েছে কপালে, কিন্তু মুখের লাবণ্যে, ঝকঝকে দাঁতের আর চোখের হাসিতে, এবং দেহের গঠনে যুবতীই। বছর পঁয়ত্রিশ চল্লিশের বেশি কিছুতেই মনে হবে না। পেম্পা গে-কে অবশ্য চব্বিশ পঁচিশ দেখায়, এই যা! রূপসী বড় মেয়ের পাশে তাকে বাপ বলে মনেই হচ্ছে না।

ঘরে আরেকটিও মানুষ আছে—অল্পবয়সী একটি ছেলে, মুণ্ডিত মস্তক, এখনো, দাড়ি গোঁপ ওঠেনি, মুখখানি খুবই কচি, খুব মিষ্টি। চোখের দিকে চোখ পড়তেই লাজুক হাসি হেসে দিল। হাসিটা দেখে ভীষণ চম্‌কে উঠি। এ তো পুরুষের হাসি নয় ? এ নিশ্চয়মেয়ে।

—"আমার আন্নি-মেয়ে! তবিয়ত খারাপ বোলকে গুম্ফাসে চলা আয়া।" ফের কালই ফিরে যাচ্ছে সে গুম্ফায়। মিষ্টি হাসিটি দেখে বুকের মধ্যে মোচড় দিল। এই মেয়ে সারাজীবন থাকবে ব্রহ্মচারিনী হয়ে, ন্যাড়া মাথায় ? ইয়েশি আনির অবশ্য মাথায় চুল আছে, বয়জ কাট্। চোদ্দ বছয়ের মেয়েটি মাথায় মায়ের মতই লম্বা হয়েছে, মায়ের মতই রূপসী। বালক সন্ন্যাসীর মতো চেহারা।

রূপবতী মা সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে নিজের সাজানো সংসারের মাঝখানে মা লক্ষ্মীর মতো বসে আছে। লামা স্বামীর অপেক্ষায়। আপনমনে আগুন পোয়াচ্ছে, জপ করছে, আর রক্‌শি খাচ্ছে। হাতে কাঠের জপমালা। উনুনের ধারে বসে বসে এই জপ করতে করতে রক্‌শি খাওয়া, ভারি সুদৃশ্য মনে হলো আমার। রিল্যাক্‌স্‌ড। প্রশান্ত, নিরুদ্বেগ মুহূর্ত্ত। আমাকে দেখেই একগাল হাসি। তারপর উঠে খাবারের ব্যবস্থা সুরু। গিন্নি তো ?

গহন রয়নমে ন যাও বালা !

এদিকে আমি বাথরুমে যেতে চাই। মেয়েটাকে যতই বলি, সে হাসে। এ তো বড়ো জ্বালা হলো ! বাথরুম যাবার উপায় নেই ? এটা লোকের বসতি, বেরিয়ে গিয়ে মাঠে ঘাটেই বা যাই কী করে ! এদের কি বাথরুম থাকে ? না ঐ বনপাহাড়ীই ভরসা ? কিছুই বুঝতে পারছি না। শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে লামা-বাবুটিকেই বলি—"বাথরুম কিধার যায়েগা ?" সে বলে—"বাস্তুন কেয়া হ্যায় ?" সর্বনাশ !—"ল্যাট্রিন ?—ল্যাট্রিন কিধার ?"

—"লাত্তিন ? লাত্তিন কেয়া হ্যায় ?"

—যাব্‌বাবা ! এখন তো বাকী যা যা প্রতিশব্দ জানি, তা আরো ভয়ঙ্কর, আরো সুদূর শব্দ। পাউডার-রুম, টয়লেট, ডাবলিউ সি, লু, জন, লিট্‌ল রুম, ল্যাভেটরি—এসবের তো কোনোটাই চলবে না !

—"শৌচাগার ? শৌচাগার কাঁহা হ্যায় ?"

—"ছৌ—কেয়া ? মুঝে পাতা নেই। ছৌ—কেয়া ?"

হায় রে ! কেবল একটা কথা বললেই ঠিক বুঝবে। উঃ ! ভদ্দল্লোক হয়ে জন্মানোর কি কম ঝামেলা ? যাব একটা দরকারে, বলব আরেকটা দরকারের কথা। কী যে বাধা, জিবের ডগায় যেন দশমন ওজনের শেকল দিয়ে তালা চাবী এঁটে রেখেছে কেউ ! অতিকষ্টে সেই মোক্ষম শব্দটাই উচ্চারণ করে ফেলি ; হিন্দিতে অবশ্য শব্দটা একটু কম খারাপ শুনতে। অরিজিনালিও তো শব্দটা পারসীই, বাংলায় ওটা ফোর লেটার হয়ে যায় তো ?

শব্দটা বাংলাতে শুনতেও যত খারাপ, দেখতেও তত খারাপ। বছর দশ বারো আগে, ইংলণ্ডে পৌঁছে একবার ইমিগ্রেশনের কিউ-তে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। সেখানেই প্রথম দেখলুম, তীর চিহ্নের পাশে বড় বড়, গোটা গোটা, বাংলা কালো হরফে লেখা আছে 'পায়খানা'। তীরচিহ্ন বরাবর দৃষ্টিপাত করে একটা ভারতীয় প্রণালীর ঐ ব্যবস্থাও দেখলুম। দুশো বছরের রাজ্যপাটেও যা সম্ভব হয়নি,—তা হয়েছিল অশিক্ষিত ইস্ট পাকিস্তানী ইমিগ্রান্টদের নোংরা করার কল্যাণে। খাস্ বিলেতে বাংলা ভাষায় নোটিস দেখলে প্রাণটার তো দোয়েল পাখীর মত পুচ্ছ তুলে নেচে ওঠার কথা? কিন্তু হায়রে এ-'লুটিশ' এ্যাইসা লুটিশ্ যে প্রাণ তো নাচলই না, বরং পালাই-পালাই করে উঠ্‌ল। যদি বিদেশে গিয়ে একটিই বাংলা শব্দ দেখতে পাই—সেটি কি এইটি?

এ রকম তখন আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু আজকে টের পেলুম, সেই নোটিসের মূল্য কী। ভাষা না জেনে ওই প্রাকৃতিক ইঁদুরকলের খপ্পরে পড়ে' বেচারী পূর্ব পাকিস্তানীদের কী অবস্থাই যে হতো, এতদিনে সেটা টের পেলুম। কোনো মুহূর্ত্তে, কোনো কোনো দৃষ্টিতে, ঐ শব্দগুলি নিশ্চয় খুব শান্তিদায়ক হয়েছে!—

পেম্পা গে-ও এই হিন্দী শব্দটা জানে। তৎক্ষণাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে আমাকে উঠোনে নিয়ে গেল। সদর দরজার দিকেই যাচ্ছি, হঠাৎ বাঁহাতে একটা ছোট্ট কাঠের ঘর—ছোটো দরজাটির শেকল খুলে দিল পেম্পার কন্যা। এই সময়ে খুব সসম্মানে হিন্দী শব্দটিকে উচ্চারণ করলো লামা,—যেন "রাষ্ট্রপতি ভবন" দেখাচ্ছে কোনো বিদেশী ডিপ্লোম্যাটকে।

আমিও সত্যিই এতটা আশা করিনি—দরজা টরজাওলা, বন্ধ বাথরুম! বাড়ির প্রায় মধ্যেই! বাঃ! মহানন্দে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই কপালটা ঠাশ করে ঠুকে গেল দরজার ফ্রেমে। আমি মেট্রোর সেই লম্বালোকের মতন এই বলে, মনে করি বুঝি সব দরজাই আমার তুলনায় যথেষ্ট। আরেকটু কম বিনয় থাকলে, আজ মাথাটা ঠুকত না! মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে যেই না অন্ধকার গৃহাভ্যন্তরে পদার্পণ করা, অমনি প্রচণ্ড ভয়ে মনে হল হৃদপিণ্ডটি শোঁ শোঁ করে হাঁটুতে নেমে যাচ্ছে—পায়ের নিচে কোনো জমি নেই—আমার পা গিয়ে পড়েছে অতল-নিতল শূন্যে। হাত দিয়ে দরজাটা ধরে ফেলে সামাল দিলুম—টর্চ ছিল, জ্বেলেও ফেললুম। কিন্তু তার আগেই একটা অনুপলের জন্যে, আমার মনে ঘোর মৃত্যুভয় এসেছিল।

মৃত্যুভয় বড় জটিল, বড় সরল। প্রবল শ্বাসকষ্টের রুগী আমি, মৃত্যু-যন্ত্রণার সঙ্গে আমার বেশ মাখামাখি পরিচয়। ভাবতুম মৃত্যুভয় বুঝি আর আমার বাকি নেই। থাকবে কি করে, যখন প্রতিটি শ্বাসই নাভিশ্বাস? বুকের মধ্যে যখন ঐকান্তিক প্রার্থনা উঠে আসে—এ নিশ্বাসই যেন শেষ নিশ্বাস হয়, হে প্রভু, হে ঈশ্বর।

সুখ বলো দুঃখু বলো জীবন যা দিতে পারে, হাত ভরেই দিয়েছে। এখন বিনা অভিযোগে যে কোনো মিনিটেই গদি ছেড়ে দিতে পারি। অনেক সময়ে ঘর গেরস্ত মানুষের ধারণা হয় মৃত্যুভয়টা নিজের জন্যে নয়। —"আমি মরলে আমার বাচ্চাকাচ্চার কী হবে!" সে ভাবনাও আমার নেই। কেবল যতদিন বেঁচে আছি, ততদিনই বাচ্চাকাচ্চার দায়িত্ব আমার। মরে গেলে আমার কি? জীব দিয়েছেন যিনি ভারও নেবেন তিনি। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। একটা মস্ত জিনিষ শিখে গেছি।—জগতে কারুর জন্যেই কারুর আটকায় না। "ইনডিসপেন্‌সেবল্"

বলে, কিম্বা "অত্যাগসহন" বলে এই স্রোতোময় জীবনে কোনো শব্দ নেই। আজ আমি যদি পৃথিবী থেকে উবে যাই, শেষ পর্যন্ত কারুরই আটকাবে না। সব ত্যাগই সহ্য হয়ে যায়। কিন্তু অতর্কিতে এসে, প্রাণভয় যে কী জিনিস, আমাকে তা টের পাইয়ে দিলে। এই অন্ধকারের দোর ঠেলেই গহন গভীর নিরাশ্রয়তার মধ্যে পদক্ষেপ করে, নিরালম্ব শূন্যতার মধ্যে পা যখন ডুবে যাচ্ছে, তখন মর্মে মর্মে বুঝলুম আয়ুর ভিখারী হওয়া কাকে বলে। "পায়ের নিচে মাটি নেই" এটা একটা মেটাফরিক্যাল বাক্য হয়ে আমাদের জীবনে প্রায়ই আসে—কিন্তু এমন উৎকট আক্ষরিক বাস্তব হয়ে আর ক'বার ?

চকিত মুহূর্ত্তের ব্যাপার মাত্র।

ক্ষণিকেই দরজা আঁকড়ে ধরে পতন সামলে নিই টর্চ জ্বেলে, পা তুলে চৌকাঠের নিরাপত্তায় রাখি।

সামনে মেঝেটি পরপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে তৈরি। তক্তাগুলি কখনো ইঞ্চি ছ'য়েক দূরে, কখনো বা ফুটখানেক। ঘরটি আড়ে ছোট কিন্তু বহরে লম্বা। ভেতরদিকে ঝুড়ি করে মুরগী রাখা। মুরগী, না মোরগ ? তারা আমাকে দেখে কঁক কঁক করে স্বাগত জানালো। আরে, মিস্টার সেনের ট্রাকের তারাই নয় তো ?—টর্চ ফেলে দেখলুম তক্তার নিচে টানা গর্ত্তে, শুকনো পাতার ঘন স্তূপ দেখা যাচ্ছে। পুরো ঘরটাই একটা বিরাট গর্তের ওপরে তক্তা দিয়ে সেতুবন্ধ করে তৈরি হয়েছে। প্রতিটি তক্তাই খুব পরিষ্কার। আলাদা করে বিশেষ কোনো গর্ত নেই। কোনো দুর্গন্ধও নেই। ভেতরে জলের ব্যবস্থা নেই। কাগজ তো নেইই। ধুলোবালি, পাতা, মাটি—কিছুই নেই। কি মুশকিল।

এরা করে কী ?

না কি কিছুই করে না ?

শৌচকর্ম বলে একটা ব্যাপার আছে না ?

ভাগ্যিস, ব্যাগের মধ্যে সর্বদাই টয়লেটপেপার রাখি। তাই নিজের বেলায় তবু যা হোক চলবে,—কিন্তু ওদের কী হবে ?—এই ঘোর স্বাস্থ্য-চিন্তা মাথায় ঢুকে গেল বলে, বেরুবার সময়েও ঠকাস্ করে মাথাটা আরেকবার ঠুকে গেল চৌকাঠে।

একই সন্ধ্যায় দু'বার ভয় পেয়েছি। একবার সামপ্রুং গুম্ফার তান্ত্রিক দেবদেবীদের সাহচর্যে রাত্রিযাপনের সম্ভাবনায়, আর একবার এই দরজা খুলে গভীর শূন্যের মধ্যে পা ফেলে। পুরো ট্রিপটায় এ ছাড়া আর ভয় পাওয়ার স্মৃতি নেই।

ভোজ কয় যাহারে

কারমো খানা রেডি করে ফেলেছিল ওই সময়টুকুর মধ্যে। পা, ঝ্যান্, চা, এবং রক্‌শি।

পা হলো একরকমের ঝোল, তাতে কলমীর মতন একরকম শাক আছে, চমরীর চর্বি আছে (ওরা বলে ছুর্পি), চমরীর ঘি, এবং মাঠা দিয়ে তৈরি। তাতে নুন-লংকা দেওয়া, বেশ সুস্বাদু। আর ভাত-রুটির বদলে ওরা ঝ্যান্ বলে একটা বস্তু খায়। পেম্পা বলল, ওটা 'কদ্দূসেদ্ধ'। নমক্-চা, আর রক্‌শিমদ দুটি সামুভার জাতীয় পাত্রে উনুনের ওপরে চড়ানো আছে। কাপে ঢেলে দেবার সময়ে গিন্নি গরম রক্‌শিতে ফেটানো কাঁচা ডিম গুলে দিচ্ছে, রক্‌শির রং হয়ে যাচ্ছে হল্‌দে-শাদা। খেতে খানিক এগ্‌নগের মতো, খানিক ব্র্যাণ্ডির মতো। স্বাদটি ভাল।

—"ধান, কদ্দু আর গেঁহু" দিয়ে তৈরি হয় রক্‌শি—লামারা খায় না। একেবারে বাচ্চারাও খায় না। কিন্তু মায়েরা সবাই খায়। মা-ই ঘরে রক্‌শি বানিয়ে রাখে। ছাংও। সিং ছাং ধান আর কদ্দু দিয়ে তৈরি, ও-তে গেঁহু নেই। সুভাষবাবু বলেছিলেন ফিল্‌টার্ড বিয়ারের মতন। আমি সিং ছাং খেয়ে অতশত বুঝিনি। বিয়ার চিরতার মত, তেতো জিনিস, খেতে একটুও ভালো নয়। সিং ছাং তো তেতো নয়। তবে কেন বিয়ার, তা কে জানে ?

রক্‌শি, চা, পা, ঝ্যান খেয়ে বেশ পেট ভরল। খাবার পরে আগুনের ধারে আড্ডা বসলো। কথা বলছে একা লামাই। ভাষা না জানায় কারমো কথা বলতে পারছে না। ছোটো মেয়ে উড়াকিন খামো অসম্ভব মিষ্টি, ঠিক জাপানী পুতুলের মতন দেখতে। চুল চীনেছাঁটে কাটা দুটি গাল দুটি আপেল, মা-দিদিদের মতই পোশাক পরা। খুব হাসে। খাবার সময়ে প্রচণ্ড মোট্‌কা এক ছাইরঙা গম্ভীর বেড়াল এসে সভাপতির মত আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর নাম শিম্পূ। শিম্পুর ঘরে ঢোকা বারণ নেই, কিন্তু চৌকাঠের বাইরে আরেকজন যিনি এসে বসলেন এবং বেঁটে লেজ ঘন ঘন নাড়তে লাগলেন, তাঁর—"ঘরমে ঘুস্‌না মনা হ্যায়।"—তিনি এক ভুটিয়া কুকুর, লোমে চোখ ঢাকা, তাঁর নাম চট্টু। দুজনেই ধূসর, দুজনেই খুব মোটা সোটা, আর মিষ্টি। তবে শিম্পূর মত পায়াভারি নয়। ঘরে ঢুকতে না পেয়ে সে একটু জাতে নিচু হয়ে আছে। তার সঙ্গে জলচল নেই।

কথায় কথায় টের পেলুম, যে মোম্পাদের মধ্যে জাতিভেদটা খুব প্রবল। মোট ছ'টা জাত আছে। মোম্পাদের মধ্যে বানিয়া জাতি নেই, আর ক্ষত্রিয় জাতি নেই। ক্ষেতিকাম করনেওয়ালা জাতি আছে, পেন্টিং করনেওয়ালা অর্থাৎ তাংখা বানানেওয়ালা জাতিও আছে, তবে

তাওয়াং এরিয়াতে অনেক রকম জাতি নেই, ৩/৪ রকমই আছে। আর তিব্বতে? মূর্তিবানানেওয়ালা জাতি, কিতাব বানানেওয়ালা জাতি—আরো কতো জাতি আছে। লামাদের মধ্যেও জাত আছে, "পাক্কা লামারা" একজাত, যারা বিয়ে থা করে না ব্রহ্মচর্য নিয়ে গুম্ফায় বাস করে, আর "ফ্যামিলি-লামা" আরেক জাত, যারা গ্রামের গুম্ফা চালায়, কিন্তু সংসারেই থাকে। অন্য অন্য জাতের লোকেরাও লামা হয়ে যেতে পারে, তবে যারা সবচেয়ে নিচু জাত,—কসাই, আর লোহার, এরা ছাড়া। যারা জুতো বানায়, আর যারা মাটির জিনিস বানায় তারাও সব নিচু নিচু জাত, কিন্তু জলচল; এরা অস্পৃশ্য নয়। লামা হতে ওদের বাধা নেই। কিন্তু ইয়াপ্ আর শোইপা, যারা লোহার অস্ত্র বানায়, ঘোড়ার নাল-বসায়, আর যারা মীট কাটনেওয়ালা, তারা মোম্পাদের সমাজে মিশতে পায় না। আলাদা একটা পাড়া তৈরি করে থাকে। অর্থাৎ ghetto ব্যবস্থা আছে। এদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি চলে না। ওরাও অবশ্য তিব্বতীই, তবে, "ও তো অলগ্ তিব্বতীলোগ, মোম্পা নেহী।" মোম্পারা ওদের সঙ্গে ওঠবস্ করে না, ঘরে এলে, চা খেতে দেয় না। যদি বা দেয় কখনো, তবে সেই কাপ আর নিজেরা ব্যবহার করে না। দু'তিন হপ্তা বাইরে ফেলে রাখে, তার পরে ওর মধ্যে ধূপ জ্বালিয়ে শোধন করে নেয়। অসবর্ণ বিয়ে চলে না। করলে জাতিভ্রষ্ট, সমাজচ্যুত এবং গ্রামছাড়া হ'তে হয়।

তবে হ্যাঁ, এরা অন্যজাতি বটে, কিন্তু এদের সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই মোম্পাদের। শত্রুতা কেবল খাম্পাদের সঙ্গে। তারা আরেকটা বুনো পাহাড়ী উপজাতি। তিব্বত থেকে লামারা ওদের পাঠাতো খাজনা আদায় করতে। মোম্পারা শান্ত জাতি। খাম্পারা নির্দয়, উদ্দাম। ওরা

তিব্বতী লামাদের চাকর হয়ে এখানে এসে খাজনা আদায়ের নামে যা নয় তাই করতো, অত্যাচারের সীমা থাকতো না। মারপিট তো আছেই, মেয়েদেরও কেড়ে নিয়ে যেতো। সোনা, শস্য সবই নিয়ে যেতো। মোম্পা জাতি তো চিরকাল এমন গরীব গরীব ছিল না। খাম্পারাই সব কেড়ে নিয়েছে।

এই সামপ্রুং গুম্ফা কি আজকের? চারশো বছরের পুরোনো। যেমন 'মেরা লামা' বলে একজন তাওয়াং গুম্ফা বানিয়েছেন, তেমনি 'লামা জাং' সাম্প্রুং গুম্ফা বানিয়েছেন। পেম্পা গে বংশানুক্রমে এই গুম্ফার পূজারী। সামপ্রুং-য়ে আগে মিঠা জল ছিল না।

ছিল আদমী-খানেওয়ালা এক ঝিল। সে বড় ভয়ানক ঝিল। এখানে কেউ এলে বাঁচতো না, তার জন্যে। লামা জাং সেই ঝিল শুকিয়ে দিয়ে, খট্‌খটে পাহাড় করে দিলেন। তারপরে নতুন জল বানালেন। নতুন ঝর্ণা নামালেন। বললেন—এই ঝর্ণাটি যেখান দিয়ে বয়ে যাবে, সেই-খানেই ক্ষেতখামার হবে, গ্রাম-ঘর হবে, মানুষ জন হবে, পুজো-আচ্চা হবে।

লামা পেম্পা গে মনের সুখে নমক্-চা খেতে খেতে গল্প করছে, তার বউ আর আমি খাচ্ছি রক্‌শি। আমার এ ব্যাপারটা বেশ মজার লাগছে। এমনিতে আমি মদ্র-খেকো নই। কিন্তু আজ এখানে রক্‌শি খেতে খুবই ভাল লাগছে। কিন্তু কলকাতায় বসে অকারণে রাম-জিন্-বিয়ার হুইস্কি খেতে আমার প্রবৃত্তি হয় না! হ্যাঁ, খাবার আগে একটু ড্রাই শেরী কি ড্রাই ভারমুথ, খাবার সঙ্গে ঠাণ্ডা শাব্‌লি কি হক্, বোজোলে, কি বারগাণ্ডি, খাবার পরে এক ফোঁটা কুয়ানেত্রা কি কনিয়াক্, ড্রামবুয়ী কি ব্রেম ছ মঁস্থ। এতে মোটেই আপত্তি নেই! বিদেশের পরিবেশে এটা খুব মানানসই। কিন্তু দেশে তো তা নয়। কলকাতা শহরে

অনেক লোকেই মদ খায় দেখি মাতাল হবারই জন্যে। সেইজন্যেই বোধহয় বাঙালীর কাছে খাদ্যের বেলায় স্বাদ যতটা জরুরি, পানীয়ের বেলায় আর আস্বাদনটা তেমন জরুরি থাকে না। কেন থাকে না? যেহেতু গোটা মদ্যপান ব্যাপারটাই বাঙালীর জীবনে নিষিদ্ধ ফলের মতো—ছাপোষা বাঙালী গৃহস্থ-সংস্কৃতির বহির্ভূত ও মধ্যবিত্ত সামাজিক সংস্কারের বিরোধী উট্‌কো ব্যাপার—হয়তো সেই কারণেই আমাদের ঘরে ব্যাপারটা এমনধারা খাপছাড়া, এত শ্রীহীন, যেমন-তেমন। আর এত সর্বনেশেও।

এখানে কিন্তু ব্যাপারটা আলাদা। মানানসই। খুব ভালো লাগছে, যেহেতু এটা প্রাত্যহিক সংসার জীবনের অঙ্গ। এই পরিবেশের সঙ্গে এটা চমৎকার স্বাভাবিক। আমি সাঁওতালদের মধ্যে এরকম ভাবে কখনো যাইনি, গেলে নিশ্চয়ই মহুয়া খেতুম, হাঁড়িয়া খেতুম। কলকাতার ড্রইংরুমে বসে কখনো কেরোসিন এবং লোডশেডিং অথবা পিকাসো এবং ক্রুফো, কি রেগন এবং থ্যাচার গভীরভাবে আলোচনা করতে করতে, ঘামতে ঘামতে, রাম-জিন-হুইস্কি গলাঃধকরণ, নাঃ মশাই—থ্যাংকিউ, ওতে আমার রুচি হয় না।

হঠাৎ শুনি পেম্পা বলছে—

—"আমার বউ খুব ভাল মেয়ে। ওর আরো বিয়ে হতে পারতো। ওর দুই বোনের একজনের দুটি স্বামী, আরেকজনের তিনটি। তবে লামাকে শাদি করেছে বলে, কারমো আর শাদি করেনি।"

—"কী বললেন? দুটি-তিনটি স্বামী?"

—"ইনডিয়ার মতো নয় তো এখানে, মোম্পা মেয়েরাও অনেক শাদি করতে পারে। পুরুষরাও পারে।"

—"মেয়েরা অনেক শাদি করলে শ্বশুর ঘর করতে কোথায় যায়?"

—"যায় না। স্বামীরাই আসে বউয়ের বাড়িতে। দুই স্বামীতে মিলে-মিশে থাকে, ভাই ভায়ের মতন। জমিজমা ছ্যাখে, চমরী-বক্‌রী ছ্যাখে।"

—"বাচ্চা হলে? কার বাচ্চা কেমন করে জানবে?"

—"প্রথম স্বামীর নামেই সব বাচ্চা। ভাইয়ে ভাইয়ে অনেক সময়ে একটাই বউ বিয়ে করে, পয়সা কম থাকলে।

বড় ভাইয়ের নামে সব বাচ্চা। অনেক সময়ে যদি ছ্যাখে বউয়ের বাচ্চা হচ্ছে না, অনেক জমিজমা, ভেড়া-ঘোড়া, চওঁরী-বক্‌রী আছে, তখন স্বামীই বউয়ের আরেকটা বিয়ে দিয়ে আরেকটা বরকে নিয়ে আসে, বউয়ের যাতে বাচ্চা হয়। সে-বাচ্চাও বড় স্বামীর নামে। কখনো বা নিজেই আরেকটা বউ নিয়ে আসে। যদি বড়লোক হয়। দুই বউতে মিলাপ হুয়া, তো ঠিক হ্যায়। নেহী হুয়া তো ডাইবোর্স হোতা হ্যায়,

কেস হোতা, ফাইন দেনা পড়তা। বউয়ের বেলাও হতে পারে, বরের বেলাও। যে বড়লোক সে অন্যকে খোরপোষ দেবে। যার দোষ, সে ফাইন দেবে। গ্রাম পঞ্চায়েৎ আছে। গাঁওবুড়া আছে। সেই সব ঠিক করে দেয়। যে বরটি বউকে ফেলে, কি বরকে ফেলে যে বউটি পালিয়ে যাবে, তার সম্পত্তি তার জন্যে অল্প রেখে বাকীটা তার বউ-বাচ্চা কি বর-বাচ্চাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হবে। ত্যাগ করে যাওয়া মহা পাপ।

আজকাল খুব প্যার-কা চল্ হুয়া। প্যার করে যদি শাদি হয়, ঠিক আছে, তাতে খরচা অনেক কম। আর যদি নিয়মমাফিক শাদি হয়, তাতে অনেক খরচ। মেয়েকে পণ দিতে হয় বরের বাড়ি থেকে। দুশো থেকে, আটশো টাকা পর্যন্ত চাইতে পারে। প্রথমেই ৫।৬ বারে খাদা আর ৫।৬ বোতল রক্‌শি ভেট দিতে হবে। পরে যদি মেয়েপক্ষ রাজী হয়, তবে বিয়ে পাকা হলে খুব খাওয়া দাওয়া হবে, নাচ গান হবে, বিয়েও হয়ে যাবে। রক্‌শি খাওয়া হবে খুব।

—মেয়েরাই টাকা পায়?

—হ্যাঁ, মেয়েরাই তো বেশি খাটে। ওদেরই তো জেয়াদা ভাও? তবে যে-বাবামার ছেলে নেই, সে কখনো হয়তো শখ্ করে পয়সা দিয়ে ছেলে নিয়ে যাবে। এমনিতে মেয়েদেরই বাবা মা ছেলেদের কাছ থেকে পণ নেয়।

—সম্পত্তি কি মেয়েরাই পায়?

—ছেলে মেয়ে দুজনেই পায়। বাবা মা দু'জনেরই তো সম্পত্তি আছে।

—একাধিক স্বামীর বাচ্চারা? কে কারটা পায়?

—কেন? সব বাচ্চারাই সব বাবাদের সম্পত্তির ভাগ পাবে। এতে আর মুশকিল কী?

—কিরকম বয়সে বিয়ে হয় ?

—মেয়েদের পনেরো থেকে বিশ কি চল্লিশ, ছেলেদেরও ওই ষোলো থেকে পঁচিশ কি চল্লিশ।

'বিশ কি চল্লিশ'টা এক নিশ্বাসে এমন করে আগে কখনো শুনিনি। শুনে মনে যারপরনাই ভরসা পেলুম। যাক্, তাহলে কিছু আশা আছে! (অন্তত মোম্পাদের দেশে !)

বিয়ে হতে দেরি করলে কখনো কখনো বিয়ে না হয়েও বাচ্চা হয়ে যায়। তাতে লড়কীকো শরম হোতা হ্যায়।

—আর ছেলেদের ?

—ছেলেদের লজ্জা কিসের ?—লামা অবাক হয়ে যায়। তার বিস্ময় দেখে আমিও কী বলব ভেবে পাই না। সত্যিই তো। বাচ্চা তো মেয়েটারই হচ্ছে! ছেলের তাতে কি!

—তা, লজ্জা হবার পর সেই মেয়ে কী করে ?

—মাফি মাঙ্ লেতা। ব্যাস্! সব ঠিকঠাক! তারপর ওর আবার বিয়ে হয়। যে ওকে বিয়ে করে, সেই বাচ্চার বাবা হয়ে যায়। তার সম্পত্তি ওই বাচ্চাকে দেয়।

কী সহজ ভাবেই পেম্পা বলে।

আহা এই মোম্পাদের মত লজিকাল যদি আমরা হতুম ?

—স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কি করে ?

—আবার বিয়ে করে। প্রথম স্বামীর বাচ্চারাই প্রথম স্বামীর সম্পত্তি পায়। পরের পক্ষের বাচ্চারা সেটা পাবে না।

—আর বউ মারা গেলে ? স্বামী ?

—ঐ একই। পারলে করে। তবে, বড়লোক না হলে বিয়ে করে না বড় একটা। খরচা আছে তো ?

—বড়লোক কারা ?

—যাদের সত্তর আশিটা চওঁরী আছে। কারুর হয়তো একশো দুশোটা ভেড়া আছে, চল্লিশ পঞ্চাশটা বক্‌রী আছে। তারা বড়লোক।

—যার সাত আটটা চওঁরী, দশবারোটা ভেড়া, দুটো তিনটে বকরী আছে ?

সেও বড়লোক। না, সে মাঝারি। আগে দুশো টাকায় চওঁরী মিলত, এখন চোদ্দশো। আগে ত্রিশ চল্লিশ টাকায় ভেড়া মিলত, এখন দু'শো। বক্‌রীও তাই। লোকের থাকবে কী করে বেশি বেশি ? দুটো একটা করেই থাকে। আর ভৈস-চঁওরী মিশ্রণে যে চঁওরী, শ্রেষ্ঠ দুধ সেই দেয়, তার দাম আড়াই হাজার।

—এসব দেখাশুনো করে কারা ?

—গরু ভেড়া চরানোর কাজটা বাচ্চারাই করে, আর পুরুষরাও করে। পুরুষরা বাঁশ কাটে, তক্তা চেরে। বাস্‌। আর কি ? রকশি খায়। তামাক খায়। উল বোনে।

—বাকি সব কাজই মেয়েরা করে ?

—হ্যাঁ, ক্ষেতির কাজ বল, তাঁত চালিয়ে থান কাপ্‌ড়া বনানা বল, দুধ দোয়ানো, ঘি বানানো, মাখন বানানো, ওদিকে ছাং বানানা, রক্‌শি বানানা, খানা পকানা। —আম্মার কি কাজের শেষ আছে ? তাই আম্মাদেরই জন্যে পণ দিতে হয়। ওরাই তো সব।

তবে জাতের কাজ যেটা, সেটা পুরুষরাই করে। যেমন তাংখা আঁকা, মাটির পাত্র গড়া, কি চামড়ার জিনিস কি কাঠের পাত্র কি লোহার জিনিস তৈরি করা, কি জন্তু মেরে মাংস কাটা—এসব কাজ পুরুষের।

ঘরের ভেতর ঘর

গল্প করছি যে ঘরে বসে, সেটা বেশ বড় একটা হলঘর। দরজা একটাই। কোনো জানলা নেই। ঢুকেই উল্টোদিকে ঘরের মাঝখানে ফায়ার প্লেসে অর্থাৎ উনুনে আগুন জ্বলছে। একটা কুপিও জ্বলছে। দেখলুম কয়েকটি মোমবাতিও রয়েছে মোটা মোটা। জ্বলছে না। আমার জন্য একটা হ্যাজাক জ্বালানো হলো। মুহূর্তেই ঘর দিনের আলোর মতো উজ্বল। ফায়ার প্লেস মানে মাটির উনুনে কাঠের আঁচ। তার সামনে ভুট্টার মালা শুকোচ্ছে। উনুনে বসানো থাকে তিনটে পাত্র। পেতলের গাড়ুর মত চেহারা, গরম জলেরটা সবচেয়ে বড়, চায়েরটা মেজ, রক্‌শিরটা ছোট। ফায়ার প্লেসের মাথায় তাক রয়েছে ম্যাণ্টলপীসের মতন—তাতে ঝকঝকে পেতল আর তামার বড় বড় বাসন—ডেকচি, কড়াই, ড্রাম, হাতা, সসপ্যান সাজানো। সামনেই একটি ঝাঁটা। একধারে বিরাট চান্দুং, সেই মাখন চা তৈরির তিব্বতী যন্ত্রটা,—কালো রং করা কাঠের ওপর তামার আর পেতলের পাত, আর পুঁতি বসানো—যেটা সুভাষবাবু আমাকে কিনতে দেননি। (ভালই করেছেন !) দুধারে দুটি পেতলের আংটা লাগানো। উনুনের উল্টোদিকে দুটি বড় গোল লোহার ড্রাম আছে তার ওপরে কাঠের ঢাকনা, ঠিক টেবিলের মতো দেখায়। ড্রামগুলোর নাম থিরপো, পেতলের বিরাট হাতা করে (যাদের ঠিক সসপ্যানের মতো দেখতে) মগের মতো ডুবিয়ে সেই জল তুলতে হয়। সেই জল গরম করে, অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে, রান্না করে। আর কোথাও কোনো জল নেই। সব জল ভরা থাকে ঘরেই। একটি ঘরের

মধ্যেই সব কিছু। ঘরটির মধ্যে তাঁবু-তাঁবু একটা ভাব আছে। দেয়াল ঘেঁষে বড় বড় সিন্দুক রাখা। ভেতরে ঢুকেই দরজার পাশ দিয়ে কালো রং করা কাঠের সিঁড়ি উঠেছে দেড়তলার ঘরে।

কিন্তু পেম্পা খাণ্ডুর বাড়িতে ওই ঘরটি পুজোর ঘর নয়, ভাঁড়ার। যেহেতু ওদের তো আস্ত গুম্ফাই রয়েছে! একটা মাচাও আছে এ ঘরের মধ্যে। তাতে মালপত্র তোলা রয়েছে।

আড্ডা মেরে শুতে শুতে ৯টা বেজে গেল। ওরা সাধারণত সাতটার মধ্যে খেয়ে নেয়, আটটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরে সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে, পাঁচটা না বাজতেই উঠে পড়ে। ছোটো মেয়েটিও শোয়নি—সবাই মিলে আমায় ঘিরে বসে আছে, কিছুই তো বুঝছে না, কথাও বলছে না। তবে হাসে খুব। আর হাসিই কথা বলে।

শোয়াটা খুব মজার। দেয়ালের ধারের বড় বড় বাক্সগুলো থেকে বড় বড় কুশন বেরুল, আর মোটা মোটা কম্বল, এবং খুব দামী দামী কার্পেট। কয়েকটা কুশন পেতে, তার ওপরে হাজার তিনেক দামের একটা কার্পেট বিছিয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়ে চমৎকার শুয়ে পড়লুম। ওভার-কোটটা গুটিয়ে বালিশের মতন মাথার নিচে গুঁজে নিলুম। সব আলোগুলো নিবে গেছে। সারা ঘর এখন অন্ধকার। দরজা বন্ধ। নিবিয়ে দেওয়া অগ্নিকুণ্ডের ম্লান লালচে আলো টিপ টিপ করে জ্বলছে নিভন্ত কাঠের গায়ে। অন্ধকার ঘরময় একটা চাপা লালচে আভা দপদপ্ করছে। পোড়াকাঠের শব্দ হচ্ছে, ফুট্‌ফাট্। নিশ্বাসের শব্দ। বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়ল বোধহয়। এরা যে যেমন পোশাক পরে ছিল, তেমনিই শুয়ে পড়ল। আমিও দেখাদেখি তাই করি। তাওয়াংয়েও তো তাইই চলছিল। জুতোটুকু খুলে রেখে, ট্রেনের মতন, কাপড় না বদলেই শুয়ে পড়া।

সবে একটু চোখের পাতাটা জড়িয়ে এসেছে, হঠাৎ ধপাধপ্ ধপাধপ্ করে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো কেউ। প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা। ডাকাত পড়লো নাকি ? কত্তা গিন্নি উঠে পড়লেন—সাড়া নিলেন। আমি টর্চটি জ্বেলেছি, ওঁরাও কুপি জ্বালিয়ে ফেলেছেন। খুবই ভয় পেয়েছেন। কিন্তু বাইরের মানুষটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলবার পরে যেন ওঁদের ভয়টা কাটলো। মনে হচ্ছে চেনা মানুষ।

—কী ব্যাপার ?

—একটা ছেলে এসেছে। বলছে এ. ডি. সি এসেছেন ডাক্টর সেনের খবর নিতে। বড় রাস্তায়, গাড়িতে আছেন। চলুন আপনাকে নিয়ে যাই। নিয়ে যেতে বলছে।

অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হলো কত্তাগিন্নিকে। এ. ডি. সি. আসা সোজা কথা ? আছি তো তৈরিই রাস্তার জন্যে। জুতো আর কোট গলিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

এ ডি সি ? মানে দেউরি। এত রাত্তিরে ? পৌনেদশটা বাজে। পাহাড়ী গ্রামে এটা ঘোর মধ্যরাত্রি। ব্যাপার কী ?

লামার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেকটা পথ উঠতে হয়। মিনিট পনেরোর হাঁটা। এবড়ো-খেবড়ো, পাথুরে, পাহাড়ী পায়ে-চলা রাস্তা। এর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে, ওর উঠোনের মাঝখান দিয়ে, অনেকগুলো উঁচু উঁচু বেড়া টপকে এবং পাঁচিল ডিঙিয়ে (যার দু' একটি আবার মই বেয়ে উঠে ডিঙোতে হয়), খুব মজার রাস্তা বেয়ে হাজির হলুম সেই

বড় রাস্তায়। ভাগ্যিস পায়ে ছিল কেড্‌স জুতো। নইলে এই বেড়া ডিঙোনো সম্ভব হ'ত না। গ্রামটি পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও একটিও আলো চোখে পড়ল না। আকাশের আবছা চন্দ্রালোকই ভরসা। আমার সঙ্গে অবশ্য টর্চ। সেই ছেলেটিও টর্চ নিয়েই এসেছিল।

বড় রাস্তায় গাড়িতে ছিলেন তিনজন—এ. ডি. সি শ্রী দেউরি, ই. এ. সি শ্রী বি. কুমার, (যিনি হেসে হেসে বললেন ঃ 'আমি বাইশ-বছর অরুণাচলে আছি—এতদিনে একটা ভাল পোস্টিং হয়েছে! আফটারঅল, তাওয়াং ইজ আ রোড-কনেকটেড প্লেস!') এবং এম. ও., ডাঃ কর, যাঁর বাড়িতে একদিন লাঞ্চ খেয়েছি তাওয়াঙে, এবং যিনি ডাঃ লালওয়ানীকে বেডিং ধার দিয়ে আমার শোবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। একজন এই নেফা অঞ্চলেরই মানুষ, একজন উত্তর-প্রদেশের, আরেকজন উড়িষ্যার। তাঁরা যার খোঁজ করতে এসেছেন, সে মানুষটা বাংলার।

দেউরি বললেন—আমি তো আজ ছিলামনা তাওয়াঙে, ফিরে এসে শুনি আপনি চলে গেছেন সামপ্রুং গ্রামে। মোম্পাদের মধ্যে বাস করবার শখ হয়েছে। আপনি অ্যান্‌থ্রপলজিতেও কাজ করেন তা তো জানতাম না? যা হোক আমার বড়ই উদ্বেগ হলো। একে তো আপনাকে কোনো যত্ন আত্তি করা হয়নি। গুডবাইটুকুও করা হলো না, তার ওপরে কে জানে কোথায় চলে গেছেন আপনি? ভাবলুম যাই সরেজমিনে তদন্ত করে আসি। এঁরা বললেন এঁরাও আসবেন। তাই দলবল নিয়ে চলে এলাম। চলুন দেখে আসি গে কোথায় উঠেছেন, কেমন আছেন!

কি আর বলব? এই উদ্বেগ, এই আন্তরিকতা, এবং কর্মক্লান্ত দিনের পরে, এই আসা,—এর কোনো উত্তর হয় না।

আবার সেই দুর্গম পথে চড়াই ভেঙে সবাই মিলে ফেরা হতে লাগলো। লোকের বাড়ির উঠোন দিয়ে, আপেল বাগিচার বেড়া ডিঙিয়ে, আলুক্ষেতের আল বেয়ে, ঘুমন্ত ঘরবাড়ির ছায়া দিয়ে গল্প করতে করতে হেঁটে হেঁটে লামার বাড়িতে ফেরা। লামা আগেই খবর পাঠিয়েছেন সেই ছেলেটিকে দিয়ে। যাতে স্ত্রী তৈরি থাকেন অতিথিদের জন্যে।

যখন পৌঁছোলুম, দেখি ইন্দ্রসভা সেজে ঘর হাসছে। যেন কোনো শেখ্-এর বিলাসতাঁবু। হ্যাজাক জ্বলছে, কার্পেটে-কুশনে শোবার ঘরটি বৈঠকখানা হয়ে গেছে। মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ বদলায় এই ঘর। কখনো রান্নাঘর, কখনো শোবার, কখনো সভার। এই ছিল লালচে অন্ধকারে ডোবা। এই হয়ে গেছে রাজসভা। ঘুমন্ত কারমো আর কিন্দন উঠে হাসিমুখে অতিথি সৎকার করছে। হঠাৎ এতগুলি ক্লাস-ওয়ান অফিসার ওদেরই ঘরে এসেছেন, ওদের বিশ্বাস হচ্ছে না। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে মাখম-চা আর রক্‌শি খেয়ে আড্ডা দিয়ে রাত সাড়ে এগারোটার সময়ে উঠলেন। সেই ছেলেটি ওদের সঙ্গে গাড়ি অবধি গেল। পেম্মা খাণ্ডুও যাচ্ছিল, কিন্তু লামাকে যেতে বারণ করলেন ওঁরাই! আবার আগুন নিবিয়ে, বিছানা পেতে দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়া হলো। ঠিক স্বপ্ন দেখার মতো মনে হচ্ছে ওঁদের আসাটা। আবার ঘর অন্ধকার। সেই লালচে আভা। নেভানো আগুনের মৃদু উদ্ভাস, আর পোড়া কাঠের উট্‌কো ছুট্‌কো শব্দ।

পাখি সব করে রব

পাখির ডাকে ঘুম ভাঙলো। ঘরে কেউ নেই। এর মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে। কী সুন্দরই যে একটা সকাল হলো। ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম; সামনেই কাঠের উঠোন। উঠোনকে উঠোন, বারান্দাকে বারান্দা! মস্ত চওড়া একটা বড়ো মঞ্চের মতন। ওপাশে ঘেরা রেলিঙ। তার নীচেই পীচফলের বাগান। দূরে তুষারমৌলি শিখরের সারি, স্নোরেঞ্জ। তার নিচের দিকে ঢালু বনপাহাড়ীর গায়ে পাৎলা মসলিনের ওড়নার মতন ভোরের কুয়াশা জড়িয়ে আছে। ঘুম থেকে উঠে চোখ মেলেই এই দৃশ্য আর পাখির শিস—দোয়েল পাখিই মনে হচ্ছে—আমি কেমন করে জানাবো আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।

দেবেনঠাকুরের কথা মনে পড়ে গেল। হিমালয়ের এই শান্তিই বালক রবীন্দ্রনাথের আত্মার গভীরে প্রবেশ করেছিল।

ঘরের ড্রাম থেকেই ওই সসপ্যান (কিয়ো) ডুবিয়ে ঠাণ্ডা জল নিয়ে মুখ ধুতে যাচ্ছি, কারমো ডেকে গরম জল মিশিয়ে দিল তাতে। মুখ ধুলুম ওই কাঠের বারান্দার রেলিঙ থেকে, পীচফলের বাগানের ওপর। তারপর নমক্-চা হাতে করে আবার এই খোলা জায়গাটাতে চলে এলুম। এটা উঠোন কাম বারান্দা। একধারে হাতের তাঁত রয়েছে। তাতে মোটা কম্বলের মতন গরম কাপড়ের থান বোনা হচ্ছে। পাশে থলে ভর্তি উলের বল রাখা। থানটি ফুটখানেক চওড়া। সংসারের যাবতীয় পোশাক পরিচ্ছদ ওই থান কেটে, জুড়ে তৈরি হবে। বড় বড় পাত্র ভরা গম, যব,

ভুট্টার দানা রাখা। বিরাট বিরাট লাউ কুমড়োও রাখা। বাসনপত্র। ছাতা। সংসারের সর্বস্ব এরা বারান্দায় রেখে, নিজেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে শীতের হাত থেকে লুকোয়। এখানে কেউ কারুর জিনিস চুরি করে না। লামা বললে উলের দাম খুব বেড়ে গেছে, তিনটাকা কিলো ছিল এখন বিশরূপেয়া হয়েছে। চট্টুকে সকালে দেখলুম না, শিম্পুকে দেখি সম্ভ্রান্ত ভঙ্গিতে একটা বাটি থেকে চা খাচ্ছে।

সকালে উঠেই বিছানা তুলে ফেলা প্রথম কাজ। তারপরই ঘরটি হয়ে যায় রান্নাঘর। ঘরটার একদিকে পাহাড়ই বোধহয়, পাথরের দেওয়াল। বাকি তিনদিক কাঠের তৈরি। মেঝেও কাঠের। ছোট্ট একটা পাঁচফুট মতন দরজা—পাথরের চৌকাঠ, দু'ফুট উঁচুতে উঠে, একধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে ঢুকতে হয়। ঢুকে ফের দু'ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে নামতে হয় ঘরে। ঘর অন্ধকার। ক্রমশ চোখে সয়ে আসে। কিন্তু বেশ গরম থাকে জানলা নেই বলে। মাথার ওপরে কাঠের কড়িবরগা, পিচ্ মাখানো। কিন্তু পেম্মা খাণ্ডুর বাড়িতে আরেকটাও ঘর লাগানো হয়েছে, বাইরে। নতুন বসানো ঘর। এই ঘরে তিনচারটে আধুনিক জানলা আছে তাতে গেরুয়া পর্দা আছে ভেতরে তিনটি বিছানা পাতা। শুনলুম তিনজন তিব্বতী লামা এসেছেন, তাঁদের জন্যেই বানানো হয়েছে ওই ঘর। ওখানে তাঁরা বেশ কয়েকমাস যাবৎ অতিথি। বসত বাটির মধ্যে তাঁদের যাতায়াত নেই, যা দেখলুম।

ঘুম থেকে উঠেই এদের রান্না খাওয়া শেষ। সাতটার মধ্যে সবাই পেট ভরে ভাত, পা, চা, ডিমভাজা খেয়ে কাজে বেরিয়ে গেল। তারপরে আম্মার ঘর-কন্না সুরু। মেয়ে সাহায্য করছে। পীচবাগানে কয়েকজন মেয়ে এসে কাজে লাগলো দেখলুম। মেয়েরা এখানে বিড়ি সিগারেট খায়। কিন্তু লামারা ধূমপান করে না। এ বাড়িতে কেউই করে না দেখলুম।

—"মোম্পারা গাঁজা ভাং খায়না," লামা বললে, "কেবল বিড়ি সিগ্রেট নস্যি আর রক্‌শি। কখনো বা আরা, লোপানি, সিং-ছাং বা-ছাং।" পেম্মা-গে-র স্ত্রী খুব কর্মঠ সত্যিই। যব, গম ঝাড়ছে, শুকোচ্ছে, রোদে মেলে দিচ্ছে, গুটিয়ে বস্তায় ভরছে তুলছে। লামা সকালে গুম্ফায় চলে গেছেন। আমি বাইরে একটু হাঁটতে বেরুই। টুং টাং শব্দ—এখানেও তেমনি চমরীর পাল নিয়ে চরাতে যাচ্ছে দুটি বালক। চমরী মরে গেলে এরা নাকি কেঁদে ভাসায়। পুরোনো পরম আত্মীয়রাই চমরী জন্ম নিয়ে ঘরে আসে কিনা! চমরী লক্ষ্মী।

পালিশ করা, তামা-পেতলের পাত বসানো চমৎকার কুন্‌কে করে শস্য তোলে লামার বউ। এমন একটা কুন্‌কে পেলে নিয়ে যেতুম। নিয়ে যেতুম এই চায়ের বাটিও। চকচকে পালিশ করা কাঠের বোল-এ করে চা খায়, ডেনিশ পাত্রের মতো গড়ন। তেমনিই খুরোওলা, ঢাকনি-ওলা বাটিতে করে খাদ্য খায়। ঢাকনি কেন? যাতে ঠাণ্ডা না হয়ে যায়।

এখানকার সকালের সঙ্গে তাওয়াঙের সকালের প্রধান তফাৎ, এখানে বনের মধ্যে পাখি ডাকে। বড় বড় গাছ-গাছালি, পাখ্‌পাখালি আছে। তাওয়াঙে দুটোই নেই। পাহাড়গুলো একই হলে কি হবে, উচ্চতার তফাতে স্থান মাহাত্ম্য পালটে যায়।

পেম্মা এবার ফিরবে। আমিই বরং দেখে আসি গুম্ফাটা দিনের বেলায় কেমন লাগে। একবার যাই গুম্ফায়। উড়কিন স্কুলে গেছে, ক্লাস থ্রিতে পড়ে। আন্নি-মেয়ে তৈরি হচ্ছে আনিগুম্ফায় ফিরে যাবার জন্যে। কারমো তার বড় মেয়েকে নিয়ে ফলের বাগানে কাজ করছে কী সব। একসময়ে পাতায় করে কিছু বাগানের পীচফল তুলে এনে দিল আমাকে। লাল সবুজ রঙের কাঁচা, ডাঁশা টকমিঠে পীচফল। নুন দিয়ে খেতে বেশ

লাগে। ব্যাগে ভরে নিই মেয়েদের জন্যে। কাঁচা পীচফল তো কেউ দেখেনি ওরা। আমি গুম্ফায় যেতে আমার সঙ্গেই পেম্পা ফিরে এল।

সত্যিই যা ভেবেছিলাম তাই—দিনের বেলায় ঠাকুর দেবতাদের অনেক কম ভয়াল দেখাচ্ছে।

ইতিমধ্যে একজন প্রতিবেশী এসে আমাকে তিনটে ডিম ও একটি খাদা উপহার দিলেন। তারপরে এলেন গিন্নির দুই রূপসী বড় বোন। একজনের পিঠে নাতি বাঁধা। ছেলেবউ কাজে গেছে। এর দুই স্বামী। আরেকজনের হাত ধরে এসেছে বছর চার পাঁচের এক নাতনী। খুব মিষ্টি দুটো বাচ্চাই। নাতনীর কোমরে আবার রিক্সাওলার ঘণ্টার মতন মস্ত একটা ঘন্টি বাঁধা। "নমস্তে করো"—বললেই সে নমস্তে করে আর "সালাম করো", বললেই সালাম। করেই হেসে ঠাকুমার পিছনে লুকোয়। এঁরই তাহলে তিন স্বামী? সুন্দরী বটে। এঁরা দুজনেই ষাট পেরিয়েছেন, কিন্তু গোটা চল্লিশের বেশি দেখায় না। এখানেই তো 'শাংগ্রিলা' খানিক খানিক ছড়িয়ে আছে। এরাও এনেছেন খাদা আর পাঁচটা করে ডিম, বোনের বাড়ির অতিথিকে আদর অভ্যর্থনা জানাতে হবে তো? ডিমগুলো এই সংসারে রেখে দিয়ে, খাদাগুলো ব্যাগে ভরে নিচ্ছি। 'খাদা' হলো ব্যাণ্ডেজের গজকাপড়ের মত অতি পাৎলা মাড় দেওয়া একটা জ্যালজ্যালে শাদা গামছার মতন জিনিস, যেটা তিব্বতে মালার বদলে ব্যবহৃত হয়। বিলেতে পনীর-ছাঁকনি, চীজ-ক্লথ ঠিক এমনি দেখতে। মানুষ কি দেবতা, যাকেই হোক সন্মান দেখাতে চাইলে এরা 'খাদা' দেয়। ডিমটাও তাই। আমরা যেমন সন্দেশ, মালা দিই।

জীবনে এই প্রথম একত্রে বহুপতিচারিনী সচ্চরিত্রা বিবাহিতা স্ত্রী দেখছি। দুঃখের বিষয় ভাষার অন্তরায়ের কারণে তেমন ভাবে কোনো প্রশ্নই করা গেলনা। লামার মাধ্যমে তো সব প্রশ্ন হয় না? কিছুক্ষণের

মধ্যে অতিথিরাও বাগানে কাজ করতে লেগে গেল কারমোর সঙ্গে। এরা বসে থাকে না। বেড়াতে এলেও না! সাধে এত রূপ?

জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার

—"বেড়াতে যাবেন? আশপাশের গ্রাম-টামে?" পেম্পা গে লামা বলে ওঠে—"লামা দেখার এত শখ যখন, তখন চলুন লামা ছোছে-রিমপো-ছে-র সঙ্গে দেখা করিয়ে আনি। আপনি একজন প্রকৃত তিব্বতী পাক্কা লামা দেখে যান। দালাই লামা, কি পাঞ্চেম লামার মত না হলেও, এঁরা কিন্তু ভি-আই-পি লামা! এঁদের অনেকগুলি পূর্বজন্ম মনে থাকে। ইনি দালাই লামারই সঙ্গে ১৯৫৯ এ এখানে এসেছেন। এঁদের অনেকের পুঁথি পড়বার বিদ্যে নিয়েই জন্ম হয়, অনেকে আবার পূর্ব-জন্মের কিছু চিহ্ন নিয়ে জন্মান। এঁর সেই জন্ম চিহ্ন আছে। আশ্চর্য-রকম ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। চলুন রিমপো-ছে-কে এখন গেলে পাওয়া যাবে। হেঁটে যেতে পারবেন তো আপনি? না, ঘোড়াটা ঠিক করে দেব?

—কই? কোথায় তোমার ঘোড়া? দেখাওনি তো? খুব দূরে যেতে হবে নাকি? গুম্ফার সামনে একটুখানি মাঠ। গুম্ফার চারিপাশে পাইনবন। সেই মাঠে একটি সুন্দর বাদামী বেঁটে ঘোড়া ঘাস খাচ্ছিল। চট্টু কুকুরও দেখলুম খেলছে ওখানে।

—ওইটেই আমার ঘোড়া।—লাজুক হেসে পেম্মা জানায়।—বেশিদূর নয়। ঘোড়া লাগেনা। হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাহাড়ের আর এক ধারে, ঢালুর কাছে চলে এলুম। গ্রামের প্রান্তে। জানিনা এটাও সামপ্রুং না

অন্য কোনো গ্রাম। এবারে অনেকগুলো বেড়া, এবং উঠান পেরুতে হবে এখানেও। কিছু হণ্টন, কিছু উল্লম্ফন। কেন যে মিঃ কুমার কাল বলেছিলেন তাওয়াং "গুড পোস্টিং" কেননা "রোড কনেকটেড প্লেস" সেটা এত অল্পেই টের পেলুম। তবু তো এটা উদোম বুনো পাহাড় পর্বত নয়, রীতিমত গ্রাম-বসতিতে পোষ মানানো সভ্যজগৎ।

একটা বাংলোবাড়ি। তার সামনে, ক্ষেতে একজন কাজ করছিল, সে বললে খবর নিয়ে আসছে লামা দেখা করবেন কিনা। আমরা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি উঠোনে একটা দীর্ঘ কাঠের খুঁটি। তার মাথায় একটি ছোট্ট কাঠের খাঁচা, খাঁচার সামনে খানিকটা বারান্দা মতন করা আছে। সেখানে একটি বাঁদর বসে আছে। আমাদের দেখেই বাঁদর নেমে এল, বোধহয় খাদ্যের আশায়। কাছে তো কিছুই ছিল না, যে দেব তাকে!

সে তখন আবার উঠে গেল, এবং একটা ভাঙা আয়না কোথা থেকে নিয়ে, চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে নিজের মুখটি দেখতে লাগলো। ভারী বিমর্ষ সেই মুখ। বাঁদরের পায়ে সরু শিকলি।—আহা, হাতে কিছু খাবার থাকলে খুব ভাল হতো। বেচারী!

ইতিমধ্যেই আমার আশপাশে কিছু লোক জমা হয়েছে। পেম্মা গে তাদের বললে, 'কিছু খাবার দিতে পার, বাঁদরের জন্যে?' একটি ছোট ছেলে দৌড়ে চলে গেল।

—বাঁদর নয়, উনি বাঁদরী। বাঁদররা দল বেঁধে ভুট্টা চুরি করতে এসেছিল। তাড়া খেয়ে ওর মা ওকে ফেলে রেখেই পালিয়েছিল। লামা রিমপো-ছে ওকে বাচ্চা থেকে মেয়ের মত যত্ন করে পুষেছেন। লামা জানালো আমাকে। শেকলপরা বাঁদরী একমনে চিৎ হয়ে শুয়ে ভাঙা আয়নাতে মুখ দেখছে। মা তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে।

আমার মনে হলো একেবারেই আমাদের অন্তর্জীবনের প্রতিচ্ছবি। এটা তো পুরোপুরি একটা কবিতার শক্তিশালী ইমেজ। মনুষ্য জীবন তা এইই।

একটু পরেই ছেলেটি ফিরে এল, কোত্থেকে চীনে বাদাম আর ভুট্টার খৈ নিয়ে। বাঁদরী নিচে এসে বাদামগুলি বেছে বেছে খুঁটে খুঁটে খেল। ফের ওপরে উঠে গিয়ে তার ভাঙা আয়নাটি হাতে তুলে নিল সে।

লোকটি এসে খবর দিল। আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে পেম্মা গে বললে—

—চলুন, রিম্‌পো-ছে ডাকছেন আমাদের। আপনার ভবিষ্যৎটা জেনে নিতে ভুলবেন না। ইতিমধ্যে আমারও তো জীবন কাহিনী এক্সচেঞ্জ করা হয়ে গেছে? পেম্মা খাণ্ডু এবং কারমোর ইচ্ছে ঃ হয় আমার স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন হোক। এক্ষুনি। নয় তো আমি একটা শাদি করে নিই। এক্ষুনি। এমন আওয়ারা হোকে ঘুম্‌না ঠিক নেহী। আমি যে মোটেই আওয়ারা হয়ে ঘুরছিনা, বাসা বেঁধে ডিমে তা' দিচ্ছি, সেটা বোঝাবার মত অত ভাষাজ্ঞান আমাদের কারুরই নেই। ওর হিন্দিও বলে "আমাকে ছ্যাখ্" আমার হিন্দিও বলে "আমাকে ছ্যাখ্"। কে কাকে দেখবে! তবে মুশকিল হলো রিম্‌পো-ছে-র কাছে গিয়ে।

এঁরা পুনর্জাত লামা। শিশু অবস্থাতেই তিব্বতে দালাই লামার দূতেরা গিয়ে খুঁজে খুঁজে এঁদের ঘর থেকে তুলে আনে। দালাই লামাই চিহ্ন বলে দেন, কোথায়, কবে, কোন্ গ্রামে, কার ঘরে জন্মাবেন পরবর্তী কোন লামা। তাঁর দেহে একটা জন্মচিহ্ন থাকবে। "পুনর্জাত" তিব্বতী এই খানদানি লামাদের জাতই আলাদা, মানই আলাদা। এঁরা সব সময়ে পুঁথি পড়েন। শুভ-অশুভ, পরজন্ম-পুনর্জন্ম, পাপ-পুণ্য, ভূত-ভবিষ্যৎ, আত্মা-পরমাত্মার চিন্তায়, ধর্ম-আলোচনায় মগ্ন থাকেন। একবার

এক দালাই লামা নাকি জন্মেছিলেন এই তাওয়াঙের কাছেই, উরগিলিং বলে একটা গুম্ফার পাশে। একটা কর্পূরগাছ আছে সেইখানে। সেই খবর তিব্বতের লামারা স্বপ্নে জেনে গিয়েছিলেন, উরগিলিঙে লোক পাঠিয়ে শিশুটিকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই উরগিলিং গুম্ফা, সেই বৃদ্ধ কর্পূর গাছ এখনও আছে। সময় থাকলে দেখেও আসা যেত, জীপ যায়।

এই বৌদ্ধ ধর্ম ব্যবস্থায় তন্ত্র অত্যন্ত জরুরি, এখানে নারীর ভূমিকা মোটেই গৌণ নয়। লোকেশ্বরী, তারা, মহাকালী, কালী, তান্ত্রিক দেবীদের প্রবল প্রতাপ, অশেষ মহিমা। স্বয়ং যমরাজ আছেন এঁদের পুরুষ সঙ্গী। আমার বদলে আমার বন্ধু সংযুক্তাদি এখানে এলে আমার চেয়ে বেশি কাজে দিত—নেদারল্যানডে এখন সে তন্ত্র নিয়েই পড়াশুনো করছে। এখানে প্রত্যেক গুম্ফায় প্রচুর পুঁথিপত্র আছে, আছে তাংখায় আকা নানা প্রাচীন ছবি, আর মুখে মুখে প্রচলিত প্রচুর মিথ্, ফোকলোর, কিংবদন্তী। মিথগুলো সংগ্রহ করবার প্রবল বাসনা হয়েছিল আমার, কিন্তু সময় ছিল না। পরে কখনো ফিরে আসবো—ভেবেছিলুম। কিন্তু পাঁচটা বছর তো কেটেই গেল! জাং লামার সামপ্রুং-য়ে জল আনার গল্পটা যেমন সাগর রাজার ছেলেরা আর ভগীরথের গল্পের মতন, একটা আর্কিটাইপাল গল্প, তেমনি তাওয়াংয়ের নাম কেন তাওয়াং হলো, তার চার-পাঁচটা ব্যাখ্যান-আখ্যান,—মোটকথা হাজার হাজার গল্প এখানে বাতাসে উড়ছে তুলোর বীজের মতো। ধরে নিলেই হলো। কিন্তু আমি একে ভাষার ভিখারী, তথা সময়ের কাঙাল—আমার ঝুলি তাই ভরলো না।

পেম্মা গে বললে,—"ইনি বহুৎ বড়া লামা—এঁর নাম ছোছে-রিম্পো-ছে, বয়েস সাতচল্লিশ, তিব্বতের "সেরা" নামের গুম্ফা থেকে এসেছেন।

এঁর হাতে জন্মদাগ আছে, সেই দাগের হদিশ দিয়েই ওঁকে তুলে এনেছিল লামার লোকেরা। এঁরও পুরোপুরি পূর্বজন্ম স্মরণ আছে, নিজের গুম্ফা। সেই গুম্ফার সম্পত্তির হিসেব, পূর্বজন্মের বাপ মার নাম ধাম সব বলতে পেরেছিলেন। আশ্চর্য কিছু নয়। যাঁরাই পুনর্জাত লামা, তাঁরাই পারেন। ইনি খুব সৎ লোক। সেরা গুম্ফায় কত সোনার বুদ্ধমূর্তি, কত সোনার দেবীমূর্তি, তিব্বতে সব কিছু ছেড়েচলে এসেছেন। এখানে নিতান্ত দীন দরিদ্রের মত বাস করেন। সর্বদা গরীবদুঃখীর বাড়িতে যান। ব্যক্তিগত কোনো উচ্চাশা নেই। খুব পড়াশুনো আছে, আরো পড়াশুনো করেন। মমতার শরীর। অনেক জীবজন্তু পোষেন। এটা এই লামার দ্বাদশ জন্ম চলছে। এগারোটা জন্মই ওঁর স্মরণে আছে, মুখস্থ আছে। সমস্ত ইতিহাস বলতে পারেন।"—সসম্ভ্রমে পেম্মা বলল।

মমতার শরীর তাতে সন্দেহ নেই। যখন ওঁর ঘরে গেলুম, তার আগে বারান্দায় দুটো কুকুর ভয়ানক রেগে চীৎকার করতে লাগলো। তাদের শেষটা শেকল পরিয়ে বাঁধতেই হলো। মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখি লামার সঙ্গে এক আসনে তাকিয়া ঠেশ দিয়ে গালচের ওপরে গা এলিয়ে আহ্লাদ করছেন আরেকজন কুকুর মহারাজ। এঁরা কোন্ জন্মে কী ছিলেন কে জানে? এবং চতুর্থ একজন খুদে লোমভরা বস্তু এসে আমারই কোলে উঠে বসলেন। লামাটির তপঃক্লিষ্ট চেহারা দেখে বয়েস বোঝা যায় না। পেম্মার মতো নধরকান্তি নন। আস্তে আস্তে, গম্ভীর হয়ে কথা বলছিলেন অনেক। কিন্তু সেসব হিন্দিতে অনুবাদ করবার শক্তি নেই পেম্মার। অতএব লামার সঙ্গে আমার বিশেষ কথোপকথন সম্ভব হলনা। কেবল পেম্মার সঙ্গেই কথা বললেন। আমার ভবিষ্যৎ জিজ্ঞেস করতে অনেকবার পেম্মা আমাকে মনে করিয়ে দিলেও আমি সেটা পেরে উঠলুম না। অথচ জানতে যে একদম ইচ্ছে করছিল না, তা

বলব না। কিন্তু কিছুতেই ব্যক্তিগততম প্রসঙ্গটি তুলতে সম্মত হলুম না। ইগোতেই বাধলো। তাহলে আমারও অহং আছে? অর্থাৎ আমিও মুক্তপ্রাণী নই?—"সব অহংকারই বন্ধন। কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহংকার।" চুপ করে রইলুম। লামার পূর্বজন্মের লক্ষণস্বরূপ জন্মচিহ্নটা দেখালে পেম্মা। দক্ষিণ বাহুতে লাল জড়ুল।

খুব যত্ন করে চমৎকার জাপানী কাপ ডিশে আমাদের নমক চা ও বিস্কুট খাওয়ালেন। বেরিয়ে আসছি, দেখি বাড়ির সামনে স্বাস্থ্যসুন্দর একটি ঘোড়া চরছে।

—ওই ছ্যাখো তোমার মতন এঁরও ঘোড়া রয়েছে।

—কী যে বলেন? পেম্মা লজ্জা পেয়ে বললে—ওঁর কি ঘোড়া একটা? ওঁর সাতটা ঘোড়া। তিনটে নিজেই কিনেছেন, গ্রামের লোকেরা চারটে উপহার দিয়েছে।

—উনি সাতটা ঘোড়া দিয়ে কী করবেন? উনি কি সূর্যদেব? না হপ্তায় সাত দিনে সাতটা ঘোড়া চড়েন?

—নাঃ ওই আছে। এই আর কি। লোকে দিয়েছে, আছে। লোকে পুণ্যলোভে দেয়।

সাতটি অশ্ব, চারটি সারমেয়, একটি বানরী এবং বেশ কয়েকটি গ্রাম-ভর্তি বিশ্বস্ত মানুষ—পূর্বজন্মে যাই হয়ে থাকুন, যা দেখছি, এ জন্মে রিম্‌পো-ছে-র সময়টা কাটছে ভাল। কিন্তু ভাষা না বুঝতে পারার বড় কষ্ট!

নাস্তা রেডি

আবার "মানি" ঘুরিয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করে পেম্মা গের পেছু পেছু বাড়িতে ঢুকলুম। বারোটা বাজে। আম্মাও বাগান ছেড়ে ফিরে এসে আবার উনুন ধরালেন। এবারে লাঞ্চ তৈরি হবে।

পরিবারের লোক নয় এমনও দু'একটি ছেলে মেয়ে এল, একজন তো এক থালা ভুট্টার খই (আমার মেয়েরা যাকে পপকর্ণ বলে) নিয়ে পা ছড়িয়ে খেতে বসে গেল। আম্মা এক বিরাট লাউ নিয়ে একটা ছোরা বাগিয়ে কুটনো কুটতে বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই খানা প্রস্তুত। আটা মেখে রুটি না করে লেচিটা সেদ্ধ করে খেলে যেমন হয়, তেমনি একটা জিনিস, শুনলুম millet থেকে তৈরি—ভাতের বদলে সেটি, পা, মাখম-চা এবং রক্‌শি। দুপুরেও রকশি। এবাড়িতে কাউকে ছাং খেতে দেখছি না।

—রোজ দুপুরে কিন্তু এমন হয় না। কেউ যেদিন গরু ভেড়া চরাতে যায়, দূরে দূরে ক্ষেতির কাজে যায়, সেদিন সঙ্গে টিফিন নিয়ে যায়।

—কী টিফিন ?

—কেন ? চওঁরী মাংসের পুর দেয়া মোমো, কিম্বা ঝ্যান্ আর লংকার চাটনি ?

—কখন ফেরে ?

—ফেরে সন্ধে হলে। ফিরে চা খায়, রক্‌শি খায়। আরাম করে। সাতটা বাজলে রাতকা খানা খায়েগা। খানার পরে আরেকটু রক্‌শি খায়। জপতপ করে। আটটার মধ্যে বিছানা। লামাদের অবশ্য রুটিন

একটু অন্য। রক্‌শিটা বাদ।

আম্মারা সকাল থেকে কী কী করেন? ঘুম থেকে উঠে প্রথমে বিছানা তোলা। ঝাড় লাগানো। তারপরে উনুন ধরানো।

পানি গরম।

মুখ ধোয়া।

চায় বনানা।

সব্জী, ঝ্যান্, পা বানানা।

খানা খতম্ করে বেরিয়ে পড়া। ক্ষেতিকাম দেখা, চওঁরী বক্‌রী দেখা। ছেলেরা চলে যায় বাঁশ কাটতে, কাঠ কাটতে, তক্তা চিরতে, লাকড়ি আনতে, গরু ভেড়া চরাতে। আম্মা ক্ষেতিকামের পরে ফিরে এসে উলের থান বোনেন তাঁতে,—কাঁটাতেও বোনেন সোয়েটার, টুপি, মোজা, মাফলার। যব, গম ঝাড়েন, বাছেন, রোদে দেন। কোনো কোনোদিন রক্‌শি তৈরি করেন। মিরচকা আচার, চওঁরী দুধের ঘী বানান। মাংস শুকনো করেন। ভরে রাখেন। আম্মার কত কাজ! আম্মাদের কাজের কি শেষ আছে? সাধে কি আম্মাদের বাপমাকে পণ দিয়ে তবে তাদের ঘরে আনতে হয়?

স্নান করাটা এদের রুটিনে নেই। বছরে মাত্র একদিন! বসন্ত কালে।

এরা বড় স্বল্পভাষী। নিজেদের মধ্যেও খুব একটা কথাবার্তা বলতে দেখছি না। মোটামুটি চুপচাপ। খালি হাসে। কিছু বললে খুব নিচু গলায় বলে।

চিত্রকর

খেয়ে উঠে, আমি আর পেম্মা খাণ্ডু গ্রামে ঘুরতে বেরুই। পেম্মা বললে, চলুন এবার আপনাকে তাংখা আঁকা দেখিয়ে আনি। ওইদিকে একজন—"পেন্টিং করনেওয়ালা জাতকা ঘর হ্যায়।"

বেরুবার সময়েও একবার "মানি"টা ঘুরিয়ে যাই। ওঁ মণি পদ্মে হুম্।

ওর গুম্ফা পেরিয়ে, একটা আলুর ক্ষেত পার হয়ে, আমরা একজনদের বাড়ির আওতার মধ্যে ঢুকে পড়ি। মস্ত সব্জী বাগান। বাড়িটা ভেতর দিকে। পথে দেখা একটি চোদ্দপনেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে। তার হাত ধরে নাচতে নাচতে যাচ্ছে বছর তিনচারের একটি দেবশিশু। পেম্মা তার সঙ্গে কী কথাবার্তা বলে। সে হেসে উত্তর দেয়। আমাকে নমস্তে করে। তারপর চলে যায়। পেম্মা বলে—বাড়িতে আছে। এই হচ্ছে পেন্টিংকরনেওয়ালার বউ, আর ওইটে ছেলে।

—এতটুকু বউ ? তার অতবড় ছেলে ? ওর বয়েস কত ?

—উনিশ বিশ হবে।

আর যে আঁকে, তার ?

—ওই, বিশ বাইশ হবে।

নিচের ঘর খোলা। হাট দরজা। ঘরে কেউ নেই। বাসনপত্র সাজানো। উনুনে চায়ের ঝারি।

পেম্মা ছোট সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। আমি নিচে অপেক্ষা করি।

একইরকম ঘর। কেবল এর সামনের বারান্দাটা সরু, মাথায় চালা আছে। সামনে ক্ষেতি বাগিচা। পাহাড় দূরে। পেম্মা এসে আমাকে ওপরে নিয়ে যায়। দোতলার ঘরটি সেই ইয়েশি আনির বাড়ির পুজোর ঘরের মতই। ছোট। খুব আলো আছে, মস্ত জানলা। একদিকে পুজোর ব্যবস্থা। কাঠের বেদীতে বুদ্ধমূর্তির সামনে রূপোর বাটিতে জল রাখা। দেবদেবীর তাংখা অনেকগুলি ঝুলছে, ঘিয়ের প্রদীপ, ধূপ জ্বলছে।

এক বৃদ্ধ সেখানে বসে বসে সুর করে পুঁথি পড়ছেন। ভারি সুন্দর দৃশ্য। আমাকে নমস্কার করলেন।

তার পাশে, ঠাকুর দেবতাদের দিকে পাশ ফিরে জানলার দিকে মুখ করে এক তরুণ আপন মনে ছবি আঁকছে, সামনে একটা বড় পেতলের থালায় অনেক বাটি বাটি ভর্ত্তি মাটির রং গুলে রেখেছে। তুলি রেখে দুহাত তুলে নমস্কার করল, লজ্জালজা হেসে।

দুটি ছবি সে আঁকছে একসঙ্গে।

দুটিতেই যেখানে যেখানে নীল রং লাগানোর, সেই কাজটি করছে। নীল রং দিয়ে জায়গাগুলো ভরা। একটি তাংখা মহাকালীর, অন্যটি গৌতমবুদ্ধের ছবি। অত্যন্ত সুন্দর লাগলো আমার। এর দাম কত? পেম্মা জেনে নিয়ে বলল চল্লিশ টাকা। এটাকা তক্ষুনি দিতে চাইলুম —কিন্তু লৌ ছং-(ছেলেটির নাম তাই) নিলনা। বলল, অর্ডার দিয়ে যান পরে এঁকে দেব। এগুলো অর্ডারী মাল, আর্টস এণ্ড ক্রাফ্‌টস সেণ্টারের জন্য। (সেখানে এই তাংখার দাম দেড়শো। সেকথা কি লৌ ছং জানেনা ?) এখানে ক্যামেল রংয়ের চিহ্ন দেখা গেল না।

পেম্মা জানায় লৌ ছং-য়ের বাবা তুন্‌ড্রিলা বড় বৃদ্ধ হয়েছেন আর তুলি ধরতে পারেন না, তাই দিন রাত পুজো আচ্চা পুঁথিপাঠ নিয়ে আছেন।

লৌ ছং উপযুক্ত পুত্র হয়েছে সে উপার্জন করে বাবাকে খাওয়ায়, স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ করে। ওর মা নেই। ছবি এঁকেই লৌ ছং এর বাবা সংসার চালিয়েছেন, লৌ ছং-ও তাই চালাচ্ছে। লৌ ছং আমাদের চা খাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আমি ওর কাজে বিঘ্ন করতে চাইলুম না। ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। এবার ফিরতে হবে।

দূর মেরা মন্‌জিল্‌

ব্যাগসমেত দাঁড়াতে হবে সেইখানে, যেখানে এ ডি সি র জীপ এসেছিল। বারবার করে হাত ধরে বিদায় নিলুম লামার পরিবারের কাছে। এতটা সহৃদয়তা, ভাষা ছাড়াই যেটা অন্তরে পৌঁছে যাচ্ছে, তার মূল্য দেবার মত কোনোই সম্পদ নেই আমার শহুরে ঝুলিতে, আমার 'ফুটানিকা ডাব্বা'তে।

উড়কিন খামো লাফাতে লাফাতে এল আমাদের পেছন পেছন বড় রাস্তা অবধি, কার্‌মো আর কিন্দন নিজের বাড়ির চৌকাঠেই বিদায় দিলে।

ওরাও আমাকে খাদা দিয়েছে, আর ফল দিয়েছে।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, অনেকে এসে পেম্মার কাছে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে ব্যাপার কি? এখনই চলে যাচ্ছে কেন তোমার অতিথি? ওই তিনজন তিব্বতী লামার মত থাকবেনা এখন আট দশমাস?

হঠাৎ হর্ন দিয়ে শান্ত স্তব্ধ পাহাড়ী বিকেলটাকে চমকে দিয়ে ট্রাক এসে পড়ল। বাস নয়! বাস মেলেনি, ট্রাকেই যাওয়া।

সুভাষবাবু বেরিয়ে এলেন।

—কই, ব্যাগট্যাগ কই? ভাবলুম বুঝি এবার আন্নি হয়ে আন্নি গুম্ফাতেই চলে যাবেন বুঝি!

—সে কপাল করলে তো? কই, কুকুরছানা কই? ভুলে গেছেন?

—সে কপাল করলে তো? ভুলব কি? এ ডি. সি., ই. এ সি. এম. ও, এ. ডি সির ড্রাইভার, প্রত্যেকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। ডক্টর সেনের কুকুরছানাটা নিয়ে যেতে হবে কিন্তু—দু'দিনের জন্যে এসে কেন যে আপনারা মায়া বাড়ান ম্যাডাম। চলুন চলুন উঠে পড়ুন দেরি হয়ে যাচ্ছে—

—কই? কই? কুকুরছানা দেখি?

—কোন্‌টা?

—মানে?

দুটো এনেছি। একটা লাসা আপ্‌সো আছে। ওগুলোই লোকে কেনে।

তিব্বতী হাউন্‌ড তো সভ্য অঞ্চলে কেউ দেখেনি। ওরা চমরী পাহারা দেয়। এখানে সরকারী আপিস পাহারা দিচ্ছে। তাই আপনি জানতে পারলেন।

—লাসা আপসো সেই বেঁটে গুড়গুড়ে লোমঝুলঝুলেগুলো? ও আমার ভাল্‌ লাগেনা। ওদের মোটেই আত্মবিশ্বাস নেই, কেবল খিট-খিট করে। কামড়াতে যায়। বেড়াল-বেড়াল কুকুর আমার পছন্দ নয়। বেড়াল হবে বেড়ালের মত, আর কুকুরের মত কুকুর।

—তাহলে তো খুব ভাল। ওরা অন্যটাই চাইছিল—প্লেন্‌সে নিয়ে চারশো টাকায় বেচতে পারবে। বলছে অবশ্য পুষবে।

—কারা?

—এই গাড়িতে এক ড্রাইভার যাচ্ছে কিনা আমাদের, ফ্যামিলি নিয়ে,

ছুটিতে। একটা কুকুরছানা সে নেবে। আপনার প্রথম চয়েস ছিল।

—আমি আমারটাই নেব।

গোল একটা উলের বলের মতো নরম গরম তুলতুলে জিনিষ ট্রাকের ওপর থেকে কেউ আমার কোলে ছুঁড়ে দিলো। কোলে নিয়ে ট্রাকে উঠলুম। সে ছোট্ট জিভ বের করে আমার হাত চেটে দিয়ে, কাজলপরা চোখে চেয়ে রইল। পিছনে পড়ে রইল সাম্‌প্রুং গুম্ফার মানুষখেকো ঝিল আর প্রাণদায়িনী ঝর্ণা, লৌ ছং আর তার তুলি, পেম্মা খাণ্ডু আর তার পাকা পীচফলের মত বউ। ট্রাকের ধুলোয় গ্রামটা মুছে গেল, স্বপ্নের মতো। বাঁক ফিরতেই বন।

গোধূলির আলো লয়ে দুপুরে সে করিয়াছে খেলা

ঝিমিয়ে পড়েছিলুম, একটুখানি। সুভাষবাবু বললেন—ঐ দেখুন পেছনদিকে তাকিয়ে। কে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছে।

তাকিয়ে দেখি দূরে আশ্চর্য এক দৃশ্য। বন পাহাড়ীর মাথার ওপরে অনেক উঁচুতে মুকুটের মতো ঝলমল করছে সূর্যের আলোয় শাদারঙের তাওয়াং গুম্ফা। হঠাৎ মন কেমন করে উঠলো। জন্মের মতো বিদায়, তাওয়াং। আরেকটা মন বলল, ক্যা হ্যায় তুম্‌হারা, মুসাফির ?

ট্রাক নেমে যাচ্ছে। পথের পাশে একরকম ছোট ছোট গাছের জঙ্গল —এসমস্তই রডোডেনড্রনের বন! যখন ফুটবে, না ? একদম পাগ্‌ল করে দেবে রঙে রঙে—

—এত ছোট ছোট গাছ ?

—এখানকার জাতটা ঐরকম, বেঁটে জাত—

আরেকটা বাঁকে আরেকবার চেঁচালেন সুভাষবাবু—দেখে নিন! লাস্ট অ্যাণ্ড ফাইনাল ভিউ—আর তাওয়াং গুম্ফা দেখা যাবে না—এই শেষ।

এবার আরো দূর থেকে। আরেকটু বিকেল গড়িয়েছে। আলোর রংটা অস্তসূর্যের, তাওয়াং গুম্ফাটা যেন তামা দিয়ে তৈরি মনে হচ্ছে।

এবার আরো মন কেমন করা। দুটো পাহাড় পেরিয়ে। এখনো রাজকীয়। তাওয়াং ক্রমশ দূর হয়ে যাচ্ছে, অবাস্তব হয়ে যাচ্ছে, এর পরে নিশার স্বপন হয়ে যাবে।

হিন্দী চীনী ভাই ভাই

—এই ঝর্ণাটা, বুঝলেন, লাল রঙের হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের সময়ে। এখানে তখন রক্তগঙ্গা বয়েছিল। আরেকটু নীচে, বাঁধের গায়ে মৃত সৈন্যের বডিতে বডিতে দেওয়াল গড়ে উঠেছিল। উঃ কি দিনই গেছে!

সবুজ ঢালের গায়ে ছবির মতো শান্ত সব গ্রাম। গ্রাম আর ঝর্ণা, নদী, আর কাঠের সেতু। এসব যাবার সময়ে দেখা হয়নি, অন্ধকার ছিল।

—আমরা রূপার পথ ধরে যাব।

—রূপা? কি সুন্দর নাম।

—সুন্দর নাম, সুন্দর শহরও। আমাদের মোরারজী আসছেন তো ওখানে। উনি অবশ্য প্লেনে আসবেন।

—এ অঞ্চলে চীনে সৈন্যেরা এসে দখল নিয়েছিল?

—নেয়নি? বম্‌ডিলা পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল না? তবে কি জানেন,

এখানে আজ যদি আবার চীনেরা আসে, গাঁয়ের লোকেরা ওদের মাথায় করে রাখবে।

—সে কি কথা ? এই না বললেন মেরে রক্তগঙ্গা করেছিল ?

—সে তো সিবিলিয়ানদের নয়। গাঁয়ের লোকেদের সঙ্গে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করেছিল। প্রথমেই মিণ্ট্ লুঠ করে, তারপর মুঠো মুঠো টাকা গাঁয়ের লোকদের মধ্যে বিলি করে—ব্যাস, গরীবলোক তো ওদের কেনা হয়ে গেল!

মুখ খুললেন আরেকজন ভদ্রলোক, আমাদের তৃতীয় সঙ্গী,—শুধু টাকা বিলিই তো নয়, র‍্যাশন ? এসেই র‍্যাশন বিলি করেছে। নিজেদের মিলিটারি র‍্যাশন পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছে ওদের মধ্যে।

—আর মেয়েদের সঙ্গে ব্যাভার ? সেদিকটাও দেখবার মতন। একটাও মেয়েকে বেইজ্জতি করেনি।

—বাচ্চাদের হাতে লজেন্স বিস্কুট তুলে দিয়েছে। কিছু লুঠপাট করেনি।

—আর আমাদের জোয়ানেরা ? সে আর বলে কাজ নেই—

—এ যে শুনছি সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার গল্প—শত্রুপক্ষ জাপানীরা এসে, মণিপুরে অসামান্য ভাল ব্যবহার করে লোকাল পিপ্‌লের মন কেড়ে নিল, আর দেশভক্ত আই. এন. এ. সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে লোকজন খেপে উঠল—

—কেন, বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে ?

—হ'লে কি হ'বে, কথাগুলো তো বলা চলবে না। বললেই লোকে বলবে দেশদ্রোহী। বদমাশ্।

যাবার সময়েই দেখেছিলুম, নুরুয়ানাঙে রাস্তার ধারে একটা ভাঙা ছোট এরোপ্লেন পড়ে আছে। এরা কেউ জানে না ওটা ১৯৪২ এর, না ১৯৬২র। বেশ চকচকে নতুন নতুন দেখতে। কাদের, কে জানে ?

পথের রূপ অনবরতই পালটাচ্ছে—রূপার কাছে এসে পথ দু'ভাগ হয়ে যায়। রূপার দিক দিয়ে যেতে দিল না। মোরারজীর জন্য প্রেপারেশন হচ্ছে—

—"একটু ঘুরে আসি ? একটু উঁকি মেরে আসি ? আবার নাহয় এই রাস্তা দিয়েই যাব"—বহু সাধ্য সাধনা করতে, মিলিটারি পুলিশ কী মনে করে একটু হেসে নম্বর টুকে রেখে যেতে দিল !—"এখুনি ফিরবে কিন্তু !"—আমাকে 'রূপা' দেখানোর জন্যেই এত কাণ্ড। এঁরা সবাই বহুবার দেখেছেন।

একচক্কর ঘুরিয়ে আনা হল ট্রাক রূপার বড় রাস্তা দিয়ে। তারপর দিরাঙের রাস্তা ধরা হল। নিজেদের ট্রাক, তাই। হত যদি আমার একটা র‍্যাশনট্রাক, বেরিয়ে যেত ইচ্ছেমত ঘোরা।

কোলের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে, ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখে ভুক্‌ভুক্ করে অপদেবতা তাড়াচ্ছে বুম্‌লা তাওয়াং। ওর নাম দিলুম বুম্‌লা তাওয়াং। যাওয়া তো হলোনা বুম্‌লা পাস দেখতে। একটু দেখা, আর একটু না-দেখায় মেশানো একটা মুগ্ধ স্মৃতি—খানিকটা পাওয়া বাকীটা চাওয়ায় আটকে থাক্।

—দিরাং জং-য়ে রাতটা কাটাবো আমরা। আই. বি, তে ঘর ঠিক করা আছে। একটা ঘরে ছেলেরা, অন্য ঘরে মেয়েরা। অর্থাৎ হরি ড্রাইভারের বউ, বাচ্চা আর ডক্টর সেন! ডক্টর সেনের কোথাওই কোনো অসুবিধা হবে না, সেটা আমি বলতে পারি, তবে বিহুরানীর

হতেও পারে। হঠাৎ একজন ডক্টরেটের সঙ্গে—

—বিহুরানী ? অসমীয়া ?

—উঁহু ! বিহারী ড্রাইভার, বিয়ে করেছে এক বাঙালীকে। বাঙালী মেয়ে অসমীয়া নাম, বিহুরানী।

—বাঙালী মেয়ের অসমীয়া নাম আর বিহারী স্বামী ? বাঃ।

—এবং তিব্বতী কুকুর !

—তারা কোথায় ?

—ঐ তো ট্রাকেই, পিছনদিকে।

নদীর পাশ দিয়েই পথ, তবু অনেক দূর থেকে খুব সুন্দর আরও একটা নদীর ধার দেখা যাচ্ছে—ওটা কোন জায়গা ? খুব চওড়া আর খুব তেজী নদী একটা—

—ওই তো দিরাং।

—এরা বড্ড সংস্কৃত সংস্কৃত নাম দেয়। সব কিছুই অনুস্বারে শেষ, তাওয়াং, কামাং, দিরাং, জাং, সাম্‌প্রুং ? এসব শব্দের কি কোনো মানে থাকে ? না শুধু ধ্বনিসর্বস্ব ?

—মানে থাকে বই কি। তাওয়াং শব্দেরই তো তিনটে মানে—'তা' মানে ঘোড়া, আর 'ওয়াং' মানে—যেখানে ভালভাবে পালন করা যায়—অর্থাৎ আস্তাবল।

—আরেকটা মানে আছে, 'তা' থেকে নেমে দেবতা এদের 'অং' করেছিলেন অর্থাৎ ঘোড়া থেকে নেমে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, তাই তা-অং নাম।

—আর তৃতীয় মানে হচ্ছে তান্ত্রিক দেবতা তাদ্রিন এখানে বেড়াতে এসে মোম্পাদের যত্নে প্রসন্ন হয়ে ওদের কষ্ট যাতে লাঘব হয় তাই বর

দিয়েছিলেন। কী বর ? ঘোড়া !! তার আগে এদের ঘোড়া ছিল না। সেই থেকে জায়গাটার নাম তা-অং, অর্থাৎ ঘোড়া-রূপ আশীর্বাদ।

—বুঝলুম, রূপক কর্মধারয় ? এবার বলুন দিরাং মানে কী ? ঐ নাম কেন ?

—দিরাং ? দিরাং নাম তো ঐ নদীর নামে।

দিরাং নদীর ধারের গ্রাম তো ?

—দিরাং নদীরই বা নাম দিরাং কেন ?

—দিরাং শব্দের মানে দুটি পাখি।

—দুটি পাখি ? বাঃ ! কী নাম !

দ্বা সুপর্ণা ?

একটি পাখির খুঁটে খাওয়া আরেকটির চোখের চাওয়া।

একটি ভোগী, আরেকটী যোগী।

দিরাং নদীর যেমন তেজ, তেমনি রূপ।

পার্বত্য বেগ, আর উপত্যকার ব্যাপ্তি দুটোই ধরে ফেলেছে, দিরাং নাম ভুল হয়নি।

আমার মধ্যেও কি অমন দুটো পাখি নেই ? ওই দুটো পাখিই—?

একটি প্রপাত, আরেকটি সরসী ?

একটা কেবল নুড়ি কুড়িয়ে জড়ো করে, পাতা কুড়িয়ে জড়ো করে। আরেকটা হাল ছুঁড়ে ফেলে পাল ছিঁড়ে ফেলে নৌকো খুলে দেয়।

একটা কেবলই জড়িয়ে ধরে, আরেকটা কেবল ছেড়ে যায়।

—"যাকে ছেড়ে এলেম,
তাকে নিচ্ছি চিনে।

সরে এসে দেখছি

আমার এতকালের সুখদুঃখের ঐ সংসার

আর তার সঙ্গে

সংসারকে পেরিয়ে কোন্ নিরুদ্দিষ্ট।”

কোলের মধ্যে শুয়ে, স্বপ্ন দেখন্ত বুম্‌লা তাওয়াং ভুক ভুক করে বললে ঃ ছাড়তে আর শিখলে কোথায় ?

জড়াচ্ছোই তো কেবল।

তাওয়াংকেই কি ছেড়ে যেতে পারলে ?

জন্মলগ্নে রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন নবনীতা। পিতৃকুলের দেব, শ্বশ্রূকুলের সেন। নবনীতা দেব সেন।

জন্ম : ১৯৩৮ 'ভালো-বাসা' বাড়িতে, দক্ষিণ কলকাতায়। বারো বছর বয়সে ইওরোপ ভ্রমণ, পিতা নরেন্দ্র দেব ও মা রাধারানী দেবীর সঙ্গে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে বি. এ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ। প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। পরের বছরই অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সঙ্গে বিবাহ। হারভারডে ডিস্টিংশন নিয়ে এম. এ। ইন্ডিয়ানায় পি-এইচ. ডি।

বর্তমানে যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক।

নেশা বই, রেকর্ড ও যথেচ্ছ ভ্রমণ।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ : 'প্রথম প্রত্যয়' (১৯৫৯), প্রথম উপন্যাস 'আমি অনুপম' ১৯৭৬-এ শারদীয়া আনন্দবাজারে। এ-ছাড়াও বহু গ্রন্থ—গল্পের, প্রবন্ধের, ভ্রমণ-কাহিনীর, কিশোর সাহিত্যের।

'নটী নবনীতা' প্রথম রম্য-রচনা সংগ্রহ।

প্রচ্ছদ প্রবীর সেন